বিদেশ বিভুঁই

দক্ষিণারঞ্জন বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

প্রথম প্রকাশ—চৈত্র, ১৩৬৪

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—ক্ষীরোদচন্দ্র পান
নবীন সরস্বতী প্রেস
১৭, ভীম ঘোষ লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ-চিত্র
মৈত্রেয়ী দেবী

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

ছয় টাকা

শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

করকমলে

অনেকের অনেক উৎসাহ ও সহযোগিতা পেয়েছি এই গ্রন্থ রচনায়। তাঁদের সকলের সঙ্গেই আমার সম্পর্ক প্রীতির। মামুলি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সে সম্পর্ককে খাটো করা চলে না।

—দক্ষিণারঞ্জন বসু

এই লেখকের

অন্যান্য বই-এর মধ্যে কয়েকখানি

স্মৃভদ্রার ভিটে

বাজীমাৎ

স্বপ্নকোরক

মধুরেণ

ছেড়ে আসা গ্রাম

শতাব্দীর সূর্য

পরম্পরা (যন্ত্রস্থ)

রেড উড

ছোটদের ঃ

কায়াহীনের কবলে

বীর বাহাদুর

পেনাংএর পাহাড়ে

সাগররানীর দেশে (যন্ত্রস্থ)

দূরদেশের ডাক

গরমের দিন। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহের একটি দিন। তায় আবার দুপুরবেলা। বাইরের উত্তাপকে উপেক্ষা করেই বেরুতে হবে। ঘরে তারই উদ্যোগ। দরজায় আফিসের গাড়ি।

হঠাৎ পিওন এসে চিঠি দিয়ে যায় একখানা। এমনি বড়ো বড়ো মার্কিণী খামে অনেক চিঠিই আসে। অনেকের কাছেই যায়। ক'জনের সময় হয় তার সবগুলো সঙ্গে সঙ্গে খুলে পড়ার? আমারও হয় না। কিন্তু এমন সযত্নবদ্ধ মার্কিণী চিঠি আমার কাছে এই প্রথম। কৌতূহল তাই স্বাভাবিক। খামখানা খুলতেই নজরে পড়ে মিস্ এইলিন এডার্টনের চিঠি।

কোলকাতা ইউসিস-এর কালচ্যুরাল এ্যাফেয়ার্স অফিসার মিস্ এডার্টন। তাঁর চিঠি নিতান্তই একখানা ফরোয়ার্ডিং লেটার। আমাকে একটি আনন্দ সংবাদ পাঠিয়ে অপরিচিতা মহিলার আনন্দ প্রকাশ।

সঙ্গীয় দ্বিতীয় পত্রখানিই মূল চিঠি। একখানি নিমন্ত্রণ পত্র। আনন্দের খবর সেখানেই। সে পত্র নয়াদিল্লীর মার্কিণ দূতাবাসের। লিখেছেন চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স মিঃ ফ্রেডারিক পি বার্টলেট।

মার্কিণ রাষ্ট্রদূত মিঃ এলেন কুপার তখন স্বদেশে। নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের আহ্বানে। নয়াদিল্লীতে তাঁরই কাজের ভারপ্রাপ্ত মিঃ বার্টলেট। তাই তাঁরই মাধ্যমে এসেছে মার্কিণ সরকারের তরফ থেকে আমার কাছে যুক্তরাষ্ট্র সফরের আমন্ত্রণ।

'নেতৃ বিনিময় পরিকল্পনা'য় তিন মাসের সফর ব্যবস্থা। এ দেশ থেকে যাতায়াত ও আমেরিকা পরিক্রমার চলাচল খরচ-খরচা ছাড়াও বাকি আর সব ব্যয় বাবদ বরাদ্দ দৈনিক বার ডলার এক একজন 'লীডার গ্র্যাণ্টি'র জন্যে।

'লীডার গ্র্যাণ্টি' কথাটিতে আমার একটু আপত্তি। আমার মতো লোকও যেখানে মনোনীত হয় সেখানে 'লীডার' শব্দটি বেমানান। আর এই মনোনয়ন লাভ করে নিজেকে যতো সৌভাগ্যবানই মনে করি না কেন, লীডার পরিচয়ের

মোহ নেই আমার। প্রথমত যে যোগ্যতা নেই সে পরিচয়ে আমার স্বাভাবিক সংকোচ। তা'ছাড়া বহু লীডারের দেশে লীডারদের সংখ্যা বাড়িয়ে দেশের বিড়ম্বনা আর বাড়াবার কারণ হতে চাইনে আমি। কর্মী থেকেই আমার আনন্দ। এমন কি আমার পেশার ক্ষেত্রেও।

থাক সে কথা। দেশ ছাড়ার দিন থেকেই বার ডলার বরাদ্দ প্রাপ্তি সুরু। সব ব্যবস্থারই দায়-দায়িত্ব মার্কিণ পররাষ্ট্র দপ্তরের। এ সমস্ত তথ্যই মিস্ এডার্টন জানিয়েছেন তাঁর চিঠিতে। সঙ্গে পাঠিয়েছেন অন্যান্য প্রয়োজনীয় খবরের আরো এক বিরাট ফিরিস্তি।

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে একটি ভয়ের কথাও রয়েছে ঐ তালিকায়। অর্থ নৈতিক ব্যাপার। অর্থের সামর্থ্য যাদের বেশি নেই তাদেরই বেশি আশংকার কথা। আমিও সেই দলের।

তথ্য তালিকার এক জায়গায় বলা হয়েছে, যদিও মিতব্যয়িতার পথে চললে দৈনিক বার ডলার বরাদ্দেই চলে যাবার কথা, তবু, It is strongly recommended that per diem payments be supplemented by funds from other sources, if possible, to the extent of five dollars additional per day for the period of the grant. বেশ একটু ভাবনার বিষয় বৈকি !

কিন্তু এখন নাইবা করলাম সে আলোচনা। আপাতত আমন্ত্রণপত্রই মূল প্রসংগ। সে প্রসংগেই আসা যাক্।

এ ধরনের চিঠি পাবো কল্পনাও করিনি কোন দিন। কি বড়ো কি ছোট বন্ধু-বান্ধবদের অনেকেই ঘুরে এসেছেন এদেশ সেদেশ। খুশিই হয়েছি তাতে। তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা শুনে লাভবান হয়েছি। কিন্তু কখনো আশা করিনি তেমনি সুযোগ আমারও সামনে এসে এমনিভাবে উপস্থিত হবে কোনদিন।

বিস্ময় মিশ্রিত আনন্দে তাই ভরে উঠে মন মার্কিণ দূতাবাসের এ চিঠি পেয়ে। কিন্তু মন দোমনা। এ আমন্ত্রণ গ্রহণে রাজী হওয়া ঠিক হবে, কি হবে না—এই চিন্তা !

মাত্র জানুয়ারী মাসে বড়ো রকমের একটা অসুখ থেকে উঠেছি। শরীর মোটামুটি সেরে উঠলেও মনের ওপর জুলাই মাসেও তার জের চল্‌ছে। সব

সময়েই কেমন একটা ভয় ভয়। তাই ভাবনা, সুদূর পথ পরিক্রমার প্রতি-ক্রিয়ায় কি আবার দাঁড়াবে কে জানে! গৃহিণীও নিঃশংক নন পুরোপুরি।

কিছুতেই মনস্থির করতে পারছি না। দিনের পর দিন কাটে। অথচ চিঠিটারও একটা উত্তর না দিলে নয়। আর দেরি করা চলে না। সৌজন্যেরও সীমা আছে তো একটা!

ঘনিষ্ঠ দু'চার জন আত্মীয় বন্ধুকে জানালাম সব কথা। শুনে তাঁরাও সবাই খুশি আমারই মতো।

দেশ বিদেশের অভিজ্ঞতা লাভের এমন সুযোগ 'পায় ঠেলা' ঠিক হবে না। সকলেরই ঐ একই পরামর্শ।

বিশেষ করে আমেরিকার মতো একটা বিরাট দেশ—এমন একটা বহুবিচিত্র দেশ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের এমনি সুযোগ কি বার বার আসে?—প্রশ্ন করলেন এক বন্ধু।

ঠিকই আসে না। মনে মনে ভাবলাম আমি।

যুগান্তর পত্রিকার সহকর্মীদেরও ঐ একই কথা। কর্তৃপক্ষেরও।

সম্পাদক মহাশয় খুব উৎসাহ দিলেন। উপদেশও দিলেন কিছু তাঁর সাম্প্রতিক বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে। সব শুনে জিগ্যেস করলেন—

একেবারে একা যাবেন আপনি?

বল্লাম, হ্যাঁ।

তা হলে কিন্তু সময় সময় বড্ডো 'ডাল ও বোরিং' মনে হবে।

তবে শরীরের ব্যাপারে আশংকার কারণ নেই, এ আশ্বাস তিনিও দিলেন।

দু'একজন রহস্য করে এমনও বল্লেন, মার্কিণ মুলুকে যেয়ে শরীর যদি কখনো বিগড়েই যায় কোলকাতার চেয়ে ভালো হাসপাতালের অভাব হবে না সে দেশে—শরীরটাকে বরং ভালো করে সারিয়ে আনার সুযোগ হবে। তা ছাড়া রোগীর সঙ্গে চিকিৎসক ও নার্সদের যে কিরূপ ব্যবহার সংগত ও শোভন তাও দেখে আসা যাবে। সেও কি বড়ো কম লাভ?

তবু মন সায় দেয় না। বাবা, মা বুড়ো মানুষ। বাবা খুবই কাতর। যদিই কিছু হয়ে বসে! সে আবার আর এক ভয়। তিন চার মাস সময় তো বড়ো কম নয়। খবর পেয়ে ছুটে আসবো, তাতেও অনেক বাধা।

ভাবিসনি কিছু। ফিরে এসে তুই আমাদের সবাইকে ঠিক ঠিক মতোই দেখতে পাবি।—অভয় দিলেন ছোট কাকা। আমার বিদেশ যাত্রার আমন্ত্রণে তাঁর আনন্দের সীমা নেই।

আর ভাবা ভাবি নয়। মনস্থির করে পত্রোত্তর পাঠিয়ে দিলাম মিঃ বার্টলেটকে। সম্মতি জানালাম মার্কিণ সরকারের আমন্ত্রণ গ্রহণে রাজী আছি বলে।

ব্যস, আর কথা নেই। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সব জানাশুনোদের মধ্যে সমস্ত কিছু জানাজানি।

মিস্ এডার্টন চিঠি দিলেন শুভ কামনা জানিয়ে। কোলকাতা ইউসিস্-এর ইনফরমেশন অফিসার মিঃ জর্জ এফ কিলমার (জুনিয়র) গভীর আনন্দ প্রকাশ করে চিঠি লিখলেন যুক্তরাষ্ট্র সফরে আমার সম্মতির সংবাদে।

একটা ভালো পরামর্শও দিলেন কিলমার তাঁর চিঠিতে। তিনি লিখলেন—

In view of the forthcoming Presidential elections in the United States, I would like to suggest, if you will permit me to do so, that your visit takes place sometime this year, and if possible, from mid-August to mid-November. You would then have an opportunity to observe the election campaign at first hand, to acquaint yourself with the issues involved, possibly to meet the candidates personally, and to witness the final results. Election time is always an interesting period in American life, and the fall of the year is quite pleasant in all of the states. Making a trip at this time would afford you the opportunity of being able to return to India before your own annual elections are held here. I wish to emphasize that these, of course, are only suggestions, the decision rests entirely in your hands.

কিলমারের এই সবিনয় পরামর্শকে সুপরামর্শ বলেই মনে হলো আমার। মনে মনে মেনে নিলাম।

আমন্ত্রণের মেয়াদ এক বছর হলেও ওদেশের নির্বাচনের অভিজ্ঞতা লাভ করতে হলে শীগ্‌গিরই যেতে হবে বৈ-কি! আবার তো নির্বাচন চার বছর পর। এবার না দেখলে আর সুযোগ হবে কিনা কে জানে!

মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের তারিখ ৬ই নভেম্বর। ভাইস প্রেসিডেণ্ট এবং কংগ্রেস সদস্যদের নির্বাচনও একই সঙ্গে। প্রতি চার বছরে একবার এই নির্বাচন। চতুর্থ বছরের প্রথম মংগলবারে তারিখ পড়ে, যে যে তারিখেই হোক। সাধারণত এই নিয়ম।

নির্বাচনের আগেই রওনা হব এ সিদ্ধান্ত পাকা। কিন্তু নভেম্বরের যতো আগে যাওয়া যায় ততোই ভালো।

ওদেশের শীতের কথায় ভয় শিহরণ। নভেম্বর থেকেই নাকি হাড় কাঁপানো শীতের সুরু। ক্রমে বেড়ে বেড়ে জানুয়ারীতে তার চরম সীমা। সে অবস্থা এড়ানো ইচ্ছে। জেনে শুনে কষ্ট পাবার সখ নেই আমার।

কিলমারের কথাই ঠিক। আগষ্ট মাসের মাঝামাঝিই আমার যাত্রা স্থির। বাস্তবিকই এ সময়টা ভারি সুন্দর সে দেশে। আগষ্টের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবর অবধি। এ সময়টাকে ওঁরা বলেন fall, তার মানে আমাদের বসন্তকাল। বেশি গরমও নয়, শীতও নয়। আমোদ ফূর্তির সেরা সময়।

ইতিমধ্যে আবার চিঠি এলো নয়াদিল্লীর মার্কিণ দূতাবাস থেকে। মিঃ বার্টলেটের চিঠি। আমার সম্মতিপত্রের উত্তর।

মিঃ বার্টলেট এবার লিখেছেন—Thank you for your letter of July 9 announcing acceptance of the Foreign Leader Grant. Your varied study program in the United States sounds ambitious and I wish you great success in pursuing it.

মার্কিণ সংবাদপত্র, শ্রমিক সংস্থা ও সাধারণ পাঠাগার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমেরিকাবাসীদের কাছে কিছু কিছু বলে তাঁদের আগ্রহ মেটানো, এই দুই উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে আমার আমন্ত্রণ। কিন্তু আমন্ত্রণ গ্রহণ করাই যখন সিদ্ধান্ত হলো তখন মার্কিণ ভাইবোনদের ভারত সম্বন্ধে জানার আগ্রহ মেটানোর চেয়ে আমার ব্যক্তিগত লাভের লোভটাই বেশি করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো মনে। আমার সম্মতি-পত্রে তাই আমি লিখেছিলাম, আমেরিকার বর্ণবৈষম্য সমস্যা এবং আমেরিকানদের জীবনযাত্রা

প্রণালী (Race relations in America and American way of life) সম্বন্ধে জানবারও আমার বিশেষ আগ্রহ এবং আমি তার সুযোগ পেতে চাই।

সে জন্যেই আমার বিষয়সূচীকে ambitious বলে অভিহিত করেছেন মিঃ বার্টলেট। ঠিকই বলেছেন তিনি। মাত্র তিন মাস সময়ের মধ্যে আমেরিকার মতো একটা বিরাট বিচিত্র দেশের সঠিক পরিচয় লাভ অসম্ভব এবং একাধিক বিষয়ে বিস্তারিত জানার আশাও দুরাশা।

তবে এক্ষেত্রে ভুলটা আমার ব্যক্তিগত হলেও এ যেন অনেকটা সম্প্রদায়গত ব্যাপার। ইংরেজী সেই পুরানো কথাটাই মনে পড়ে—Jack of all trades but master of none। আমাদের অধিকাংশ সাংবাদিকের বেলায় একথাটি যেমন খাটে তেমন আর কোন গোষ্ঠী সম্বন্ধেই নয়।

কাজেই ভুল করেও সে ভুলের জন্যে দুঃখ নেই আমার। সাংবাদিক হিসেবে কিছু কিছু জেনে এসেছি তো অনেক কিছু সম্বন্ধে, নাই বা হলাম বিশেষজ্ঞ! যেটুকু জেনেছি তাই আমার বৃত্তিগত কাজে লাগাতে পারলে আমার যুক্তরাষ্ট্র এবং তারপর ইয়োরোপ সফর সার্থক বলে মনে হবে। তাই যথেষ্ট।

শুধু পেশার দিকটাই বা বলি কেন। নেশাও আছে একটা। সাহিত্যের নেশা। সাহিত্যের মাধ্যমে সমষ্টির হিত সাধনের অর্থাৎ আনন্দ বিধানের আগ্রহ। সুখ আনন্দ নয়। দুটোতে অনেক তফাৎ। খালের জলের ঢেউ আর সমুদ্রের তরংগ। একটা ক্ষণিক, অপরটি স্থায়ী। প্রকৃত শিল্পীই দিতে পারে সে আনন্দ। তার জন্যে চাই দৃষ্টির ও মনের প্রসারতা। দেশ ভ্রমণের মাধ্যমে সে প্রসারতা লাভ যতোটা সহজে সম্ভব ততো আর কিছুতেই নয়। এ কথা এতোকাল ধরে শুধু শুনেছি। এবার নিজের কাছেই সে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ হাজির।

তিন-চার মাস অবশ্য খুবই কম সময়। নিতান্তই সামান্য। তবু এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই দুটো চোখ মেলে ঘুরে ঘুরে যেখানে যা দেখবো, মনের ছোঁয়ায় যেখানে যা কিছু অনুভব করবো, মোটামুটি তার মোট ওজন বড়ো কম হবে না। সাহিত্যের হাটে সে মোট পুরোপুরি নিয়ে কবে উপস্থিত হতে পারবো এবং মোটেই পারবো কিনা জানিনে, তাহলেও এই অভিজ্ঞতার সঞ্চয় যে হবে আমার পরম সম্পদ তাতে কোনই সন্দেহ নেই। আমন্ত্রণ গ্রহণ করে মনের কোঠায় এমনি যতো চিন্তা-বিচিন্তার ঘোরাঘুরি।

যাবার আগের আয়োজন

এবার যাত্রার উদ্যোগ।

বেশ কিছু সময় প্রয়োজন প্রস্তুতির জন্যে। কম করে হলেও এক মাস। এ তো আর পাশের বাড়ি পাকিস্তানে ঘুরে আসা নয়, একেবারে সুদূর দেশ আমেরিকায় পাড়ি দেওয়া। কাজেই মন তৈরিই তৈরি হবার শেষ কথা নয়। মাঝখানে অনেক ঝঞ্ঝাট।

প্রথম প্রশ্ন ভিসা-পাশপোর্টের। সর্বক্ষণের সঙ্গী—বিদেশে বহু বিপদের রক্ষী এই ভিসা-পাশপোর্ট। এর গুরুত্বও তাই সবচেয়ে বেশি।

খবরের কাগজের লোক। হয়তো খুব বেশি বেগ পেতে হবে না পাশপোর্ট বার করতে, মনে আমার এই ধারণা। স্নেহাস্পদ এক সহকর্মীর ওপর এ কাজের ভার দিয়ে আমি একরকম নিশ্চিন্ত।

কিন্তু এ নয় মিটলো। শুধু এক সমস্যাই তো নয়। বিদেশ যাত্রায় পোষাক-পরিচ্ছদেরও সে এক প্রকাণ্ড ঝামেলা। পশ্চিমযাত্রী হলেও পশ্চিমী পোষাক আমার চলবে না। কৈশোরে অনেক প্রচার করেছি সে পোষাকের বিরুদ্ধে। অনেককে শুধু বারণ করা নয়, বর্জন করিয়েছি কোট-প্যাণ্ট-টাই। আজ কি করে নিজেই আমি পরবো তা!

কেউ কেউ বললেন, এ আপনার নিছক সেন্টিমেণ্টের কথা।

আমি বলি, তা হোক। সেন্টিমেণ্ট কি এতোই তুচ্ছ? পৃথিবীর কতো বড়ো বড়ো কাজের মূলে রয়েছে সেন্টিমেণ্ট, সে-গুলোকে কি এক তুড়িতে উড়িয়ে দেওয়া চলে? তাছাড়া আমরা যে সব আদর্শবাদের কথা হাঁকডাক করে বলে বেড়াই তার কোন্‌টাই বা সেন্টিমেণ্টকে বাদ দিয়ে? বিশেষ করে যে সেন্টিমেণ্টের সঙ্গে আত্মমর্যাদা ও জাতীয় সম্মানের প্রশ্ন জড়িত তাকে কি নস্যাৎ করার উপায় আছে?

কারুর যুক্তিতেই বাগ মানে না মন। ঠিক করলাম, বিদেশেও জাতীয় পোষাকই হবে আমার পরিচ্ছদ।

চিরকাল ধুতি পাঞ্জাবী পরেই অভ্যস্ত। শীতের দিনে বড়ো জোর তার ওপরে একটা আলোয়ান। আমার বাঙলা দেশে তাই যথেষ্ট।

কিন্তু বিদেশে? ইয়োরোপ আমেরিকায়? বিশেষ করে সে সব দেশের প্রচণ্ড শীতে তো আর ধুতি পাঞ্জাবী পরে চলবে না।

বেশ তো, শেরোয়ানী আর চোস্ত পায়জামা আছে না আমাদের? দিল্লী, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশেও তো শীত বড়ো কম নয়। এ সব জায়গায় এ পোষাকেই তো শীতকালটা বেশ কেটে যায়।

তাই সাব্যস্ত হলো, ধুতি পাঞ্জাবী আর চাদরে যতোদিন চলে চলবে, তারপরে শীত পড়লে শেরোয়ানী আর চোস্ত পায়জামা গায়ে চড়াবো।

এখানেই শেষ নয়। আরো অনেক কাজ। হেলথ্ সার্টিফিকেটের জন্যে ভ্যাক্‌সিনেশন, ইন্‌জেকশন ইত্যাদির নানা রকম ঝকমারি। দৌড়োদৌড়ি ছুটোছুটির অন্ত নেই। এ সব ঝামেলার বারো আনাই বয়েছেন আমার প্রসাদ ভাই আর বন্ধুবর তারাপদ চক্রবর্তী। তা নইলে হয়তো বিদেশ যাত্রা সম্ভবই হতো না নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।

ইউসিস্-এর তরফ থেকে আবার চিঠি এসেছে। ওঁরা এবার জানতে চেয়েছেন আমার যাত্রার তারিখ। সে অনুযায়ী সব ব্যবস্থা তো করতে হবে ওঁদের। সব ভারই মিস্ এডার্টনের ওপর।

১৯শে আগষ্ট। অনেক ভেবে চিন্তে যাত্রার এই দিনটিই ঠিক করেছি আমি। মিস্ এডার্টনকে লিখে জানিয়েছি এ সিদ্ধান্ত। সব কিছু গোছগাছ করে নেবার জন্যে পুরো এক মাস সময় হাতে।

কয়দিন না যেতেই বাসু এসে উপস্থিত আমার বাড়িতে এক ছুটির দিনের সকালবেলায়। ইউসিস্-এর সেরা বাঙালী অফিসার বাসু। কিন্তু ইউসিস্ সৃষ্টির অনেক আগে থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। আমার অনেককালের বন্ধু। পুরো নাম শ্রীমৃণালকান্তি বসু। পরিচিত মহলে পরিচয় বাসু নামে।

আপনার কিন্তু একদিন ইউসিস অফিসে যেয়ে কথাবার্তা বলে নেওয়া দরকার ভালো করে। আপনি তো কখনো যান না, তাই বলতে এলাম।

হুঁ।—সায় দিলাম বাসুর কথায়।

কিন্তু ভাই, সময় করে উঠতে পাচ্ছিনে কিছুতেই, এই মুস্কিল।—আমার অবস্থার কথা জানালাম।

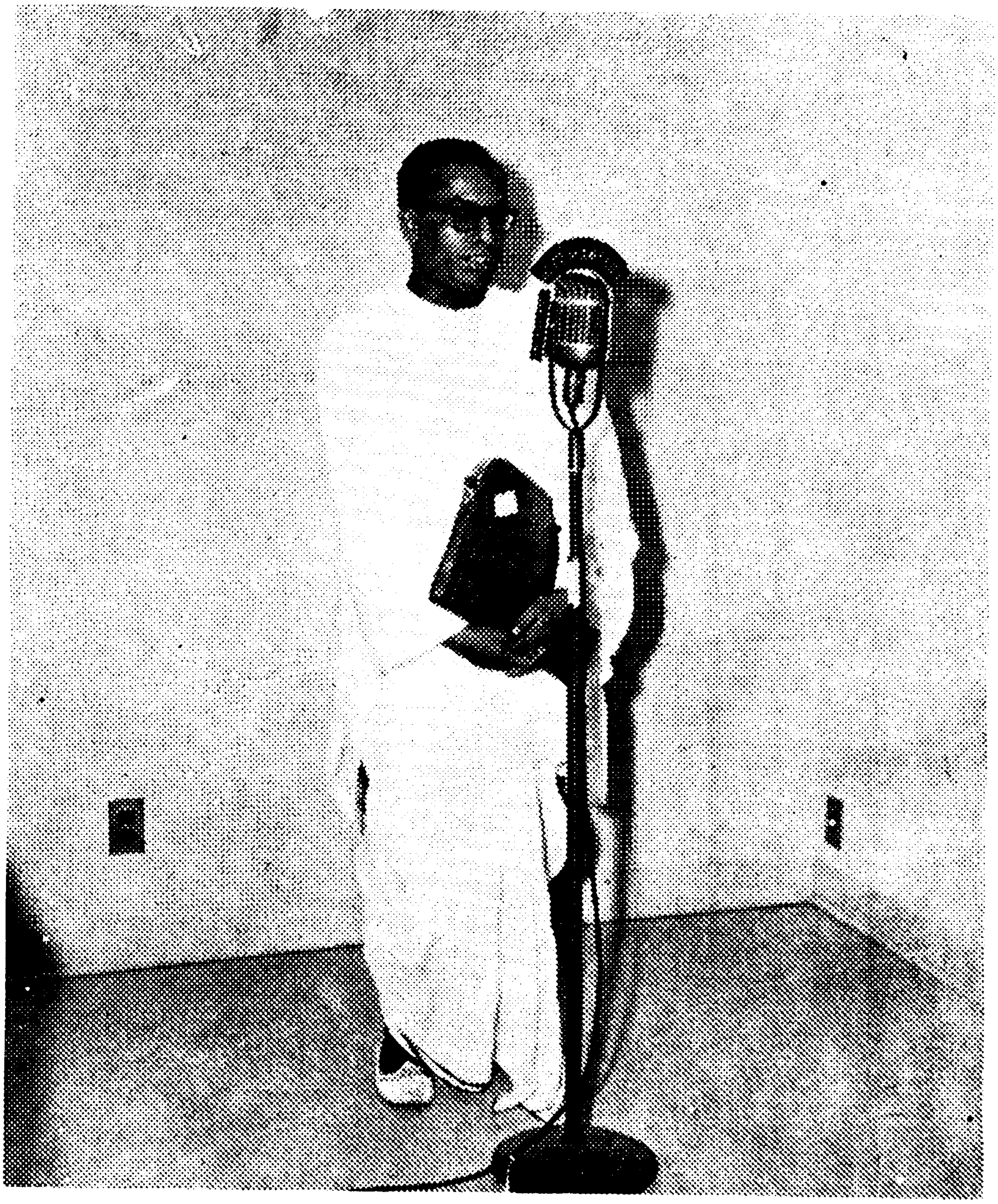

'ভয়েস অব আমেরিকা'য় মহাত্মা গান্ধীর 'অহিংসনীতির শক্তি' সম্বন্ধে বক্তৃতারত লেখক

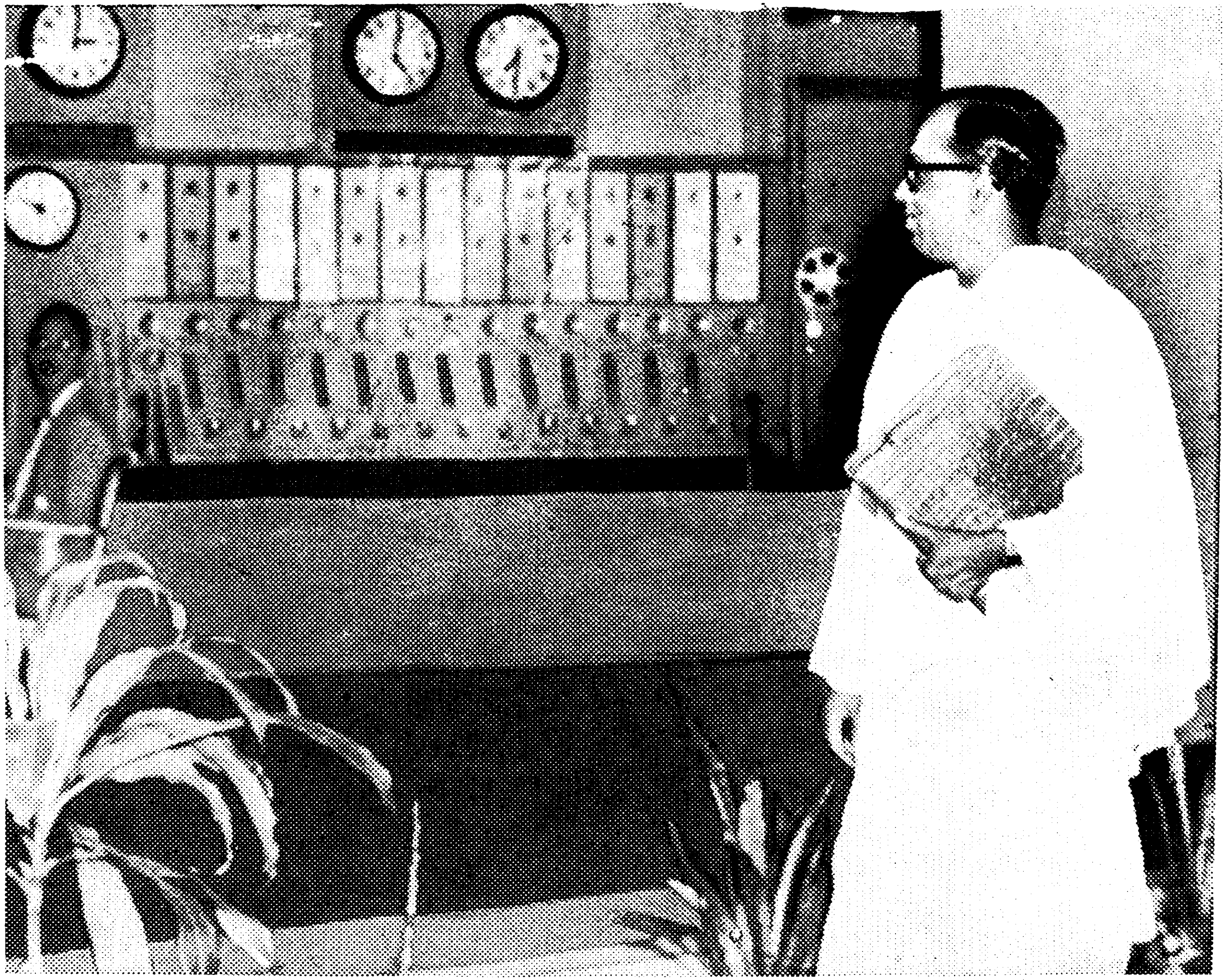

‘ভয়েস অব আমেরিকা’র কন্‌ট্রোল-রুমের এক-এক ঘড়িতে এক-এক দেশের সময়-নির্দেশ। ভারতের সময়ের সঙ্গে অন্য দেশের সময় মিলিয়ে দেখছেন লেখক

অথচ কিলমার এসে একদিন দেখা করে গেছেন আমার অফিসে আমার সঙ্গে। সে সময় সামান্য আলোচনা হলেও বিশদ কোন কথাবার্তা হয়নি আমার আমেরিকা যাত্রা সম্বন্ধে।

হ্যাঁ, মার্কিণ ছাত্রদের 'মিট' করার জন্যে যে সান্ধ্যভোজের আয়োজন হয়েছে তাতে যাচ্ছেন তো আপনি? নিমন্ত্রণ পত্র পেয়েছেন নিশ্চয়ই?—জিগ্যেস করলেন বাসু।

পেয়েছি।—উত্তর দিলাম। কিন্তু যেতেই হবে?—যাবার মন নেই, এমনি স্বরে পাল্টা প্রশ্ন করলাম।

বারে, যাবেন বৈকি! সেখানে আমেরিকায় যাবার আগেই সে দেশের একদল ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে আলাপ হয়ে যাবে। তাছাড়া আর আর-সকলের সঙ্গেও কথাবার্তা হবে।

ভালো কথাই বলেছেন বাসু। সান্ধ্যভোজে যাবো, তাঁকে কথা দিলাম। তারপর আরো অনেক বিষয় জেনে নিলাম তাঁর কাছ থেকে। তিনিও যে আমেরিকা ফেরৎ!

সেদিন সন্ধ্যায় মার্কিণ ছাত্রদের প্রীতিভোজে যোগ দিয়ে ভালোই করেছিলাম। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতজন ছাত্রছাত্রী এসেছে ভারত দর্শনে। তাদের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন এক বয়স্কা মহিলা। নাম ডাঃ এ্যাডেলিনা গান্থার, দলের ছেলেমেয়েদের গ্র্যাণ্ড মা গান্থার। সবাই ডাকে ওই নামে। ক্যালিফোর্নিয়ার একজন প্রখ্যাত সমাজসেবিকা তিনি।

ছাত্রছাত্রীদের প্রায় সকলের সঙ্গেই গালগল্প হলো। আমি কিছুদিনের মধ্যেই তাদের দেশে যাচ্ছি, এ কথা শুনে তারা সবাই খুব খুশি।

আপনি আমেরিকার কোথায় কোথায় যাবেন?—Sam জিগ্যেস করলে। আমি মনে মনে শ্যাম নামটাই ঠিক করে নিয়েছি তার জন্যে। আজো তাই ভুল হয়নি তার নাম। ভারি মিষ্টি প্রখরবুদ্ধি ছেলে। ওদের দলের গ্রুপ লীডার। লীডার হবারই যোগ্য বটে!

ঠিক কোথায় কোথায় যাবো তা স্থির করবো আমেরিকায় যেয়ে। তবে মোটামুটি গোটা দেশটাই বোধ হয় ঘুরে আসবো।

আমার এই অনির্দিষ্ট উত্তরে মোটেই শান্তি পেলো না শ্যাম।

ক্যালিফোর্নিয়া যেতে ভুল করবেন না কিন্তু। ভারি সুন্দর স্টেট। আমাদের য়ুনিভার্সিটি দেখে আসবেন।

নিজের রাজ্য নিজের বিশ্ববিদ্যালয় দেখাবার জন্যে শ্যামের সে কী আগ্রহ! ও যেন একেবারে সব সেরা এমনি ভাব। একটা দীপ্ত গরিমার ছাপ ওর চোখেমুখে।

আমি আশ্বাস দিলাম, নিশ্চয় যাবো ক্যালিফোর্নিয়ায়। সুন্দর শহর লস এঞ্জেলিস; স্যানফ্রান্সিস্কো ছাড়াও পবিত্রপুরী হলিউডের আকর্ষণ আছে না একটা! তা থেকে আমার মতো অনভিজ্ঞ অ-রসিকেরও কি অব্যাহতি পাবার উপায় আছে? সে তীর্থ একবার ঘুরে না এলে আমার সিনেমা-জগতের বন্ধুদের কাছেই বা কী বলবো আমি?

এবার খুব খুশি শ্যাম। কিন্তু তার কাছে জানতে চাইলাম, পশ্চিম বাঙলায় তাদের কি প্রোগ্রাম। উত্তরে তৃপ্ত হলো না মন। শুধু কোলকাতার কয়েকটা কলেজে ঘুরে বেড়িয়ে হবে ওদের বঙ্গদর্শন। এমন কি শান্তিনিকেতনও নেই ওদের প্রোগ্রামে। শুনে আশ্চর্য হলাম। কবিগুরুর শান্তিনিকেতনের কথা বললাম শ্যামকে। সত্যকারের এই বিশ্ববিদ্যায়তনটিকে না দেখে যাওয়া ঠিক হবে না, এ কথাও জানালাম। কিন্তু পরে জেনেছিলাম, তা আর সম্ভব হয়নি ওদের। জেনে দুঃখিত হয়েছিলাম।

আমি কিন্তু আমেরিকায় শুধু উত্তর আর পূর্ব প্রান্তের বড়ো বড়ো সুন্দর সুন্দর সাজানো শহর দেখেই সন্তুষ্ট হতে পারবো না, গল্পে গল্পে বলেছিলাম সেদিন শ্যামকে আর তার বন্ধুদের। নিগ্রোদের সমস্যা ভালো করে বোঝবার জন্যে দক্ষিণাঞ্চলের নানা শহর ও পল্লী এলাকা ঘুরে বেড়াবার ইচ্ছে রয়েছে আমার, একথাও জানিয়েছিলাম।

তার জন্যে দক্ষিণে যাবার দরকার হবে না আপনার। ওয়াশিংটনে, নিউইয়র্কে, শিকাগোতে এ সব শহরে বহু নিগ্রো পরিবারের সাক্ষাৎ পাবেন আপনি। ইচ্ছে করলে তাদের কাছ থেকেই অনেক কথা জানতে পারবেন। গলা বাড়িয়ে উত্তর দিলে শ্যামের নিগ্রো সঙ্গী। কিলমার প্রথমেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ওর সঙ্গে। তখন দু'চার কথায় শেষ হয়েছিলো আলাপ। এবার জমলো। বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা ছেলেটির। তার নামটি আজ আর মনে নেই। আফশোষের কথা।

আমি বল্লাম, তা হলেও আমি যাবো। দক্ষিণের নিগ্রোদের ওপরই বেশি জুলুম চলে, উত্তরে ততো নয়। দু'দিকের কথাই নিজ কানে শুনে আসবো এবং নিজের চোখে দেখে আসবো, তাই ভালো।

বেশ তাই যাবেন।—এবার আর কোন রকম আপত্তির স্বর নেই নিগ্রো ছেলেটির কথায়। তবে কোনো উত্তাপও নেই তাতে। মনে হলো, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে আমার যাওয়া ওর মনঃপূত নয়। কিন্তু যাবোই যখন স্থির, তখন এ ছাড়া কি আর বলবে বেচারা। বিদেশী লোক, তা হলেও তো 'কালা আদমী'—যদি আমার ওপরেই আবার হামলা করে বসে শাদা দক্ষিণীরা! হয়তো সেই আশংকাই উঁকি দিচ্ছিলো ওর মনে। হয়তো বা আর কিছু। কে জানে?

মার্কিণ সংবাদ-সাপ্তাহিক 'টাইম' পত্রিকার ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি মিঃ জন স্কটের স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হলো। আমেরিকান সাংবাদিকের রাশিয়ান স্ত্রী। খাস মস্কো-কন্যা। তবে হাব-ভাবে কথা-বার্তায় এখন পুরোপুরি মার্কিণ-কেতাদুরস্ত। অল্পদিন এসেছেন এদেশে। দিল্লী, আগ্রা দেখে এসেছেন। খুবই ভালো লেগেছে বল্লেন। অবশ্য বলার সময় সাধারণত এমনিই বলেন ওরা—সবই ফাইন, ওয়াণ্ডারফুল! মনের কথা অনেক সময়ই জানা মুস্কিল।

জানতে চাইলেন মিসেস্ স্কট, বৃটেন সম্পর্কে এ দেশের সাধারণ মানুষের মনোভাব কেমন এখন।

বল্লাম, ভালোই। আর সব দেশের বন্ধুত্ব আমরা যেমন কামনা করি তেমনি বৃটেনেরও। তবে অনেক দিন ধরে ওদের সঙ্গে আমরা লড়াই করেছি এবং যাবার সময় আমাদের দেশটাকে ওরা যেভাবে টুকরো টুকরো করে দিয়ে গেছে তাতে মনের তিক্ততা পুরোপুরি ঘুচতে অন্তত একটা জেনারেশন নেবে।

হুঁ।—মাথা নাড়লেন ভদ্রমহিলা।

এতোকালের ঝগড়া-ঝাঁটির পরেও ভারতের যেন একটা বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে বৃটেনের জন্য, অনেক আমেরিকানই পোষণ করেন তেমনি বিশ্বাস। অনেকের কাছে তা একটা বিস্ময়। ওপরে ওপরে তা প্রকাশ না পেলেও অনেক সময় কথায় কথায় ধরা পড়ে।

'নানা পত্র-পত্রিকার অন্যান্য সাংবাদিক বন্ধুরাও ছিলেন সে সভায়। শুধু ইউসিস নয়, মার্কিণ কন্সালেটের কয়েক জন কর্তা ব্যক্তির সঙ্গেও পরিচয় হলো সেখানে।

কোলকাতা ইউসিস-এর ডাইরেক্টর ডাঃ জোসেফ কিচিন। তিনি শুভ কামনা জানালেন কাছে এসে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দু'জনে গল্প করলাম খানিকক্ষণ। বোধ হয় সেদিনই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

মেরিল্যাণ্ডে যাবেন কিন্তু নিশ্চয়ই। ওখানেই আমার বাড়ি। দেখবেন, কি সুন্দর লাগবে।—আলাপ করতে করতে বাড়ির কথা মনে পড়ে গেলো মার্কিণ কন্সাল ডাঃ ভ্যান হোলেনের। উচ্ছ্বাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তাঁর জলজলে চোখ দুটো। আমি মেরিল্যাণ্ড ঘুরে এলে অন্তর জুড়োবে যেন ওঁর, কথায় তাঁর এমনি আকূতি।

হবে না? কোন্ দূর থেকে এসেছেন এঁরা। কতো দিন ধরে হয়তো আছেন। আমার দেশেরও যাঁরা এমনিভাবে দিন কাটান বিদেশে তাঁদের মনের পর্দায়ও তো এমনি করেই আপন দেশের কতো মধুর স্মৃতি ভেসে ওঠে। বারে বারে মাথা নুয়ে আসে আপনা থেকেই। সাধে কি কবি গেয়েছিলেন,—'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা।'

হয়তো যাবো। ওতো কাছেই ওয়াশিংটনের। তাই না?—খুব সিওর নই বলেই জিগ্যেস করলাম।

হ্যাঁ, খুবই কাছে। এই ধরুন মাইল চল্লিশেক।

তা হলে একবার অন্তত ঘুরে আসা অসম্ভব কিছু নয়।—বল্লাম আমি। আমার যাবার সম্ভাবনাতেই ভ্যান হোলেন পুলকিত।

সত্যি সত্যি যেতে হয়েছিলো আমাকে মেরিল্যাণ্ডের এক পল্লীভবনে। সান্ধ্য-ভোজের আমন্ত্রণ ছিলো সেখানে। সে সন্ধ্যায় একটানা ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক আজো ভুলতে পারি নি আমি। আমারও মনে পড়ে গিয়েছিলো সে ডাক শুনে হাজার হাজার মাইল দূরের আমার সেই ছেড়ে আসা গাঁয়ের কথা। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম। সে গল্প পরে বলবো।

আমেরিকারই ছোট্ট একটি পরিবেশ পেয়েছিলাম সেদিন সেই মার্কিণ ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে। এতোজন আমেরিকান নরনারীর সঙ্গে

বড়ো একটা মিলিত হইনি এর আগে। বিদেশ যাত্রার ঠিক মুখে এ অভিজ্ঞতার তাই মূল্য ছিলো অনেকখানি।

ছ'তিন দিন যেতেই আবার এক চিঠি এলো। চা-পানের নিমন্ত্রণ। হয় তাঁর বাড়িতে, নয় অফিসে চায়ের আসরে। আমার আমেরিকা যাত্রার বিধি-ব্যবস্থা নিয়ে একটু আলোচনা করতে চান মিস্ এডার্টন।

ফোনে কথা হলো। নির্দিষ্ট দিনে ইউসিস্ অফিসেই গেলাম ঠিক ঠিক সময়ে।

১৯শে নয় কিন্তু, আপনাকে যেতে হবে ১৮ই তারিখে। শনিবার শনিবার প্যান আমেরিকান প্লেন ছাড়ে কিনা তাই। ১৮ই শনিবার।—এডার্টন হাসতে হাসতে বললেন পরিচয় ও অভিবাদন-প্রত্যভিবাদনের পালা শেষ হলে।

তথাস্তু বলে সম্মতি জানালাম আমি।

আমেরিকার যে সব স্টেটে আমি যেতে চাই, যে সব স্থান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে আমার বিশেষ ইচ্ছে এবং যাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতে আমি খুশি হবো মোটামুটি তা জেনে নিলেন মিস্ এডার্টন। মার্কিণ পররাষ্ট্র দপ্তরে চলে যাবে সে তালিকা। আমার উপস্থিতির পর সেখানে আমার সঙ্গে পরামর্শ করেই তৈরি হবে আমার সফর-সূচী। তবু আগে থেকেই আমার ইচ্ছের কথা তাঁদের জানিয়ে রাখা আর কি!

কিলমারও ছিলেন সেখানে। নাম ও ঠিকানার একটি তালিকা দিলেন তিনি আমার দিকে এগিয়ে। বললেন, এঁদের সবার কাছেই আপনার কথা লিখে পাঠিয়েছি। আপনার সঙ্গে দেখা হলে এঁরা প্রত্যেকেই খুশি হবেন, আপনার জন্যে যা কিছু করা প্রয়োজন সানন্দে করবেন।

মনে জোর পেলাম একটু। বিদেশ-বিভুঁইয়ে এতো জন অজ্ঞাত বন্ধুর নাম ঠিকানা আগে থেকেই পেয়ে যাওয়া কম সুবিধের কথা নয়। আর যেমন তেমন লোক নন এঁরা, এক একজন জাঁদরেল সম্পাদক—কেউ কেউ আবার সংবাদপত্রের পাব্লিশার, আমরা যাঁকে বলি খোদ মালিক!

এঁদের কাছে কি লিখেছেন সে চিঠির একটা কপিও আমায় দেখতে দিলেন কিলমার। একটু বেশি বেশিই লিখে ফেলেছেন আমার সম্বন্ধে। পরিচয়ের অভাবের ফল হয়তো। হয়তো বা পত্র-লেখকের উদারতা কিংবা যাঁদের মাধ্যমে আমার পরিচয় সংগ্রহ করা হয়েছে আমার প্রতি তাঁদের পক্ষপাতিত্বই

এজন্যে দায়ী। কিন্তু আত্মকথা বাড়িয়ে বলার যুগে পরকে বড়ো করে দেখানো মোটেই সমর্থনীয় হতে পারে না।

অফিসে ফিরলাম সেই চিঠির কপি ও নাম ঠিকানার তালিকা নিয়ে। মূল্যবান এ সব কাগজপত্র সন্দেহ নেই।

কিন্তু সবই তো হলো, পাশপোর্টের যে দেখা নেই! শুধু করিৎকর্মা নয় বহুকর্মা সহকর্মী শ্রীঅনিল ভট্টাচার্যও গলদঘর্ম। তবু সে বলে, ব্যস্ত হবার কিছু নেই—সময় মতো ঠিক এসে যাবে।

দিন যায়। আর অল্প ক'টা দিনই হাতে আছে। কাজকর্মও প্রায় সবই শেষ। পাশপোর্টটা এসে গেলে আর শুধু ভিসার হাংগামাটা মেটানো। ব্যস!

কিন্তু পাশপোর্ট তো আসে না। আশ্চর্য লাগলো। লালবাজার থেকে একজন তরুণ ইন্সপেক্টর এসেছিলেন আমার অফিসে আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমার সইসাবুদ নিয়ে গেলেন। আমার দেওয়া ফটোর সঙ্গে আমার চেহারাও মিলিয়ে দেখলেন। তাঁর শ্রদ্ধাশীল ভদ্র ব্যবহারে বেশ মুগ্ধ হয়েছিলাম। যাবার সময় তিনি বলে গেলেন, এ কাজে সাধারণত সার্জেণ্টরাই এসে থাকেন। কিন্তু ডেপুটি কমিশনার আপনার কাছে আমাকেই পাঠালেন। কয়েক দিনের মধ্যেই আপনার পাশপোর্ট পেয়ে যাবেন।

হায়! অনেক দিন আগেই গত হয়েছে সেই কয়েকদিন। অনিলের গলায়ও আর সেই জোর নেই। আমার কাজটা করে দিতে না পারার দুঃখ তার চোখেমুখে।

নিজেই একবার খোঁজ করে দেখা যাক। ভাবলাম আমি। না হয় তো নাই-বা গেলাম, কী আর এমন! এমনি ভাব।

পাশপোর্ট অফিসে গেলাম একবার বিকেলের দিকে। অনেক কথাই মনে হলো পথে পথে। বৃটিশ আমলে কবে কি করেছিলাম বা করবো ভেবেছিলাম, তার জন্যে আমার জাতীয় সরকার আমার বিদেশ যাত্রার পথ রুখবেন, সে কেমন কথা। আর তো কোনো কারণ খুঁজে পাই না।

যাক্ শেষ পর্যন্ত শেষ মুহূর্তে পাশপোর্টটা পাওয়া গেলো। কাজেই আর যাত্রার দিনও পিছিয়ে দিতে হলো না।

ইতিমধ্যেই দু'চারটে সম্বর্ধনা সম্মানও কপালে জুটে গেছে। আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা বর্ষণ মাথা পেতে নিলাম। শ্রীঅরবিন্দ পাঠাগার, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন,

পশ্চিমবঙ্গ পৌর করদাতা সমিতি, পাইকপাড়া সুহৃদ সংঘ পাঠাগার এবং আমার জন্মগ্রামের অধিবাসীদের প্রতিষ্ঠান বজ্রযোগিনী সমিতির শুভ কামনা ও প্রীতির স্পর্শ দূর-দূরান্তের পথে পথেও অনুভব করেছি।

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভায় কয়েকজন সাংবাদিক এবং সাহিত্যিক বন্ধুও উপস্থিত ছিলেন। সভাশেষে সোদরোপম একজন কাছে এসে বললেন, সাহিত্যিক লোক, ফিরে এসে বই লিখবেন নিশ্চয়ই। ভালোই হলো। আপনি দেখে জানবেন আর আমরা আপনার দেখার ওপর লেখা বই পড়ে জানবো ওদেশের কথা।

আমি কোনো নিশ্চিত আশ্বাস দিতে পারিনি সেদিন আমার তরুণ বন্ধুকে। তবু বলেছিলাম, এ সামান্য কদিন ঘুরে একটা গোটা দেশ বা জাত-সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা তো সম্ভব নয় ভাই। বই লেখা তো আরো কঠিন। যাঁরা তা পারেন তাঁরা শক্তিশালী, তাঁরা অনেক বড়ো। তবে এ কথাও অবশ্যি ঠিক, সাহিত্যের সুন্দরবনে তো শুধু রয়াল বেঙ্গল টাইগারই থাকে না, হরিণশিশুও বিচরণ করে। কিন্তু তা খুবই ভয়ে ভয়ে। যদি মালমশলা জোটে আর সময় সুযোগ মেলে তাহলে আমিও না হয় চেষ্টা করে দেখবো ঐ হরিণশিশুর মতো সভয়ে সন্তর্পণে একটু ঘুরে বেড়াতে।

যাত্রা হোলো সুরু

আকাশে প্রবল ঝড়। সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি। সকাল থেকেই মেঘ মেঘ। বিকেল থেকে বর্ষণ আর বাতাসে পাল্টা পাল্টি।

কেবল বাধা আর বাধা। এ দুর্যোগে প্লেন ছাড়ে কখনো? ছাড়লেও একটা বিপদের ঝুঁকি থেকেই যায়।

শনিবারের বারবেলা, এক-আধটুকু গোলমাল তো হবেই জানা কথা। বারবেলাটা কেটে গেলে যদি আকাশের মেঘ কাটে।

এমন দিনেই বেছে বেছে যাত্রার দিন ঠিক করা হয়েছে, বলিহারি যাই!! —বিরক্তির স্বর ফুটে ওঠে আমার এক বুড়ো পিসেমশাইর মন্তব্যে। আমার অবিবেচনায় বিরক্ত তিনি। কিন্তু 'অশুভ' শনিবারকে এড়িয়ে শনিবারের প্লেন ধরা যে চলেনা তাঁকে তা বোঝাতে যাওয়া নিষ্ফল। আর ঝড়-ঝঞ্ঝা আপদ-বিপদ কি শুধু বেছে বেছে 'অশুভ' দিন-ক্ষণেই ঘটে? এ প্রশ্ন আর কাকে করি?

দুর্যোগের মধ্যেও আমার বাড়িতে তখন অনেক লোক। বন্ধু-বান্ধব ও আত্মজন সবাই এসেছেন যাত্রার আগে দেখা করতে। এমনি ঝড়-জলেও যাঁরা এসেছেন, আমার ওপর তাঁদের আকর্ষণ আন্তরিক। মেজদা বিশেষ অসুস্থ। তিনিও এসেছেন টালীগঞ্জ থেকে। আমি রাগ করেছি তার জন্যে। কান্তভাই আর বাচ্চা তো সেই সকাল থেকেই আমার সঙ্গে সঙ্গে। বাঁধাছাদা টুকি-টাকি সবই করছে ওরা আমার জন্যে।

বিকেল গড়িয়ে তখন সন্ধ্যে। আমার ঘরে তখনো গবেষণা, এমনি আবহাওয়ায় প্লেন ছাড়বে কি ছাড়বে না।

বেশতো একটা ফোন করেই জেনে নেয়া যাক না।—এগিয়ে এসে রিসিভারটা তুলে ধরে আমাদের বেবি-মা। গাইড দেখে আগেই সে টুকে নিয়েছিলো প্যান আমেরিকান এয়ারওয়েজের এয়ারপোর্ট অফিসের ফোন নম্বরটা। ফোনে চোস্ত ইংরেজিতে সে কথা বল্লে খানিকক্ষণ। বুঝলাম, ওদিকেও কোন সাহেব বা মেম সাহেব।

জানালো, ঠিক সময়েই প্লেন ছাড়বে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসবে, এই ওয়েদার রিপোর্ট। ব্যস্ সবাই নিশ্চিন্ত। ভাগ্যি টুক করে ফোনটা করেছিলো বেবি-মা! ছোড়দার বড়ো মেয়ে বেবি এমনি চট্-পটে।

সত্যি ধীরে ধীরে মেঘ কেটে যায় আকাশের। অন্তত এক ঘণ্টা আগে এয়ারপোর্টে পৌঁছনোর কথা। কাস্টমের গাপজোথ হাংগামায় সময় দরকার বেশ খানিকটা। এক ঘণ্টা কেন, আরো কিছু টাইম হাতে নিয়ে গেলেই বা কি ক্ষতি?

রাত সাড়ে আটটায়ই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। পাইকপাড়া থেকে সেই দমদম। পথতো বড়ো কম নয়।

সুদূর মার্কিণ যাত্রীর এমনি মনে হওয়া একটু কেমন কেমনই লাগে। তাই না? কিন্তু এযে যাবার আগের মনে হওয়া! কাজেই আশ্চর্য হবারও কিছু নেই।

ঝড়-জলে রাস্তার অবস্থাও আর ভালো নেই নিশ্চয়ই। কম করে হলেও তাই অন্তত আধ ঘণ্টা সময় লাগবেই দমদম পৌঁছুতে।

ঠিকই তাই। আমাদের তিন-চারখানা গাড়ি যখন বিমানঘাঁটিতে গিয়ে পৌঁছলো রাত তখন সোয়া ন'টা।

আত্মীয়-স্বজন সহকর্মীদের বাইরেও আরো অনেক শুভার্থী উপস্থিত বিমান-ঘাঁটিতে। যাঁদের কথা ভাবতেও পারিনি তেমন লোকও এসেছেন। বিশেষ করে ঝড়বাদলার দিন বলেই আরো বিস্ময়।

মন বল্লে, বিস্ময় কিসের! তোমার বিস্ময়ে যে ওদের ভালোবাসার অপমান!

চমকে উঠলাম। ঠিকই তো, নাইবা থাকলো আমার তেমন অর্থ-সামর্থ্য, এতো লোকের স্নেহ-প্রীতি লাভই কি বড়ো কম কথা?

যাঁরা বিদায় দিতে এসেছেন আমায় এয়ার-পোর্টে নিঃস্বার্থভাবেই আমায় ভালোবাসেন তাঁরা।

বন্ধুবর সুকমলকান্তি এসেছেন। কান্তি ঘোষেরা কোম্পানীর কর্তা আমাদের। কাজেই সুকমলবাবুর কি স্বার্থ থাকতে পারে আমার কাছে? কিন্তু মালিক হিসেবে তিনি আসেন নি, এসেছেন বন্ধুভাবে। মালিক কখনো

বন্ধু হতে পারে না কর্মচারীর, ও নিছক একটা পলিটিক্যাল স্লোগান। ওতে আমার আস্থা নেই। তবে সব মালিকই সব কর্মচারীর বন্ধুত্বলাভের যোগ্য, অন্তত আমার দেশে তা মনে করারও কোন কারণ নেই। আর মালিকে মালিকেই কি মৈত্রী থাকে সর্বত্র? এদেশে কর্মচারীদের মধ্যেও তা দুর্লভ। তা দুঃখের। তবে শুধু ব্যক্তিগত বিবেচনায় নয়, সমাজ ও জাতিগত স্বার্থের বিচারে মালিক-কর্মচারী সম্পর্ক মধুরতর হওয়া প্রয়োজন এ আমার স্থির ধারণা।

বহু কাজের মানুষ সুকমলবাবু। আমার প্লেন ছাড়ার একটু আগেই তাঁকে চলে আসতে হলো। কিন্তু তার আগে কাছে ডেকে একটা কথা বলতে ভুল হলো না তাঁর। জরুরি কথা। বন্ধুর মতোই কথা। বল্লেন, কোথাও কোন অসুবিধায় পড়লে বা হঠাৎ টাকা-পয়সার দরকার হলে সঙ্গে সঙ্গেই জানাবেন কিন্তু, ওখান থেকেই ব্যবস্থা করা যাবে।

পত্রিকা সিণ্ডিকেটের মাধ্যমে আমেরিকার অনেক বড়ো বড়ো পাব্লিশারের সঙ্গেই সুকমলবাবুর যোগাযোগ। তাঁদের অনেকের নাম ঠিকানাও তিনি দিয়েছিলেন আমাকে। তবে মার্কিণ মুলুকে কোথাও কোন অসুবিধায় পড়িনি আর ভাণ্ডার অনুযায়ী খরচ করে চলেছি বলে অর্থকষ্টও ভোগ করিনি। তাই কারুর সাহায্য নেবার কথাও ভাবতে হয়নি আমাকে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!

ইউসিস-এর সহকারী ইনফরমেশন অফিসার মিঃ রিচার্ড হিউজ। তিনিও এসেছেন তাঁর কয়জন সহকর্মী নিয়ে। বাসু পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার এই প্রথম দেখা। অল্পক্ষণের আলাপেই ধারণা হলো, ভদ্রলোক সদালাপী।

আপনার জন্যে একটা সংবাদ আছে মিঃ বোস।—বল্লেন মিঃ হিউজ।

কি সংবাদ?—জানবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলাম।

ফেরবার সময় পঞ্চাশ পাউণ্ড অতিরিক্ত লাগেজ পাবেন কথা ছিলো। তার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে।

সে কেমন?

পঞ্চাশ পাউণ্ড কমিয়ে ত্রিশ পাউণ্ড করা হয়েছে। নয়াদিল্লী থেকে আমাদের দূতাবাস আজই খবরটা জানিয়েছেন। তাই একেবারে শেষ মুহূর্তে জানাতে হলো। এজন্যে দুঃখিত।

ঠিক আছে, ও জন্যে আর কি?—কেনাকাটার ব্যাপারে একটু বেশি সাবধান হতে হবে জেনেও ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলাম।

কিন্তু কীই বা আর কিনবো। বাড়তি পয়সা থাকলে তো। কিছু কিছু বইপত্র হয়তো এদিক-ওদিক থেকে এসে জমবে। তেমন বেশি হলে না হয় অর্ডিনারি মেলে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। ও নিয়ে ভেবে কি হবে?

না, আর ভাবার সময়ও নেই। ডাক এসেছে কাষ্টমস্ থেকে।

আর একটু বসুন।—ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গেই আর একবার ফ্ল্যাস লাইট জলে উঠলো অনীলের ক্যামেরায়। অনীল ফটোগ্রাফার। তার ফটোর সাবজেক্ট থেকে ক্যামেরাম্যানের মনের রূপটি ধরা পড়ে। কিন্তু তার নামের বিশেষ বানানের অর্থ আজও অবধি উদ্ধার করতে পারিনি আমি।

অনেক ফটোই সেদিন তোলা হয়েছিলো এয়ার পোর্টে। কিন্তু তার একখানাও যায়নি আমেরিকায় আমার কাছে। তার একখানি গ্রুপ ফটো পেলে খুবই আনন্দ হতো নিশ্চয়ই। কিন্তু তা বলে কাউকেই কি ভুলে থাকতে পেরেছি বিদেশে? ভুলে থাকাতো দূরের কথা, দূরান্তে আরো বেশি করেই তাঁদের মনে পড়ে যাঁরা কাছের, যাঁরা আপন।

সব ঠিক আছে আপনার। আপনি চলে যেতে পারেন এবার প্লেনে।—কাস্টমস্-এর একজন অফিসার বল্লেন আমায়।

আমার সঙ্গে প্যান আমেরিকান এয়ার ওয়েজের একজন কর্মী।

চলুন, চলুন।—একটু তাগিদ দিলেন তিনি।

কি, এখুনি প্লেন ছাড়বে না-কি?—ঘড়ির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম।

না, না প্লেন নয়, প্লেনে আসন নেবার জন্যে যাত্রীদের ছাড়া হবে এখন। প্লেন ছাড়তে আরো মিনিট পনেরো বাকি।

তা হলে আর এতো তাড়ার কি আছে?—এই বলে পিছন দিকে তাকালাম আর একবার। দেখলাম, অনেকগুলো দৃষ্টির আলো ছড়িয়ে পড়েছে আমার যাত্রাপথে। সে আলোতে অনেক অনেক আশীর্বাদ, অনেকের শুভেচ্ছা।

বিমানে উঠে পড়লাম। নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসলাম। অভীপ্সিত আসনই পেয়েছি। ঠিক জানালার পাশে। প্লেনের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় নয়। সামান্য একটু পিছনের দিকে। সামনে দৃষ্টি মেলে দেওয়া চলে অনেক দূর অবধি। অন্তত খানিকটা স্বচ্ছ বিচরণের সুযোগ পায় চোখ।

কিন্তু আমার পাশের আসন খালি কেন? খালিই থাকবে নাকি! আহা, মনের মতো কাউকে যদি পাওয়া যায় কথা বলে সময় কাটানো যাবে তা হলে।

না। কেউ এলেন না। খালিই থাকলো আমার পাশের আসন। কেমন একটা শূন্যতা যেন ছেয়ে ফেললো আমাকে, আমার মনকে।

আরো জন বারো যাত্রী উঠলেন কোলকাতা থেকে। একজন মাত্র বাঙালী তার মধ্যে। ব্যবসায়ী তিনি। অর্ধ পথের আগেই নেমে যাবার কথা তাঁর। তা হোক, তবু তো অন্তত ঘণ্টা বারোর সঙ্গী। কাজ কারবারে দেশ-বিদেশে ঘোরাঘুরিতে তিনি অভ্যস্ত। একে বাঙালী, তায় আবার অভিজ্ঞ লোক। তাই তাঁর সঙ্গে একটু আলাপ করে নিয়েছিলাম এয়ার পোর্টে থাকতেই। ভেবেছিলাম, দুজন বাঙালী বেশ মিলে-মিশে যাওয়া যাবে। অন্তত যতোটা যাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের কথা, তা আর হয়ে ওঠেনি। চলার পথে আর তেমন যোগাযোগই করে উঠতে পারিনি ভদ্রলোকের সঙ্গে। জানি না তাঁর মনে কি ছিলো। দুজন বাঙালী মিলেমিশে একসঙ্গে বেশিদূর এগুতে পারে না, এও কি তাই প্রমাণ করে?

আপনার প্যান আমেরিকান এয়ার ওয়েজের ব্যাগ কোথায়? আনেন নি কাস্টমস্-এর কাউণ্টার থেকে?

নাতো!—অবাক হয়ে উত্তর দিলাম একজন বিমান-কর্মীর কথায়। সে ব্যাগে আমার খানকয় জরুরি বই আর কতগুলো ছোট-খাটো জিনিস-পত্র। সবই দরকারী।

চলুন, চলুন। মিনিট চার-পাঁচ সময় আছে এখনো। দেখে নিয়ে আসবেন ব্যাগটা।

কি যন্ত্রণার ব্যাপার দেখুন দেখি। কিন্তু যন্ত্রণা যতোই হোক ব্যাগটা আনতেই হবে। তা না হলে যে অসুবিধের অন্ত থাকবে না।

ছুটে গেলাম আবার কাস্টমস্-এ। দূর থেকেই দেখলাম্ কাউণ্টারে পড়ে রয়েছে আমার প্যান আমেরিকানের নীল ব্যাগ। গিয়ে তুলে নিলাম এবং ছুটতে ছুটতেই মৃদু তিরস্কারের সঙ্গে আমার অভিযোগ জানালাম কাস্টমস্ কর্মীদের। তাঁরা বলেছিলেন, আমার মালপত্র সব চলে গেছে প্লেনে। ব্যাগটা যে পড়ে রয়েছে তা তো কেউ জানাবে আমায়। কেউ জানান নি—কোন বিমানকর্মীও নয়, কাস্টমস্-এর লোকেরাও নয়

আমার লোকজন তখন সব অন্যত্র। দু'চার মিনিটের মধ্যেই বিমান উড়বে, তা ভালো করে দেখার জন্যে তারা উন্মুখ। কিন্তু তার বদলে আমায় ছুটো-ছুটি করতে দেখে ওদের যে কি দুশ্চিন্তা তা খুবই অনুভব করছিলাম আমি। আমি আলোতে। ওদের দিকে অন্ধকার। ওরা দেখছে আমায়। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছিনা কাউকে। তাই একটু জোর গলাতেই ডাকলাম রূপম্‌কে। ডেকে বল্লাম, তোমরা ভেবো না, সব ঠিক আছে।

কিন্তু রূপম্‌কে ডাকলাম কেন? এতো লোক থাকতে এতোটুকু ছেলেকে ডাকার মানে?

মনস্তত্ব বলে, মন স্বাধীন নয়। মনের কাজও চলে নিয়মমাফিক। কোন ছোট্ট ঘটনাও ঘটে না কারণ ছাড়া। এখানেও নিশ্চয়ই কারণ আছে।

বয়েস যতোই কম হোক, রূপম্ আমার বড়ো ছেলে। হয়তো আমার মনের সবচেয়ে বড়ো আশ্রয়। হয়তো আমার জন্যে ওর ভাবনাই সবচেয়ে বেশি, তাই হয়তো ওর নামটাই মনে এসেছিলো সেই মুহূর্তে। তাই হবে।

ঠিক রাত সাড়ে দশটায় প্লেন উড়লো। আমরা আকাশচারী। নিচে দমদম বিমান বন্দরের আলো-ঝলমল পরিবেশ। অদূরে নিশীথ-নগরী কোলকাতা ঘুমু-ঘুমু।

অনেকবার বিমানে যাতায়াত করেছি এর আগে। কিন্তু সে স্বদেশে এবং প্রতিবারই দিনের বেলায়। বিদেশ যাত্রাও এই প্রথম এবং রাত্রিতে বিমান যাত্রার অভিজ্ঞতাও তাই। দুদিক থেকেই আমার নূতন অনুভূতি।

বিপুলকায় বিমান। তার বিপুলায়তন ডানায় ভর করে উড়ে চলেছি। ওপরে উঠছি তো উঠছিই।

পনেরো হাজার ফিট ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে বিমান, একবার ঘোষণা হলো।

রাত তখন প্রায় এগারোটা। এবার ঘুমুলে হয় না?

আসন ছড়ানোর বোতামটা টিপে দিয়ে এলিয়ে দিলাম দেহ। সামনের দিকে টেনে নিলাম পা-দানটা। পা দুটো তার ওপর চড়িয়ে দিয়ে ঘুমুবার চেষ্টা করলাম চোখ বুজে।

কিন্তু চোখ বুজলেই তো ঘুম আসে না। আসে নানা রকমের ছবি। কিছু বাস্তব, কিছু স্বপ্নিল কল্পনা।

ওয়াশিংটনে পৌঁছেই প্রথম কি করণীয় আমার? এখন থেকেই সে চিন্তার ভিড়। তবে চিন্তাটা খুব দুশ্চিন্তা নয়। মার্কিণ পররাষ্ট্র দপ্তরের লোকদের সঙ্গে তো এয়ারপোর্টেই দেখা হবে। আমাদের দূতাবাসে যেয়ে জানা-পরিচয় করে নেবো সবার সঙ্গে। প্রথম দিন এই কাজ। মনে মনে এই ঠিক করে নিয়েছি মোটামুটি।

কিন্তু তুষারবাবুর চিঠিখানা আনা হয়নি তো! ছেড়ে আসা জামার পকেটেই বুঝি পড়ে রয়েছে!

শ্রদ্ধেয় তুষারবাবু তখন এলাহাবাদে। ঠিক যাত্রার আগের দিনই তাঁর চিঠি পেলাম। আমাকে জানিয়েছেন আন্তরিক কল্যাণ কামনা। সে সঙ্গেই একখানা ব্যক্তিগত পত্র দিয়েছেন শ্রীমেহতাকে।

আমেরিকায় আমাদের রাষ্ট্রদূত শ্রীগগনবিহারীলাল মেহতা। তুষারবাবুর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব। সে বন্ধুত্ব অনেক দিনের। তাই তাঁকে ঐ পত্র দিয়েছিলেন তিনি আমার মার্কিণ সফরের বিষয় জানিয়ে। আর সে পত্রের এমনি পরিণতি!

উড়ে বেড়াই আকাশ পথে

ভাবছি তো ভাবছিই।

হঠাৎ অনেক জোড়া চোখের আলো। আমার সামনে যেন দীপান্বিতা। মায়াকরুণ সব চোখের প্রদীপ। যারা বিদায় দিতে এসেছিলো তাদের শেষ দর্শন। ওরা যে যার বাড়িতে এখন। নিশ্চয়ই গিয়ে পৌঁছেছে এতোক্ষণে। তা না হলে যে ওদের অনেক কষ্ট। এখন যে অনেক রাত!

সবার কথা মনে পড়লো কেন হঠাৎ? ঘুমের সময় হলো যে। আমার জন্যে ওদের ঘুমের ব্যাঘাত!

নিজের চোখেও কখন ঘুম নেমে আসে। চোখ জুড়োনো ঘুম। অন্ধকার বেশ পুরু হয়ে উঠছে চোখের পাতার নিচে। বেশ অনুভব করছি।

পাশের সুইসটা কে টিপে দিয়ে গেলো যেন। খুট্ করে একটা ছোট্ট শব্দ পেলাম। বাইরের পাত্‌লা অন্ধকার তাই আরো ভারি।

তারপর কতোক্ষণ কেটেছে কে জানে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়।

কে?

Oh, I am sorry—হাত দুখানা তুলে নেন এয়ার হোস্টেস। তাঁর মৃদু হাসির বিদ্যুৎ অগভীর অন্ধকারে।

এয়ার হোস্টেস মানে বিমান-বান্ধবী। একা নন। সংখ্যায় ওঁরা কয়েকজন। সত্যি সত্যি বান্ধবী ওঁরা নির্বান্ধব বিমানপথে। সবার সেবায় সবার কাজে সদাব্যস্ত। আমার কাজে এসেছিলেন একজন। কাজ শেষে আধো অন্ধকারের মধ্যেই মুহূর্তে অগোচর।

না, একটু শীত শীতই লাগছিলো। অনেক ওপরে উঠেছি তো। তাই গরম পোষাকের নিচেও শীতের লুকোচুরি। ভালোই হলো কম্বলটা পেয়ে। চমৎকার 'রাগটি' জুড়ে সে কী অনুপম অনুরাগ! সারা গায়ে জড়িয়ে নিলাম। এয়ার হোস্টেস্‌কে মনে মনে ধন্যবাদ।

অবিরাম চলেছে প্লেন। সে চলার শব্দ ততোক্ষণে কানসহা। ঘুমও তাই নির্বিঘ্ন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই এগিয়ে চলেছি। কিন্তু পথ যে অনেক দূর।

আমাদের বিমানের প্রথম মাটি স্পর্শ। আমরা করাচীতে। তখন শেষ রাত। বিমানবন্দরের ঘড়িতে চারটা বেজে পনেরো। নিজের ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে নিলাম। মনে পড়লো অনেক কাল আগে লেখা আমার একটি কবিতার দু' তিন লাইন—

ঘোরাও ঘড়ির কাঁটা,
সূর্য নড়িবে না।
সত্য অচঞ্চল!

করাচী। মনোরম পরিবেশ। নেয়ে ওঠলাম সমুদ্র-হাওয়ায়। আহা, মরি মরি! 'হৃদয় আমার নাচে রে' !!

এই করাচী আজ বিদেশ। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম সে কথা। সেই দুঃখ দারিদ্র্য, সেই ক্লিষ্ট মানুষ, সেই পরিবেশ! অস্বাভাবিক নয় ভুলে যাওয়া। কিন্তু মনে পড়লো, আমার পাশপোর্ট যখন চাইলেন এসে করাচী এয়ারপোর্টের একজন কর্মচারী। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করাচী আজ বিদেশ! তবে হয়তো মনের কাছে নয়।

এই বিমান বন্দরেই আলাপ হলো শিকাগোর এক প্রোফেসরের সঙ্গে। সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক তিনি। যতোদূর মনে পড়ছে নাম মিঃ ফিলিপ এম হোজার। ষষ্ঠবার পৃথিবী পরিক্রমা নাকি শেষ হলো তাঁর। এখন ঘরে ফেরার পালা। পথে প্যারিসে কটা দিন কাটিয়ে যাবার ইচ্ছে।

অধ্যাপক হোজারের সঙ্গে খাতির জমে উঠলো খুব। চায়ের টেবিলের খাতির। চা নয় কফির টেবিলের। দুজনেই কফি নিয়েছিলাম। অনেক কথা হলো। কথায় কথায় উঠলো আমেরিকার পত্র পত্রিকা প্রসংগ।

শিকাগো ট্রিবিউন মস্তো বড়ো কাগজ, কিন্তু বড্ড প্রগতিবিরোধী। —বল্লেন অধ্যাপক।

এ কাগজের নামডাক শুনেছি। যথার্থ পরিচয় জানা ছিলো না। তাই একটু তাজ্জব লাগলো হোজারের কথায়।

দেশের বাইরের কোন ব্যাপারেই আমেরিকার মাথা গলানো পছন্দ নয় এ পত্রিকার। এ যুগেও এমন নীতির পরিপোষক হতে পারে কোন সংবাদপত্র, এ একটু আশ্চর্যের বৈকি!

অধ্যাপক আরো বল্লেন—জানেন, আমি নিজে শিকাগোর লোক। কিন্তু শিকাগো ট্রিবিউন আমি কখনো পড়ি না। নিউইয়র্ক টাইমস-এর আমি বাঁধা গ্রাহক।

আরো অবাক হলাম। বল্লাম, আমারও যে শিকাগো ট্রিবিউন পত্রিকা অফিস পরিদর্শনের কথা আছে। কিন্তু এসব শোনার পর কি আর মন যেতে চাইবে সেখানে ?

শিকাগোতেও প্রোগ্রাম আছে বুঝি আপনার ?—প্রশ্ন করলেন প্রোফেসর হৌজার।

হ্যাঁ, সেখানে যেতেই হবে আমাকে।—শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে স্বামীজীর বক্তৃতার কথা পাড়লাম।

অধ্যাপক এড়িয়ে গেলেন সে প্রসংগ। হয়তো কিছুই জানা নেই তাঁর স্বামীজী সম্বন্ধে। কিন্তু আমায় স্বাগত জানালেন তাঁর নিজের শহরে।

শিকাগোতেই আমার বাড়ি, আগেই বলেছি আপনাকে। আপনি যাবেন সেখানে, আনন্দের কথা। আমার বাড়িতে একদিন গেলে আরো খুশি হবো। —গভীর আন্তরিকতা অধ্যাপকের কণ্ঠে।

যাবো, যাবো—নিশ্চয় যাবো সময় করে উঠতে পারি যদি।—বল্লাম আমি তাঁর সহৃদয়তায় মুগ্ধ হয়ে।

কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন মিঃ বোস, Chicago is a city of gangsters !—এই বলে অধ্যাপক মশায় তাঁর একখানা কার্ড এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। তাঁর বাড়িতে আমার আগাম আমন্ত্রণ যে !

কিন্তু কার্ডে শুধু মিঃ হৌজারের আফিসের ঠিকানা। উল্টো পিঠে বাড়ির ঠিকানাটাও তিনি তাই লিখে দিলেন নিজের হাতে।

দস্যুনগরী শিকাগো !

কৌতূহল জাগে শিকাগোর বিস্তৃত পরিচয় জানতে। কিন্তু সময় নেই। অধ্যাপকের সঙ্গে এ আলাপের ছেদ টানতে হলো সেখানে। কফির কাপ শূন্য করে উঠে এলাম দুজনেই।

এলাম লাউঞ্জে।

সেখানে এক মজার ব্যাপার। মা আর মেয়ে ভয়ে জড়োসড়ো। ওরা বিদেশিনী। হয়তো বা মার্কিণীই। তবে সঠিক জানা নেই।

একটা আরশোলাকে গলাধঃকরণে উদ্যত একটা মস্ত বড়ো টিকটিকি। দুর্বলের ওপর সবলের পীড়ন। ঘটনাটা ঘটছে মা-মেয়ের সামনেই। একেবারে ওদের পায়ের কাছে। তাই ওদের এতো অস্বস্তি। পা তুলে বসেও ভয় থেকে নিস্তার নেই। কে জানে লাফাতে লাফাতে আবার গায়ের ওপরই এসে পড়বে কিনা ও দুটো! কিছুই বিশ্বাস নেই।

সেদিকে নজর পড়লো মিঃ হোজারের। তিনি ছুটে গেলেন অকুস্থলে। প্রাণপণ প্রতিরোধে তখন আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিলো আরশোলা। হোজারের হস্তক্ষেপে মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পেলো সে। কোথায় যে ছুটে পালালো টিকটিকি তার কোন পাত্তাই পাওয়া গেলো না আর।

ভয়-বিহ্বল মা-মেয়েরও ত্রাস-মুক্তি ঘটলো এতোক্ষণ বাদে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ওঁরা। সহজ সোজা হয়ে বসলেন।

এসব পোকামাকড় টিকটিকি গিরগিটির কোন রকম উৎপাত নেই আমাদের দেশে। গেলেই দেখতে পাবেন।—বল্লেন মিঃ হোজার।

আমি কিন্তু ভাবছিলাম তখন অন্য কথা। ভাবছিলাম সাম্রাজ্যবাদী ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর কথা। আমেরিকার কথাও।

আজও পররাজ্য শোষণের লোভ ত্যাগ করতে পারলো না ইংরেজ ফরাসী পর্তুগীজ! আর তুমি আমেরিকা, অনেক গালভরা নীতিকথাই তুমি শোনাও সারা দুনিয়াকে। তোমার স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা, তোমার গৌরবময় অতীতের কথা জানি। আজ বিপুল শক্তির অধিকারী তুমি। কিন্তু তোমার এ বিপুল শক্তি যে তোমার অসীম কলংকের বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে সে সম্পর্কে কি সজাগ তুমি আমেরিকা? তুমি যদি অন্যায় আক্রমণকারীর ভরসা আর সাম্রাজ্যবাদীরই সহায়, তাহলে পৃথিবীর সাধারণ মানুষ বিশেষ করে এশিয়া আফ্রিকার ঔপনিবেশিক নির্যাতনের অভিজ্ঞতাজর্জর জনসাধারণ তোমার শক্তিতে ভীত সন্ত্রস্ত বোধ করবে না কেন, তোমার কথায় তোমার প্রচারে বিশ্বাস করবে কেন? আর তুমি যদি তোমার শক্তি প্রভাবে এবং কাজের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করতে পারো যে তুমি ন্যায়ের পক্ষে, তুমি দুর্বলের বন্ধু তাহলে এতো শত প্রচারের কোন প্রয়োজনই করবে না।

ঐ ছোট্ট ঘটনার পর এসব কথাই ঘুরপাক খাচ্ছিলো মনে। অধ্যাপক

হৌজার পাইপ ধরাচ্ছিলেন। এই আসছি বলে যে কোথায় গেলেন আর দেখা হলো না করাচী এয়ারপোর্টে।

ঘড়ি দেখলাম। সময় হয়ে গেছে প্লেন ছাড়বার। যাত্রীরা উদ্যোগ করছেন পুনর্যাত্রার। আমিও উঠলাম।

আবার আকাশ। আবার সময়ের দীর্ঘ পরিক্রমণ। এক ঝাঁক কলমুখর যাত্রীর মধ্যে গিয়ে আবার বিমানে আত্মগোপন করলাম আমি।

তখন রাত ভোর। ব্রাহ্মমূহূর্তে সমুদ্রস্নান শেষ সূর্যদেবের। সবেমাত্র তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটছে আকাশে। আকাশ থেকে সে দৃশ্য অপূর্ব!

আমি তৃষ্ণার্ত। সকাল বেলার সংবাদ পিপাসায় কাতর। খবরের কাগজ চেয়ে নিলাম একখানা। পাকিস্তানী পত্রিকা। সংবাদ সামান্য। প্রোপাগ্যাণ্ডার ছড়াছড়ি। ভারত-বিরোধী প্রচারে অপার আনন্দ পাকিস্তানী সাংবাদিক বন্ধুদের। পারস্পরিক বিদ্বেষ প্রচারের এ পাপ থেকে কবে যে নিবৃত্ত হতে পারবো আমরা, সে কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু কাদের অদৃশ্য হস্ত যে ভারত-বিদ্বেষ প্রচারের যোগানদার তা কি আর আমাদের অজানা। সে হাত পুরোনো, সে হাত অতি পরিচিত।

চেয়ারের হাতলে টেবিল বসে চটপট। খাবারের টেবিল। আমার প্রায় বন্দীদশা।

ব্রেকফাস্ট পরিবেষণে বিমানবান্ধবী! ব্রেকফাস্টে অনেক উপচার। কতক খেলাম। কতক উদ্বৃত্ত।

খাবার শেষে তুলে নেওয়া হলো টেবিলটা। ভাঁজ করে রেখে দেওয়া হলো আমার সামনের আসনের পশ্চাৎ পকেটে। সে পকেটে রাখা আছে অনেক কিছু। অনেক কাগজপত্র খবরাখবর। খান কয়েক পোস্টকার্ড। আরো কি সব।

টেবিলটা তুলে ফেলায় স্বস্তি বোধ। বড্ড বাধো বাধো ঠেকছিলো। উঠে চলে গেলাম গোছলখানায়। ইলেকট্রিক সেভিংএর সুন্দর ব্যবস্থা সেখানে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফিটফাট হয়ে আবার চলে এলাম নিজের সীটে।

অনেকটা আরাম। এরই মধ্যে অনেকটা অভ্যস্ত পরিবেশ। তাই সবই যেন জানা জানা।

মাইকে ঘোষণা হলো, পরবর্তী অবতরণ বেরুটে।

একখানা চিঠি লেখা যাক। বাড়ির সবাই খুব খুশি হবে আমার চলার পথের চিঠি পেয়ে। সবাই নিশ্চিন্তও হবে। কল্যাণকে লিখলাম, আমি নিরাপদ। কল্যাণ আমার রূপমের ভালো নাম।

এবার মধ্যাহ্ন ভোজনের উদ্যোগ। বিমানবান্ধবীদের ছুটোছুটি সুরু। আবার সেই টেবিল। সেই সব সাজ-সরঞ্জাম।

প্রভূত খাবার। অর্ধেকেই উদরপূর্তি। বাকিটা বাতিল।

সরাব একটু? এক পেগ?

না, ধন্যবাদ।—আমায় নিতান্তই অরসিক ভাবলেন হয়তো এয়ার-হোস্টেস। এগুলো বোতল পিছিয়ে নিলেন সামনে থেকে। তাঁর মিষ্টি হাসিটুকুও মিলিয়ে গেলো।

আমার কফির কাপ থেকে তখনো ধোঁয়া উঠছে।

বেলা প্রায় একটা। এক মিনিট বাকি। মাটির গন্ধ পেলাম। হ্যাঁ, ঠিকই। বেরুট এয়ারপোর্টে এখন আমাদের বিমান।

বেরুট। লেবাননের রাজধানী বেরুট। প্রাচীন এই সমুদ্র-নগরী প্রকৃতির দুলালী লেবাননের মধ্যমণি। মধ্যপ্রাচ্যের সুইজারল্যাণ্ড যেন এই দেশ। সুদীর্ঘ কাল সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত তুষার-শুভ্র এই নতুন স্বাধীন পাহাড়ী রাষ্ট্র লেবাননের কতো পুরনো ইতিহাস! মাত্র লাখ তেরো লোকের ছোট্ট সেই অতি সুন্দর দেশে আমরা। দুর্ভাগ্যের দিক থেকে ভারতের সঙ্গে এদেশের অনেক মিল। সাম্প্রদায়িক রেষারেষি ভারতের মতোই মধ্যপ্রাচ্যের এদেশটির নাম-মহিমাকে কলংকিত করেছে বারবার। 'লেবানন' কথাটির অর্থই যে শুভ্রতা। সে শুভ্রতায় কালিমা লেপন যুগে যুগে। মুসলমান, খৃষ্টান ও ড্রুস্‌দের সংঘর্ষের সুযোগে ব্যাবিলোনিয়ান, আসিরিয়ান, গ্রীক, রোমান ও তুর্কীদের আধিপত্য বিস্তার। প্রথম মহাযুদ্ধে তুর্কী শক্তি বিতাড়িত লেবানন থেকে। কিন্তু বিজয়ী 'মিত্রশক্তি'র ব্যবস্থাপনায় সঙ্গে সঙ্গেই ফরাসী কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা। আর সেই থেকেই যেন সকল শ্রেণীর লেবাননবাসীর মনে স্বাধীনতার অগ্নিজ্বালা সুরু। সেই জ্বালার সফল পরিণতি ধাপে ধাপে। দুবছরের মধ্যেই ফরাসী কর্তৃপক্ষের এক ঘোষণায় লেবাননের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ। এই বেরুট থেকেই সেই ঘোষণা ১৯২০ সনে। আর সিরিয়ার অংশ নয়—লেবাননের পৃথক রাষ্ট্রসত্তা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী। কিন্তু ফরাসী মুরুব্বিয়ানায় পৃথক

রাষ্ট্রসত্তায়ও অতৃপ্ত লেবাননবাসী। খৃষ্টান স্বার্থরক্ষার অজুহাত দেখিয়ে ফরাসী শক্তির আত্মরক্ষা অসম্ভব হয়ে ওঠে ক্রমে ক্রমে। ১৯৪৬ সনে সাম্রাজ্যবাদী ফরাসী মানে মানে বিদায় তাই এ দেশ থেকে। সেই থেকে সত্যি সত্যি শ্বেতশুভ্র লেবানন। ভূমধ্যসাগরের ঘন নীল জলে স্বচ্ছ হাসি। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরেও কেন সাম্প্রদায়িক হারে হিসেব নিকেশ? সম্প্রদায়গতভাবে এখনো এখানে রাষ্ট্রীয় পদ বিন্যাস। সেখানেই যে আবার ভবিষ্যৎ বিপদের ঝুঁকি। ষড়যন্ত্রের সুযোগ। সাম্প্রদায়িকতার চরম শিক্ষা আমাদেরও যে হাড়ে মাসে। আমরা ভুক্তভোগী।

বিরাট বিমান বন্দর বেরুট। ভারি সুন্দর। তেমনি ভিড়। পাশপোর্ট জমা রেখে সেই ভিড় ঠেলেই সবাই গেলাম রেস্তোরাঁয়। বিমান ঘাঁটিরই রেস্তোরাঁ দোতলায়। ওদের অতিথি আমরা। একটু আপ্যায়ন করবে না আমাদের? ওদের আমন্ত্রণপত্র আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে। সে পত্র টেবিলে রেখে চেয়ার ঝাঁকিয়ে বসলাম এক একজন। সুপানীয়ের ব্যবস্থা। যার যা ইচ্ছে হুকুম হলেই বিনে পয়সায় তামিল। অবশ্য একবারমাত্র। দ্বিতীয়বার থেকে হাত পড়বে নিজের ট্যাকে।

আমরা টেবিলে চারজন। একজন পাকিস্তানী। ছাত্র তিনি। তিনিও আমেরিকা যাত্রী। গরম লাগছিলো। আমরা দুজনে লেমনজুস নিলাম। তাতেই তৃপ্তি।

আমার একপাশে বসেছিলেন এক ভদ্রমহিলা। আর একপাশে মধ্যবয়সী একজন ইয়োরোপীয় ভদ্রলোক। ওঁরা মুখোমুখি। ভদ্রলোক সংযতবাক। মহিলাটির মুখে কথার তুবড়ি। আমরা তিনজন তাঁর একাগ্র শ্রোতা।

আমেরিকান শিক্ষয়িত্রী ভদ্রমহিলা। বিদেশ ভ্রমণ শেষে স্বদেশযাত্রী। এশিয়ার পূর্বাঞ্চল সফরে প্রাচ্য জগতের জ্ঞানাহরণ। সে সব দেশের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় পশ্চিমীরা যাকে বলেন সুদূরপ্রাচ্য। আমরাও তা বলি কেন? ওদের অনুকরণে। অন্ধ অনুকরণ অভ্যাসের এ এক অভিশাপ। নিকটকে দূর বলে ভাববার শিক্ষা। শুধু দূর নয়, 'সুদূর'। কী আশ্চর্য! অথচ আমাদের চিন্তার রাজ্যে গোটা এশিয়া এক, এ ধারণা আজ কতো প্রয়োজন! সুসংহত গণতান্ত্রিক এশিয়া!

থাক সে কথা। ঐ মহিলার বক্তব্যই বলি। তিনি খুব খুশি নন তাঁর সদ্য সমাপ্ত সফরের অভিজ্ঞতায়। সব আমেরিকানই ধনকুবের, এ ধারণা লক্ষ্য

করেছেন তিনি পূর্ব এশিয়ার নানা দেশে। আমেরিকান বলেই অনেক জায়গায় তাঁর কাছ থেকে বেশি বেশি নেওয়া হয়েছে, এ অভিযোগও করলেন তিনি।

তা, বিদেশে বেরুলে একটু বেশি বেশি খরচ হয়ে যায় বৈকি! আর তা হয়তো সব দেশেই হয়ে থাকে।—মৃদু প্রতিবাদের স্বরে ভদ্রমহিলার অভিযোগের উত্তর দিলাম আমি। উত্তর দিলাম সসম্ভ্রমে। একে মহিলা। তার ওপর বেশ বয়স্কা এবং শিক্ষয়িত্রী। কাজেই আমার কথায় প্রতিবাদের রেশ থাকলেও বিনয়ের অভাব ছিলো না।

ওদের বয়েস অবশ্য আন্দাজ করা কঠিন। অনেকটা আলেয়ার মতো। তাহলেও ভদ্রমহিলা যে পঞ্চাশোর্ধে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিলো না। তরুণীজনোচিত পোষাক-সজ্জাও তাঁর বয়েসের হিসেবকে চাপা দিতে পারেনি।

অতো কাছাকাছি বলেই হয়তো দৃষ্টিভ্রম ঘটেনি আমার। তাই মন বলছিলো, কোথাও হয়তো কমকে বাড়িয়ে বলে একটু সুবিধে করে নেবার চেষ্টা, আবার কোনো কোনো দেশে হয়তো কোনো কোনো ব্যাপারে বেশিকে কমিয়ে দেখানোর আপ্রাণ প্রয়াস। এর কোনোটাই কি ভালো?

আমার সবিনয় উক্তির সজোর জবাব। ভদ্রমহিলা বল্লেন, না তা নয় মশাই, আমার দেশে বাঁধা দরে বেচাকেনা, যান যদি কখনো দেখতে পাবেন।

আমি বল্লাম, যাচ্ছিই তো!

তা বলেই চুপ। ও খবর তো সবারই জানা। তবু ঐ মহিলার কথায় আরো আশ্বস্ত। নিজের দেশের যা কিছু ভালো তা নিয়ে কেইবা না বড়াই করে? তাই ভদ্রমহিলার এই গৌরব বোধে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবৃদ্ধি।

আমি খুব ক্লান্ত।—রেস্তোরাঁয় আসন নিতে নিতে বলছিলেন শিক্ষয়িত্রী। কিন্তু অবিশ্রান্ত আলাপ আর আকণ্ঠ পানে তাঁর সে ক্লান্তি কতোটা দূর হয়েছিলো তিনিই জানেন।

শহর ঘুরিয়ে দেখানো হবে। বেরুট শহর। ব্যবস্থা করেছেন প্যান আমেরিকান এয়ারওয়েজ। সুব্যবস্থাই বটে। আনন্দ শুনে। ডাক পড়লো।

এয়ারওয়েজের ভাড়া মোটরে বেরিয়ে পড়লাম পথে। কয়েকখানা গাড়ির মিছিল। ঘুরে বেড়ালাম গোটা বেরুট শহর। বেরুটের সাগরবেলায়। ভূমধ্যসাগরের তীরপথে।

তাতল সৈকত। সমুদ্রতীর যেন ছবির মতো। উন্মুক্ত আকাশের নিচে উদ্দাম তরংগের উদাত্ত আকুলতা। পাড়ে পাড়ে বড়ো বড়ো হোটেল। মনোরম রূপ এক একটির। মনোহর প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের কারিকুরি। প্রকৃতি আর মানুষ। দুয়ের যোগাযোগ ফল। সৌন্দর্যের সফল প্রকাশ।

মন টানে। দু'একটা দিন থেকে গেলে হয় না এখানে? বেরুটে কিংবা ইডেন রো হোটেলে?

না, একটানা যাবার কথা যে নিয়ইয়র্কে!

বালুবেলায় ছেলেমেয়েরা এদিক ওদিক। বেপরোয়া যৌবন মহিমায় উজ্জ্বল একদল। চলতে চলতে সেদিকে চোখ। পরনে তাদের সাঁতার-পোষাক। সবে মাত্র সাঁতার পর্ব শেষ করে ওপরে তারা। আর একদল তখনো জলে। হৈ-হুল্লোড় হুড়োহুড়ি তাদের ঢেউয়ে ঢেউয়ে। এসব দেখে কারুর যদি ভালো না লাগে, নাইবা লাগলো। ওরা 'ডোণ্ট কেয়ার'।

তীরে তীরে সাধারণ মানুষের আনাগোনা। কারুর হাতে চানাচুর, কারুর হাতে ভুট্টা। কেউ বিকছে, কেউ কিনছে। নতুন পরিবেশে আমার চোখে নতুন স্বাদ।

বেরুট শহরের সব চেয়ে পরিচ্ছন্ন আমেরিকান ইউনিভার্সিটি এলাকা। কিন্তু এখানে আমেরিকান ইউনিভার্সিটি? এ প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক। বেরুটের এই আমেরিকান ইউনিভার্সিটি মধ্য প্রাচ্যের সেরা বিদ্যায়তন। তার সামনে সমুদ্র। চারিদিকে মনোরম বাগ-বাগিচা। সেই বাগানের ভেতর দিয়ে আমাদের মোটর যাত্রার অভিজ্ঞতা অবিস্মরণীয়।

ভিখারী চোখে পড়লো বাজার এলাকার পথে পথে। একজন নয়, একাধিক। অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু সব। মন বিষিয়ে উঠলো। এখানেও আমার দুর্ভাগা দেশের চেহারা। এই আমার এশিয়া!

ঘোরাঘুরি শেষ করে ফেরার পথে এলাম বেরুটের ইণ্ডিয়ান স্টোরে। উদ্দেশ্য কেনাকাটা। ইণ্ডিয়ান স্টোরের খুব সুনাম। ভারতীয় শাড়ি-গহনা আর নানা শিল্প-সম্ভারের সমাবেশ সেখানে।

কেনাকাটায় মেয়েদের উৎসাহ চিরন্তন। ওঁরাই যা কিছু কিনলেন। প্রায় সবাই বিদেশিনী। দু'একজন পুরুষ ক্রেতা যাওবা দেখা গেলো তাঁরাও কিনলেন

মেয়েদের অলংকার। বিশেষ করে অংগুরীয়। দুষ্মন্ত শকুন্তলার কাহিনী মনে পড়লো।

মোটর ভ্রমণে এক দিল্লীবাসিনীও সহযাত্রী ছিলেন আমাদের। তাঁরও গন্তব্য নিউইয়র্ক। শিক্ষার্থী তিনি। সবাই আকৃষ্ট তাঁর সহজ আন্তরিকতায়। ইণ্ডিয়ান স্টোরে অনেকেই কৃতার্থ তাঁর পরামর্শ গ্রহণে। সুপরামর্শই দিয়েছিলেন তিনি সকলকে।

লণ্ডনের এক ভদ্রলোকও ছিলেন আমাদের সংগী। বেশ গুরুগম্ভীর। কম কথার মানুষ। খানিক আলাপ পরিচয়ের পর কার্ড দিলেন আমায়। নাম মিঃ ই হ্যাসলাম। এক ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের ডাইরেক্টর। আমার লণ্ডন থাকার সময়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানালেন। দুঃখের কথা, তাঁর সঙ্গে আর দেখা করার সুযোগ হয় নি। তিনি কাজের মানুষ। আমারও সময় অল্প। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সূচী। তাই আর দেখা হয় নি।

কিন্তু সামান্য আলাপেই বড্ড ভালো লেগেছিলো মিঃ হ্যাসলামকে। বৃটেনের দুর্দিনের কথা বলছিলেন। প্রশংসা করছিলেন পূর্বপ্রান্তিকদের, তাঁদের সারল্যকে। ফিরছিলেন তিনি রেংগুণ থেকে। সেখানে গিয়েছিলেন মাত্র দিন পনেরো আগে কি একটা কাজে। হয়তো কোন কণ্ট্রাক্টের কাজে। কিন্তু কাজ শেষে ফেরার পথেও তিনি ভুলতে পারছিলেন না ব্রহ্মবাসীদের সরল সুন্দর জীবনের কথা, তাঁদের আতিথেয়তার কথা। আমারও দীর্ঘকাল মনে থাকবে হ্যাসলামকে।

এবার ফিরতি পথ। বেরুট শহর থেকে ফিরছি বিমান বন্দরের দিকে। শহরতলীর রাস্তায় পড়ে হঠাৎ খুব ভালো লেগে গেলো। নতুন পথ। দুধারে গাছের সারি। দুদিক থেকেই সবুজের হাতছানি। যাবার পথে কিছুই লক্ষ্য করিনি। একেবারে মুগ্ধবোধ হয়েই ছিলাম বুঝি! এখন চোখ ফেরানো দায়।

হঠাৎ কোথা থেকে যেন একটা কান্নার কোরাস ভেসে আসছে যেন! অনেক লোকের একত্র কান্না।

এ কি ব্যাপার?—জিগ্যেস করি ড্রাইভারকে।

ঐ পাহাড়ী গাঁয়ে ড্রুসদের কেউ মারা গেছে। ড্রুসদের কেউ মরলে কয়েক সপ্তাহ ধরেই এমনি ধারা কান্না চলে। কবরখানায় গিয়ে নিত্য এমনি দল বেঁধে কান্না তাদের মেয়েদের নিয়ম। মৃতের নাম চিৎকার করে করে কাঁদে তারা।

নিজেদের লোক কম থাকলে পড়শি বা জানাশুনা ভাড়া করে নিয়ে আসে তারা এই কান্নার জন্যে। কেঁদে কেঁদে তারা মৃতের আত্মার সদ্গতির জন্যে প্রার্থনা জানায়। শোক-প্রকাশের এই তাদের একমাত্র নিয়ম।—ড্রাইভার আমাদের বুঝিয়ে দিলে এইভাবে।

এয়ার পোর্টে এসে শহরের দিকে একবার চোখ ফেরাই। তাকাই সমুদ্রের দিকে। মনে হলো কোন শিল্পীর হাতের সাজানো একটি স্বপ্নপুরীর মডেল আমার চোখের সামনে। বেরুটের রূপমুগ্ধ আমি।

প্লেনে উঠলাম। ঘুরে বেড়িয়ে এসে শরীরটা বেশ ঝরঝরে তখন। মনও প্রসন্ন। আমার পাশের আসনে পেলাম নতুন যাত্রী। তাতে আরো আনন্দ। আর বোবা হয়ে থাকা নয়। সে কি বড়ো কম কথা? কিন্তু আমি দুর্ভাগ্য। নবাগত অন্যভাষী। আমার কাছে অবোধ্য তাঁর ভাষা। আর ইংরাজি তাঁর অজানা।

অগত্যা একখানা ম্যাগাজিনকেই করে নিতে হলো পথের সাথী।

বিমান উড়লো।

এশিয়া ছেড়ে ইয়োরোপে

ওঠা আর নামা।

'লুক' পত্রিকায় সবেমাত্র চোখ বিস্তার। মনের দৃষ্টি বরফ জমাট। একখানি মার্কিণী ছবির ওপর পূর্ণগ্রাস বিস্তার।

কিন্তু নামছি যেন! অধঃপতন নয়। অবতরণের অনুভূতি। এতো শীগ্‌গিরই আবার মাধ্যাকর্ষণ? অবাক লাগলো একটু। বোধ হয় নামা নয়। অন্য কিছু।

না, তাই।

আমরা আবার নতুন বন্দরে। ইয়োরোপীয় তুরস্কের ইস্তাম্বুলে। পুরোনো রাজধানীর নতুন নাম। পুরোনো বোতলে নতুন মদ আর কি! তখনকার নাম কন্সট্যান্টিনোপ্‌ল। খলিফার যুগের সেই ঐতিহাসিক রাজধানী শহর। এখন রাজধানী আন্‌কারায়! এশীয় তুরস্কে।

মনের আকাশে তুর্কী সাম্রাজ্যের চিত্র। চোখ ধাঁধানো বৈচিত্র্য। বিশালতায় বিপুল। একদিকে বল্‌কানের তুষারধবল প্রান্তশ্রী। আর একদিকে লিবিয়ার তপ্ত বালুকাভূমি। কী বিরাট বিস্তৃতি! সে তুলনায় কামালের তুরস্ক কতোটুকু! একটি পাপড়ি-ঝরা ফুল।

তা হোক। তবুও সে রাজকীয় শোষণমুক্ত।

শোষিত জনগণের প্রবল অসন্তোষ। পতনোন্মুখ অটোমান সাম্রাজ্য। সাম্রাজ্যের অধিপতি খলিফা। শুধু তাই নয় তিনি সারা মুস্লিম জাহানেরও ধর্মপতি। বারোশ বছরের দ্বিমুখী শোষণের ঐতিহ্য। আত্মরক্ষার সব আয়োজন তবু ব্যর্থ। তুর্কী সাম্রাজ্য ভেঙে খান্ খান্ প্রথম মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড আঘাতে।

গণতন্ত্রের মন্ত্রোচ্চারণ সেখানে তার আগে থেকেই। তরুণ কামালের ডাকে তরুণ তুরস্ক ঐক্যবদ্ধ। মহাযুদ্ধের বেদনা তুর্কী গণতন্ত্রের জন্মবেদনা। কামাল পাশা কামাল 'আতাতুর্ক'—জাতির জনক। সাধারণতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট। খলিফা পদ খতম। ধর্ম ও রাষ্ট্র ফারাক করে দিলেন কামাল।

রাজধানী স্থানান্তর। কন্সট্যান্টিনোপল্ থেকে আন্‌কারায়। তুরস্ক সাধারণতন্ত্রের প্রথম কাজ। ইয়োরোপ থেকে এশিয়ার দিকে মুখ ফেরালেন কামাল। পশ্চিম থেকে পূর্বের দিকে। কিন্তু নবীন তুরস্কের দৃষ্টি আজ আবার কেন পশ্চিমমুখো? কেন বাগদাদ চুক্তির বন্ধন ফাঁস তার গলায়?

আন্‌কারায় রাজধানী আনতে কম হামলা কামালের? বস্‌ফোরাসের অমন আবহাওয়া ছেড়ে আসতে চায় কেউ সহজে? বিদেশীরা তো প্রথম থেকেই খাপ্পা। অনেক প্রলোভনের টোপ ফেলে তবে কাজ হাসিল। রুশ আর জার্মাণ কূটনীতিকদের জন্যে বিস্তীর্ণ জায়গা শহরের গায়ে। ইংরেজ আর মার্কিণদের ভাগ্যে আরো ভালো এলাকা।

তারপর আনন্দমুখর আন্‌কারা। নতুন নতুন রাজপথ। হ্রদ, উদ্যান, মল্লভূমি—কি নেই সেখানে? আমোদ-প্রমোদের ছড়াছড়ি। তবু যেন কন্সট্যান্টিনোপলের নামে সবাই আত্মহারা। দাও নাম পাল্টে। ভুলুক লোকে। মুক্ত হোক একটা নামের মোহ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপতির নির্দেশে ঘোষণা প্রচার। পুরোনো রাজধানীর নাম বদল। নতুন নাম ইস্তাম্বুল।

আমরা সেই ইস্তাম্বুলে।

বিমান নামছিলো আর দেখছিলাম চোখ ভুলানো সবুজ উপত্যকা। সবুজ, শুধু সবুজ। ক্ষেতে ক্ষেতে চাষী। হাসি হাসি মুখ। নতুন ফসলের আনন্দরস। প্রচুর ফসলের অহংকার হয়তো।

বিচিত্র বর্ণের পোষাকের আড়ম্বরে তুর্কী মেয়েরা অপরূপ। তাঁদের কয়জন চোখ পর্দায়। বোরখা-বন্দিনীরা আজ সব বন্ধন মুক্ত। পুরুষের মতো মেয়েরাও স্বাধীন। কৃতী কামালের এ আর এক মহান কর্ম। জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর সংস্কারের স্বাক্ষর। শক্তিমান পুরুষ কামাল আতাতুর্ক। হায়, তাঁর তুরস্ক আজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগোষ্ঠীর পঙ্কজালে!

আমার পাশের আসনের বিমান-বন্ধু বিদায় প্রার্থী। সহসা আমার সঙ্গে করমর্দন। সহাস্য অভিবাদন। আমার পক্ষ থেকে অপরাহ্নিক শুভকামনা জ্ঞাপন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথা বলতে না পারায় বেদনা বোধ। তাঁরও হয়তো তাই। কবে হবে পৃথিবীর মানুষের এক ভাষা! এক পৃথিবীর স্বপ্ন কবে সার্থক হবে!

অদূরে 'গোল্ডেন হর্ণ'। একটি অপূর্ব নাম। সাগর শাখা। মূল সাগরের নাম আরো মধুর। মর্মর সাগর। বস্‌ফোরাস প্রণালীর সংকীর্ণ খাতে মর্মর বয়ে চলেছে সেখানে। তারপরে কৃষ্ণ সাগরের সঙ্গে কোলাকুলি।

সেখানে পোতাশ্রয়। জাহাজ বন্দর। এখানে বিমান ঘাঁটি। আমরা যেখানে।

বিমান ঘাঁটির লাউঞ্জে গেলাম। বসলাম। এক একটি টেবিল ঘিরে চারটি করে আসন। আমরাও চারজন। চার দেশের চারজন।

তখন বেলা চারটে। টি টাইম।

চা-পান পর্ব শেষেও হাতে অনেক সময়। গল্পের নৌকোর পথ তাই অনির্দিষ্ট। বিষয়ও যে অফুরন্ত। টাটকা বিষয় সুয়েজ খাল। খালের জলের উত্তাপে সারা দুনিয়া চঞ্চল। সে প্রসংগতো অনিবার্য। সে আলোচনার মধ্য পথেই ঘটে বসে এক বিচিত্র ঘটনা।

হঠাৎ টেবিলে চার গ্লাস কোকাকোলা! কোত্থেকে এলো? চোখে চোখে বিস্ময়। অভ্যর্থনার একটু বাড়াবাড়ি যেন এখানে!

খেয়ে নিন না!—তাগিদ দিলেন মিঃ ই তুত।

ঠিক আছে। ভেজা গলায় গল্পে সুখ। গ্লাসে গ্লাসে চুমুক। কিন্তু সবারই মুখ কেমন যেন বিকৃত। বিস্বাদ। কোয়ালিটি ভালো নয় কোকাকোলার। দ্বিতীয় ঢোক গেলার পর আর চললো না।

কেন বাবা, কোকাকোলার দেশে চলেছি তোমাদের কি দরকার ছিলো এ দিয়ে আমাদের খাতির করার? মনে মনে সবারই এক কথা।

খানিক বাদে বিল নিয়ে হাজির রেঁস্তোরা বয়। হাত বাড়িয়ে বিল নিলেন মিঃ ই তুত। অবাক আমরা। এক এক গ্লাস এক এক ডলার! আরো ভালো।

কিন্তু ডলার যে নেই কারুর কাছে। শিলিঙ-এ দাম মেটাতে চাইলাম আমরা। তাতে আরো বেশি খাক্‌তি। চড়া দর নিয়ে কথা কাটাকাটি খানিকক্ষণ। তারপর রফা। আট শিলিং-এ আপোষ। এক এক গ্লাস আট শিলিং। ডলারের বিনিময় মূল্যের চেয়েও বেশি দাম। তা হলেও আর উপায় নেই।

এখন গোল বাধলো দাম মেটানো নিয়ে। কে দেবে। আর এক দফা টানাপোড়েন। রফা করেছেন মিঃ হাসলাম। আমার সেই বৃটিশ বন্ধু মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। তিনিই মণিব্যাগ বার করলেন পকেট থেকে।

না না, তা হয় না।—হাসলামের হাত চেপে ধরলেন মিঃ ই তুত। তীব্র আপত্তি জানিয়ে বল্লেন, আমারই অর্ডার, কাজেই পেমেণ্টও আমারই দেয়।

জানা গেলো ব্যাপারটা।

আমি হেসে বল্লাম, তার চেয়ে বরং তৃতীয় ব্যক্তি কেউ দামটা মিটিয়ে দিক, তা হলে আপনাদের দুজনের দেয়া-দেয়ির প্রতিযোগিতার ঝামেলাটাও মিটে যাবে। এই বলে আমিও বার করলাম আমার ব্যাগ।

কিন্তু বর্মী বন্ধু নাছোড়বান্দা।

এ সামান্য ব্যাপার নিয়ে আর গোলমাল করবেন না, প্লিজ!—মিঃ ই তুতের কণ্ঠে অনুরোধের স্বর। তিনি দু পাউণ্ডের ট্রাভেলার্স চেক কেটে দায়মুক্ত। তাঁরই জয়।

দেখলেন তো!

হ্যাঁ, এই হলো আমাদের পূর্বদেশীয় আতিথেয়তার একটি নমুনা।—মিঃ হাসলামের কথায় উত্তর দিলাম আমি। সে উত্তরে গর্বের ঝাঁজ। ভারত আর ব্রহ্ম। দুই প্রতিবেশী। দুই সহোদরা। একের গৌরবে অপরের গৌরব বোধ। সে তো স্বাভাবিক।

ই তুতের কথা একটু বলি। তরুণ বি-সি-এস। বর্মা সিভিল সার্ভিস-এর লোক। চলেছেন আমেরিকার রাজধানী শহরে। ওয়াশিংটনে। সেখানে 'ভয়েস অব আমেরিকা'য় বিশেষ ট্রেণিং নেবেন, এই উদ্দেশ্য। 'ভয়েস অব আমেরিকা' আমেরিকার সরকারী বেতার। বিরাট প্রতিষ্ঠান। সেখানকার বিশেষ ট্রেণিং-এর বিশেষ মূল্য আছে বৈকি!

উঁচু তলার বনেদি ঘরের ছেলে ই তুত। বৃটিশ আমলের ঝানু রাজকর্মচারী তাঁর বাবা। এখন তিনি লণ্ডনে। স্বাধীন বর্মার দূতাবাসের মাতব্বর একজন। ওয়াশিংটনের পথে লণ্ডনে বাবার কাছে কয়েকটা দিন কাটিয়ে যাবেন, ই তুতের এই ইচ্ছে। বাবার গল্প বলতে গিয়ে মুখখানা রাঙা হয়ে ওঠে তাঁর। ছেলের গৌরবে তাঁর বাবার হয়তো আরো কতো বেশি আনন্দ!

ব্রহ্মের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা উঠলো।

আমাদের টেবিলের চতুর্থ বন্ধু অনেকক্ষণ পর মুখ খুললেন। তিনি জার্মাণ। অল্প অল্প ইংরেজি জানেন। কিন্তু স্বভাবতই স্বল্পভাষী।

অল্প কথায়ই একটি প্রশ্ন করলেন। জিগ্যেস করলেন, সম্প্রতি চীন যে বার্মার একটুকরো জমি জবর দখল করে বসেছে সে সম্বন্ধে কি ভাবছেন আপনারা।—মিঃ ই তুতের মত জানতে চাইলেন জার্মাণ বন্ধু।

অত্যন্ত অন্যায় করেছে নয়াচীন। নতুন সীমানা নির্ধারণ করতে যেয়ে ব্রহ্মের খানিকটা জুড়ে নিয়েছে নিজেদের সঙ্গে।—চটপট জবাব এলো।

কিন্তু ঘটনাতো অনেক দিনের। এর প্রতিবাদ হয়নি কেন বার্মার তরফ থেকে?—প্রশ্ন করলাম।

কথাটা ঠিক। প্রতিবাদ হওয়া উচিত ছিলো অনেক আগেই। তবে কি জানেন, আমাদের দেশে নিত্য হাংগামা। শাসন ক্ষমতা তরুণ বুদ্ধিজীবীদের হাতে। তাঁরা দেশপ্রেমী। এতো গোলমালের মধ্যেও দেশকে যে এগিয়ে নিতে পারছেন তাঁরা তাই বড়ো কথা। আমরা শান্তি চাই। শান্তির মধ্যে দিয়ে অগ্রগতি। চীনের সঙ্গে একটা মীমাংসা হয়ে যাবে বলেই আমার বিশ্বাস।

এক বলিষ্ঠ আশা ই তুতের স্বরে। শান্তির ওপর আন্তরিক ভরসা। তরুণ জাতীয় নেতাদের ওপর গভীর আস্থা।

কিন্তু আর নয়। বিশ্রাম সময়ের তটসীমায় আমরা। ছুটে গেলাম প্লেনে। বসতে বসতেই পাখার আওয়াজ। বিমান পাখির পাখা। আবার উড়ন্ত ঈগল আমাদের বিমান। এবার দীর্ঘ পথ। শূন্যলোকের বুক চিড়ে চলেছি আমরা। তীব্র দ্রুততায় অগ্রগতি। সময়ের ঢেউ খান্ খান্। অতীতের গায়ে সব দেয়াল-ছবি। দেশে ফিরে আবার দেখবো এ সব। মনে কতো বাসনা। টুকে টুকে রাখছি তাই টুকরো টুকরো অনেক কথা। কতক আমার ডায়েরীর পাতায় পাতায়। তার চেয়ে অনেক বেশি মনের কোণায় কোণায়।

বাইরে রাত্রির আকাশ নক্ষত্র-ঝলমল। ভেতরে আমরা। প্রতীক্ষা-কাতর একদল মানুষ। প্রহর গুনছি আবার কখন মাটি ছোঁবো। কখন আবার নিশ্বাস নেবো বাইরের খোলা হাওয়ায়। মানুষ মুক্তিকামী। বন্ধনের কী জ্বালা!

ভূমি স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই মুখর হয়ে ওঠে বিমান গহ্বর। প্রতিবারেই তাই। কলগুঞ্জন ও বাক্ বিনিময়ের সমারোহ। এক বাড়ির মানুষ যেন সবাই। একই চিন্তা রাজ্যের বাসিন্দে। কিন্তু সে সবই কিছুক্ষণের জন্য। সাময়িক। ফিরে এসে আসনে বসেই আবার সেই নীরব অস্বস্তি। হঠাৎ যেন ফুরিয়ে যায়

কথার ভাণ্ডার। ভাটা পড়ে উৎসাহে। একটা নিষ্করুণ ক্লান্ত অবসাদ নামে দেহে। মনেও।

নতুন মাটির স্বাদ। নতুন বাতাস। এশিয়া ছেড়ে এবার খাস ইউরোপে। ডাসেলডর্ফে পৌঁছুলাম। তখন রাত পৌনে দশটা।

অন্যতম শ্রেষ্ঠ জার্মাণ বিমান বন্দর ডাসেলডর্ফ। শ্রেষ্ঠ শিল্প-নগরীও।

বড়ো বাড় বেড়েছিলেন নাৎসী নায়ক। আধিপত্য বিস্তারের নেশায় পেয়ে বসেছিলো তাঁকে। সীমাহীন লোভ। তার শোচনীয় পরিণতি। শুধু আত্মঘাত নয়, দলীয় পতন নয়—গোটা দেশ ও জাতটা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। অতি লোভের পরিণাম।

বিধ্বস্ত জার্মাণীর রূপ দর্শন! এখনো কি ক্ষতজর্জর জার্মাণী? না, নব-কলেবর? দেখতে উন্মুখ মন। প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভের পিপাসা।

কিন্তু শীত যে বড্ড এখানে! রীতিমতো গরম পেয়েছি বেরুটে। ইস্তাম্বুলেও প্রায় তাই। আর এখানে ঠিক তার উল্টো। শেরোয়ানীর ওপর ওভারকোট চড়িয়েও নিস্তার নেই। কেমন একটা হিমেল হাওয়া। সেপ্টেম্বর না পড়তেই এই, ডিসেম্বরে ফেরার পথে জমে না যাই! বুকের পাঁজরায় ভয়-কাঁপুনি।

কোটের কলার পর্যন্ত উল্টে নিয়ে নেমে পড়লাম বিমান থেকে। নেমেই দে ছুট। এক দৌড়ে একেবারে লাউঞ্জে। সবাই ছুটেছি একসঙ্গে। কাজেই লজ্জা পাইনি। তবে শ্রান্তি বোধ করেছি একটু। বসে খানিক বিশ্রাম করলাম। তারপর ঘুরে দেখলাম চারদিক।

পরিচ্ছন্নতায় অতুলনীয় ডাসেলডর্ফ বিমান বন্দর। নতুন। নতুনত্বের মহিমা তার সৌখীন রূপসজ্জায়। নজর পড়লো ক্যামেরা স্টোরে। সারে সারে সাজানো ক্যামেরা। নানা রকমের নানা দামের। রলি ফ্লেক্স, রলি কর্ড, জইস্ আইকন, কন্টা ফ্লেক্স আরো কতো কি নাম। নামের নামাবলী আর কি! আমারও নিতে হবে একটা। পারলে দুটো। আত্মতৃপ্তির পর বন্ধুকৃত্যের আকাঙ্ক্ষা।

কিন্তু কেনা-কাটা এখানে নয়। এখন সম্ভবও নয়। ফেরার পথে। ক্যামেরার বাজার জার্মাণী। ফিরতি সফরে জার্মাণীতো আছেই আমার কর্মসূচীতে। তখনই হবে।

অল্পক্ষণের আত্মীয়তা ডাসেলডর্ফের সঙ্গে। যে দু'চারজনের সঙ্গে কথা হলো সবাইকেই ভালো লাগলো।

একজন বল্লেন, আপনাদের প্রধানমন্ত্রী এসেছিলেন এখানে মাস খানেক আগে। কমনওয়েলথ কনফারেন্সে গিয়েছিলেন লণ্ডনে। ফেরার পথে পশ্চিম জার্মাণী পরিদর্শন। এই এয়ারপোর্টে বিপুল সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন তিনি।

খণ্ডিত ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সম্বর্ধনা খণ্ডিত জার্মাণীতে। দুই দেশই বিচ্ছিন্ন বিভক্ত। আমাদের বেলা দীর্ঘ পরাধীনতার প্রায়শ্চিত্ত। ওদের বেলা পরদেশ লুণ্ঠন প্রবৃত্তির পরিণাম।

দেশ বিভাগের বেদনার কথাই ভাবছিলাম। জার্মাণদের মনে কতো ব্যথা! আমাদেরও। আমরাও যে ভুক্তভোগী। খানিক দূর এগুলে ওদের কথায়ও তা ধরা পড়ে।

ডাক পড়লো। শূন্য আসন পূর্ণ করার ডাক। আবার আকাশচারী আমরা। আবার ইঞ্জিনের একটানা ক্লান্ত ঘর্ঘর স্বর। প্রপেলারের বিচিত্র ঐকতান। যাত্রীরা চঞ্চল। আর কতো!

কিন্তু উপায় নেই। এর চেয়ে সহজপথ আজও আবিষ্কার হয় নি। আজ অবধি এই-ই ভরসা। শব্দহীন বিমান আবিষ্কারে নিশ্চয়ই চিন্তা করছেন বিজ্ঞানীরা। তা হয়ে গেলে অনেক ক্লান্তির লাঘব। কান ঝালা পালা! আর সয় না!

এতো কাছেই আবার নামছি? লণ্ডনে এলাম না কি?

না ব্রুসেলস্-এ। পৌনে এক ঘণ্টারও পথ নয় ডাসেলডর্ফ থেকে। আধ ঘণ্টার একটু বেশি সময় লেগেছে বিমান পথে।

এখনো দশ মিনিট বাকি এগারোটা বাজতে। এরপর লণ্ডন।

কখন ঘুমবো আজ? সে এক দুশ্চিন্তা। কালকের রাতটাই বরং ভালো গেছে। একটানা কোলকাতা থেকে করাচী। রাত ভোর। আর আজকের রাতে? কেবল ওঠানামা আর ছুটোছুটি। ভারি বিশ্রী।

ব্রুসেলস। এও এক রাজধানী শহর। হতভাগ্য বেলজিয়ামের রাজধানী। ইয়োরোপের সবচেয়ে ঘনবসতির দেশ। বিগত দুই মহা যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ আজকের বেলজিয়াম। দুবারই পশ্চিম রণাংগনে দুর্বারগতি জার্মাণবাহিনীর রণযাত্রা সুরু এ দেশের বুকের ওপর দিয়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের আঘাতের নিদারুণ অভিজ্ঞতা। বিশেষভাবে ভাবিত বিধ্বস্ত বেলজিয়াম। আত্মরক্ষার তাগিদ।

মৈত্রীবদ্ধ হলে কেমন হয় কারুর সঙ্গে? ভালোই। প্রতিবেশী ফ্রান্স প্রবল শক্তি। সে-ই যোগ্য সহযোগী। কিন্তু নাৎসী জার্মাণী প্রবলতর হয়ে উঠছে যে। জার্মাণীর চিরশত্রু ফ্রান্স। কী দরকার ফ্রান্সের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে থাকার? নিরপেক্ষতা ঘোষণা করলো বেলজিয়াম। কিন্তু নিরপেক্ষতায় নিষ্কৃতি নেই। নীতির কথা শুনবেন হিটলার? সে যে হাসির কথা। আর চিরকাল নীতিই তো বার বার বলি রাজনীতির! আরও ভয়াবহ হলো হিটলারের আঘাত। অরক্ষিত বেলজিয়ামের ওপর দিয়ে পথ তৈরি হলো নাৎসী রণযাত্রার। ফ্রান্সে জার্মাণ বাহিনীর প্রবেশ-তোরণ বেলজিয়াম। হিটলারের পতনে আজ মুক্ত সে, স্বাধীন সে।

সেই বেলজিয়ামের রাজধানীতে দাঁড়িয়ে আমি। ব্রুসেলস্ বিমান বন্দরে। কিন্তু মাত্র বিশ মিনিটের বিশ্রাম। দু'এক জনের সঙ্গে দু'চারটে কথা বলবো তেমন অবকাশও নেই। শুধু বুড়ি ছোঁয়াছুঁয়ি। আগে জানলে নামতামই না মোটে। শীতের শরনিক্ষেপে ঘায়েল মিছিমিছি।

তাড়া। কেবল তাড়া। যাক্‌গে একটু ঘুমিয়ে নেয়া যাক্। বিমানে চেপে ঘুমের ভাবনা। ঘণ্টা দুই সময় হাতে। সবার কিন্তু ঘুমের তাগিদ নেই। বিমান-বান্ধবীরা ব্যস্ত। ছুটোছুটি। নিচের তলায় আনন্দ ধুম। কারণ পানে অকারণ বাড়াবাড়ি।

চলুক নিচে ওদের আনন্দ। আমরা কজনে ওপরে ঘুমুই।

ইংল্যাণ্ডের আকাশে উড়ছি। ব্রুসেলস্ থেকে লণ্ডনে। ডোভার প্রণালী কখন পেরিয়ে এসেছি খেয়াল নেই। ঘুমের মায়াকাজল। সে কালিতে সব একাকার। অন্ধকার।

আগের স্টপে প্লেনে উঠেই কার্ড পেয়েছিলাম একখানা। আত্ম-পরিচয়ের প্রশ্নমালা। নাম, ধাম, জাতি, বয়েস, পেশা আরো কতো কি! সব নাকি ওদের জানা দরকার। চোখ বুজে এসেছিলো সে সবের উত্তর লিখতে লিখতে। ছোটবেলা পরীক্ষার হলে বসে এমনি হতো আমার। এসব ঝামেলা কোন কালেই ভালো লাগে না। এতোকাল বাদে আবার সেই প্রশ্নোত্তর লেখালেখি। বলুন দেখি!

যাক্, মাইকের হাঁকে ঘুম ভাঙলো। ঘড়ি দেখলাম। তখন রাত একটা বাজতে পাঁচ।

মহানগরী লণ্ডনে

লণ্ডন এয়ারপোর্টে এসে গেছি। ছোটবেলার স্বপ্নের লণ্ডন। শিক্ষা-সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ পীঠভূমি লণ্ডন। তাই তার গৌরব। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রাণকেন্দ্র লণ্ডন। সে তার কলংক। ইতিহাস ইতিকথায় জড়ানো মোড়ানো সে মহানগরীতে আমি। কেমন একটা শিহরণ অনুভব করলাম।

আলোকোজ্জ্বল বিরাট বিমান-বন্দর। শ্রেষ্ঠতম আন্তর্জাতিক অবতরণ ক্ষেত্র। কিন্তু নীরব কর্মব্যস্ততা বিস্ময়কর। শুধু নীরব কাজ নয়, নিখুঁতও। ছোট্ট একটা জাতির বড়ো হওয়ার বীজ নিহিত সেখানে।

অনেক নিয়ম-কানুনের ব্যাপার। কাগজপত্র সব হাতে নিয়েই নেমেছি। পাশপোর্ট পকেটে। ওতো এক অমূল্য বস্তু। ও সঙ্গী সঙ্গে আছে কিনা তার খোঁজ পদে পদে।

এ সব এক জায়গায় দেখিয়ে নিস্তার পাবো ভেবেছিলাম। কিন্তু তা হবার নয়। দরজায় দরজায় দৌড়োদৌড়ি। তবে দরজাগুলো সব পর পর, এই রক্ষে। তবু এখান থেকে ওখানে করতে করতে সময় কাটে খানিকটা।

রাতটা কি এখানেই কেটে যাবে না কি? না। বেশি সময় লাগছে না কোথাও। সর্বত্রই চটপট কাজ। ঢিমে-তেতালা নয়।

নতুন আর একখানা কার্ড পেলাম। ব্রুসেলস্ ট্রিটি অর্গ্যানিজেশনের গুরুত্বপূর্ণ নোটিশ। একটি সতর্কবাণী। টিকা নেওয়া আছে তো? না থাকলে নিতে হবে লণ্ডনে নেমেই। নিয়মমাফিক কাজ। অনিয়ম চলবে না।

আর একটি ভালো খবর আছে। ঐ কার্ডেরই খবর। ছুঁৎ রোগ ও দুরারোগ্য ব্যাধি চিকিৎসার সুব্যবস্থার কথা। বৃটেনে নবাগত বিদেশীর কোন খরচ-খরচার বালাই নেই এজন্যে। তার দায়-দায়িত্ব সব ন্যাশনাল হেলথ্ সার্ভিসের। মেডিক্যাল অফিসার অব্ হেলথ্‌কে ফোনে একটা খবর দিলেই চিকিৎসার সব ব্যবস্থা পাকা। দেশকে যথাসম্ভব রোগমুক্ত রাখার জন্যে কী সতর্কতা! আর আমাদের দেশে?

যাক্‌গে, ওসব অসুখ-বিসুখের ভাবনা নেই আমার। মোটামুটি সুস্থ-সমর্থ একটি পুরোপুরি মানুষ আমি। 'টিকা-টিপ্পনি'র ব্যাপারগুলো উদ্যোগ পর্বেই সাবাড়। কাজেই সবখানেই সব জিজ্ঞাসার সংক্ষিপ্ত উত্তর। 'ইয়েস' অথবা 'নো'। শুধু কাস্টমস্‌ চেকিং-এ যা একটু দেরি। তাও খুব বেশি নয়।

এরই মধ্যে বিদায় নিয়ে গেলেন মিঃ হাসলাম। হাসতে হাসতে অনুরোধ জানালেন ফেরার পথে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে। নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো, কথা দিলাম তাঁকে। বিদায় নিলেন মিঃ ই তুত। কোলকাতায় এলে দেখা পাই যেন, বলে দিলাম ই তুতকে। ওরা দুজনে চলে গেলেন। ওদের গাড়ি হাজির এয়ারপোর্টে।

এবার মালপত্রের তদারক করতে হয় একটু। দেখলাম সব ঠিক আছে। বড় স্যুটকেশটা নিয়ে টানাটানির কী দরকার? রেখেই যাই। তাই ভালো। এক-জনকে বলতেই ব্যাগেজ রসিদ দিলেন একটি। বড়ো বোঝাটা সরিয়ে রাখলেন।

নিরাপদ তো? মনের ছোট্ট কোঠায় সন্দেহের উঁকি-ঝুঁকি। নিজের দেশের নানা ঘটনায় কেমন যেন নির্ভরসা। না, সে সন্দেহ অমূলক। সাধারণ সততায় এদেশ অতুলনীয়। সে শুধু শোনা কথাই নয়। খাঁটি কথা। বহু লোকের মালপত্রের সঙ্গে আমারও কিছুটা না হয় থাকলোই। যায়তো যাবে।

মুখ ঘোরালাম। সামনেই এক মহিলা। প্যান আমেরিকান এয়ার-ওয়েজের এক কর্মী।

আপনিই তো মিঃ বোস?—জিগ্যেস করলেন তিনি।

হ্যাঁ, কেন বলুন তো।

আপনার হোটেল এ্যারেঞ্জমেণ্টের কথা বলছিলাম। নরফোক হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে আপনার জন্যে। প্যান আমেরিকানের একদিনের অতিথি আপনি সেখানে।

আমি জানি সে কথা।

ও, তাই নাকি। তা বেশ—এই বলে একখানি নোট দিলেন ভদ্রমহিলা। হোটেলকে লেখা নোট। আমার সম্বন্ধে লেখা। চোখ বুলিয়ে নিলাম একবার। হোটেলে প্রথম শ্রেণীর অতিথি। তাইতো হবে। বিমানে প্রথম শ্রেণীর যাত্রী যে। এসব জানাই ছিলো। যাত্রার আগেই বলে দেওয়া হয়েছিলো কোলকাতার মার্কিণ কন্সাল জেনারেলের অফিস থেকে।

কিন্তু হোটেলে যাবার ব্যবস্থা কি এখান থেকে ?

এই নিন আপনার বাসের টিকিট।—আমার চোখের সামনে আবার চক্‌চক্‌ করে উঠলো মহিলার টুক্‌টুকে হাতখানা। একখানি চিরকুট। ছাপানো একটুকরো কাগজ। বলে দিলেন, এ টিকিটেই বাস আপনাকে হোটেলে পৌঁছে দেবে। হোটেল আপনার কেন্‌সিংটনে।

বাসে যাবার পথও দেখিয়ে দিলেন সেই মহিলা কর্মী। 'গুড নাইট' জানিয়ে আর এক কাজে চলে গেলেন।

বাসে গিয়ে উঠলাম। এয়ারপোর্টের বাস। সঙ্গে একটা মাঝারি স্যুটকেশ আর পোর্টফোলিও ব্যাগ। তা-ছাড়া প্যান আমেরিকান এয়ার-ওয়েজের ঝোলাটাতো আছেই।

কিন্তু প্যান আমেরিকানের যাত্রী বি ও এ সি'র বাসে কেন ? একটু খটকা লাগলো। না, খটকার কোন কারণ নেই। এ ব্যবস্থাই চালু এখানে। জিগ্যেস করে জানলাম। নিশ্চিন্ত।

বাসের দরজার কাছেই বসেছিলাম। আমার সীটের উল্টোদিকেই দরজা। দেখছিলাম ইংরেজ জাতটার শৃঙ্খলাবোধ। যাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই ইংরেজ। সবাই সুশৃঙ্খলভাবে এসে উঠছেন বাসে। কোন হুড়োহুড়ি নেই। মেয়েদের পথ আগে আগে। মালপত্র তুলে দিয়ে মেয়েদের সাহায্য করছেন সবাই। এ সব অভ্যেস ওদের মজ্জাগত।

কণ্ডাক্টর এলেন। কী সুন্দর তাঁর ব্যবহার! যাত্রীদের ব্যবহারও তাঁর প্রতি চমৎকার। রীতিমতো সম্মানজনক। পারস্পরিক সদয় ব্যবহার ও সদিচ্ছা। কারুর মুখে কথা নেই 'প্লিজ' ছাড়া। কী মিষ্টি শুনতে!

ডান আর বাম। ক্রমাগত ঘূর্ণিপাক খেয়ে চলেছে আমাদের বাস। প্রথম প্রথম ভালোই লাগছিলো। প্রথম অভিজ্ঞতার ভালো লাগা।

লাল-নীল-হল্‌দে আলো। মণি-মুক্তো হীরে-পান্নার রোশনাই। সাম্রাজ্ঞীর মুকুটশোভা যেন। চারদিকের আহরণের দ্যোতক ? মন ভারি হয়ে ওঠে নানা প্রশ্নে।

একই ধাঁচের রাত-ঝিমোনো সব বাড়িগুলোর দিকে নজর পড়ছিলো! এ আর বইএর পাতায় ছবি দেখা নয়। বাস্তব। রাত্রির মৌনতায় মুখর বাস-ঘর্ঘর। পথ ফুরোয় না যেন। আর কতোদূর কেন্‌সিংটন ?

যখন এসে হোটেলে পৌছলাম, রাত তখন প্রায় আড়াইটে।

রিসেপশন-রুমে সুন্দরীর সাদর অভ্যর্থনা। আমার একটা সই নিয়ে ২৩৬ নম্বর রুমের চাবি তুলে দিলেন পোর্টারের হাতে রিসেপ্‌শনিষ্ট। আমি পোর্টারের অনুগামী। মালপত্র লিফ্‌টে উঠে গেছে আমার আগেই। এবার আমি।

ঘরে ঢুকেই পট্‌-পট্‌ কতগুলো আলো জ্বালালো পোর্টার। এক এক করে আমায় বুঝিয়ে দিলো সব সুব্যবস্থার কথা। তারপর স-টিপ বিদায় নিলে।

সত্যি সব রকমের সুব্যবস্থা। প্রকাণ্ড ঘর। রকম রকম ফার্ণিচার। চমৎকার সাজানো। কাঁচের বন্ধ জানালায় কুঁচি দেওয়া জালপর্দা। ওপরে একখানা অয়েল পেন্টিং। মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য। পায়ের তলায় মেজেজোড়া কার্পেটেও নানা নক্সা। নয়নাভিরাম। সঙ্গে সুবিস্তৃত স্নানঘর। রবার শীটেড ফ্লোর। সব রকমের সুবিধে। তার ওপর শীতাতাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় সোনায় সোহাগা।

কিন্তু অযথা একটা ডবলবেড রুম কেন আমার জন্যে। একলা মানুষ, সিংগল বেডেই তো বেশ চলে যেতো। পাশে একটা অকারণ শূন্য শয্যা!

কেন, কী দরকার ছিলো? তার চেয়ে বরং ও মেয়ে দুটিকে ফিরিয়ে না দিয়ে আমার ব্যবস্থা এক বেডের রুমে করে দিলেই হতো। তাঁরা এ ঘরে থাকতে পারতেন।

তার হয়তো কোন উপায় ছিল না। তাই ফিরিয়ে দিতে হয়েছিলো মেয়ে দুটিকে। তবু ভালো ওঁদের একটা সুবন্দোবস্ত হয়েছিলো।

বলার মতোই একটি ঘটনা। তাই বলছি।

একই সঙ্গে এসেছিলাম আমরা। একই বাসের যাত্রী। কিন্তু লক্ষ্য করিনি মেয়ে দুটিকে। ওঁরা নামলেন আমার পিছন পিছন। একটু আগে আগেই গেলেন রিসেপশন রুমে। কিন্তু ব্যর্থমনোরথ। ঠাঁই নাই। তরী ছোট নয়, কিন্তু ভর্তি।

তা বলে এঁদের কথা ভাববেন না একটু হোটেল ম্যানেজার? এই নিশুতি রাতে কোথায় যাবেন দুই বিদেশিনী? দুটি ইতালীয়ান তরুণী? আমার মতোই নতুন ওঁরা লণ্ডনে। এমন অনির্দেশ অবস্থায় আমি কি করতাম? নিজেকে দিয়ে পরের বিপদ বিবেচনা। তবে ওঁরা ইউরোপীয়। শক্ত মন। দেহও মজবুত।

তবু সঙ্গে সঙ্গে ফোন করা হলো কাছাকাছি আর একটা হোটেলে। ওঁদের ব্যবস্থা হলো সেখানে। ওঁরা চলে গেলেন। যে বাসে এসেছিলেন সে বাসেই ফিরলেন আবার তল্পিতল্পা নিয়ে। সে বাস তখনো তাঁদের জন্যেই দরজায় দণ্ডায়মান। দায়িত্ব বোধের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একটি আশ্চর্য শিক্ষা।

পরদিন সকালবেলা। টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভাঙ্‌লো। ব্রেকফাষ্ট রেডি। খাবার ওপরে আমার ঘরে আসবে, না আমিই নিচে যাবো। উত্তর দিলাম, আমিই নিচে যাবো। আধঘণ্টা সময় নিলাম। তারই মধ্যে স্নানাদি সেরে ফিটফাট। একদিন পর পূর্ণস্নান। শাওয়ারের ঈষদোষ্ণ জলধারায় সে কী পরিতৃপ্তি! দেহ-মন প্রসন্ন।

সেজেগুজে নিচে এলাম। হোটেল রেস্তোরাঁয় একা আমি ভারতীয় পোষাকে। আমার টেবিলেও আমি একা। কোন কোন টেবিলে দুজন তিনজন। গায়ে পড়ে কেউ বড়ো একটা কথা বলেন না এদেশে। আমার সঙ্গেও কেউ বলছিলেন না। তবে অনেকের দৃষ্টি আমার দিকে। কে জানে, হয়তো বিদ্বেষের দৃষ্টি। হয়তো রাগের। অনুরাগের নয় নিশ্চয়ই।

ব্রেকফাষ্টটা মোটামুটি সেরে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এবার পরিব্রাজকের পদচারণা। পায়ে না হেঁটে দেশ দেখা যায় কখনো? বেড়ালাম হ্যারিংটন রোড ধরে খানিকক্ষণ। তারপর কুইন্স প্লেস হয়ে ক্রমওয়েল রোড। দেখলাম ন্যাচারেল হিষ্ট্রি মিউজিয়ম—উদ্ভিদ ও জীবজগতের যাদুঘর। প্রকাণ্ড সে প্রতিষ্ঠান। কতো দেখবার। কতো জানবার। সপ্তাহভর নানা বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের বক্তৃতা। সত্যিকারের জ্ঞানমন্দির একটি।

আহা কি মধুর বসন্ত বায়! খর্‌খরে রোদ। খর্‌খরে শীতের গায়ে রূপোর গয়না। ফুলে ফুলে সূর্যশোভা। পাতায় পাতায়। ঘাসে ঘাসে। দিকে দিকে হাসির ফোয়ারা। সূর্য-প্রেমে মাতোয়ারা সব। কিন্তু এখন বসন্ত? এদেশে তাই। বাসন্তী শীতে মেজাজী আরাম। খুব মজা লাগছিলো ঘুরে বেড়াতে।

কিন্তু কেবল মজা লুটলেই তো হবে না। অল্প সময়ে কাজ অনেক। ফোন করতে হবে অনেকগুলো। তাই ঘরে ফিরলাম। হোটেলে।

ডাঃ ই সি ডিউইক, রেভাঃ মিলফোর্ড, আমাদের সুন্দর কাবাদি আর বি-বি-সি'র কমল বসু। এঁদের সকলকেই ফোন করলাম। এক এক করে যোগাযোগ।

ডিউইক ও মিলফোর্ড পরিবারের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘকালের। উভয়েই আমার ছোট কাকার অন্তরংগ। ওঁরা ছাত্রপ্রিয়। কোলকাতা সেন্টপলস্ কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক। প্রভূত সুনাম পেয়ে ফিরেছেন দেশে। এখন অবসর। কিন্তু অবসর জীবনেও অবসর নেই। অনেক কাজে জড়িয়ে রেখেছেন ওঁরা জীবনকে। কাজই যে জীবন ওঁদের কাছে!

আমি লণ্ডনে, এ খবরে ডাঃ ডিউইক যে কী খুশি! খুটে খুটে সবার খবর জিগ্যেস করলেন তিনি। ছোটকাকার অসুখের খবর পেয়েছেন। সে জন্যে তাঁর অশেষ দুঃখ। 'ধীরেনের অমন স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে গেলো!'—বড়ো আপশোষ। গভীর সহানুভূতি।

কিন্তু আজই আমি চলে যাবো। কী করে দেখা হবে ডিউকের সঙ্গে। এ যাত্রায় অসম্ভব। আগে জানা থাকলে সকালেই আমার হোটেলে আসতেন তিনি। কোলকাতার কথা, আমাদের বাঙ্লাদেশের কথা শোনবার তাঁর কতো সখ। আমেরিকা থেকে লণ্ডন হয়েই আবার ফিরবো কিনা, জিগ্যেস করলেন। তখন যেন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে ভুলে না যাই, সে কথা বার বার মনে করিয়ে দিলেন। তিনি লণ্ডনের বাইরে। ক্যাম্ব্রিজে। দূরত্ব বেশি নয়। কিন্তু সেটুকুও অতিক্রম করা সম্ভব হলো না। এমন কি পুনর্যাত্রার পথেও নয়। সে এক মহা দুঃখ।

মিলফোর্ডকে ফোনে পেলাম ফোন ধরতেই। প্রাণান্তিক যুদ্ধ করতে হয় না ওদেশে ফোনের কনেক্শন পেতে।

আমার কথা শুনে তো মিলফোর্ড অবাক। আমার ডাক নাম শুদ্ধ তাঁর জানা। সেই ডাক নামেই ডাকলেন তিনি। বল্লেন, সোজাসুজি চলে এসো আমার অফিসে। তোমার হোটেল থেকে খুব দূরে নয় আমাদের সি-এম-এস আস্তানা।

এই বলে একটা মোটামুটি ডিরেক্শনও দিলেন রেভাঃ মিলফোর্ড। কোন্ বাসে উঠে কোথায় গিয়ে নামতে হবে বলে দিলেন। আর ট্যাক্সি নিলে তো কথাই নেই।

কিন্তু আমার কাছে খুব সহজ মনে হলো না ব্যাপারটা। হাল-চাল জেনে নি একটু। গা-সহা হোক একটু এখানকার আবহাওয়া। এই মনে করে সময়

নিলাম। বেলা চারটের মধ্যে দেখা করবো, কথা হলো মিলফোর্ডের সঙ্গে। তারমধ্যে নিশ্চয় দেখা পাবো বিশ্বনাথবাবুর। হয়তো ছুটোছুটি করেছেন তিনি আমার খবরের জন্যে। যাঁদের খবর দেওয়া ছিলো তাঁর মধ্যে তিনি একজন।

আমাদের কাবাদিও খুব খুশি আমার আগমন-বার্তায়। আমাদের মানে পত্রিকা-যুগান্তরের। লণ্ডনে আমাদের সংবাদ প্রতিনিধি তিনি। সংবাদের স্কুপ-মাষ্টার। প্রেম না সিংহাসন? প্রেমের জন্যে সিংহাসন ত্যাগ। অষ্টম এডওয়ার্ডের সে অমর কাহিনী কে না জানে? কিন্তু সে খবর দিয়ে দেশজোড়া প্রথম চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন কে? এই সুন্দর কাবাদি। আমরা ডাকি তাঁকে সুন্দরভাই বলে।

সেই সুন্দরের আমন্ত্রণ ফেলি কি করে? কিন্তু উপায় নেই। কারণ সময় নেই। বল্লাম, দেখা হবে সন্ধ্যায়। ইণ্ডিয়া হাউসে। লণ্ডন ছাড়ার আগে যাবো সেখানে। কৃষ্ণ মেনন সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছেন। সুয়েজের ব্যাপার। অনেকের সঙ্গেই সাক্ষাতের সুযোগ মিলবে। অগত্যা তাতেই রাজী সুন্দর ভাই।

এবার ডাকছি ডাঃ মৌলিককে। ইণ্ডিয়া হাউসের ডাঃ মণি মৌলিক। আমাদের অনেক দিনের বন্ধু।

আরে আসুন, আসুন। ডাল-ভাত তৈরি। আপনাকেই তো আমরা খোঁজাখুঁজি করছি। কোথায় আছেন এখন? আন্তরিকতায় ভরা মৌলিক সাহেবের প্রশ্ন।

বল্লাম আমার হোটেলের ঠিকানা। জিগ্যেস করতে যাবো বিশ্বনাথবাবুর কথা, ও মা তিনিই যে কথা কইছেন আমার সঙ্গে! আমার খোঁজেই তিনি গেছেন ইণ্ডিয়া হাউসে। জানাই তো মৌলিকের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করবোই।

এক ঘণ্টার মধ্যেই বিশ্বনাথবাবু আমার হোটেলে আসছেন। এই কথা হলো। তাঁর এক বাঙ্গালী বন্ধুও আসছেন তাঁর সঙ্গে। এ কথাও তিনি জানালেন। ভালোইতো। দূরদেশে বাঙ্গালীর সান্নিধ্য কতো কাম্য। তবে লণ্ডনে বাঙ্গালীর অভাব কি? বাংলার বাইরে ভারতের অনেক শহরের চাইতেই লণ্ডনে বেশি বাঙ্গালী।

এদিকে সময় হয়ে গেছে মধ্যাহ্ন ভোজের। বাইরে থেকে ফোন এলো একটা। আমায় আবার কে ডাকবে এখানে? বিস্ময়ের বিদ্যুৎ চমক। তায় আবার নারীকণ্ঠ। আরো আশ্চর্য!

আমি মিসেস্ বসু বলছি। বি-বি-সি থেকে আপনাকে ফোনে ধরা যায় নি। তাই আমি আবার বাড়ি থেকে ফোন করছি। তা আর হোটেলে কেন? আমাদের বাড়িতেই চলে আসুন না।—বুঝলাম কমলবাবুর স্ত্রী ফোন করছেন। চমক ভাঙলো। বি-বি-সিতে ফোন করে কমলবাবুকে আমি ধরতে পারি নি। তিনি ধরতে পারেন নি আমাকে হোটেলে ফোন করে। তাই বাড়িতে জানিয়েছিলেন আমার হোটেলের ঠিকানা।

এখন যে আমার হোটেল ছাড়ার উপায় নেই তা জানালাম শ্রীমতী বসুকে। কমলবাবুর সঙ্গে কখন কোথায় দেখা হতে পারে জানতে চাইলাম।

আমিই যাবো আপনাকে সি-অফ্ করতে এয়ার টারমিনাস্-এ। অফিস থেকে ওর ছাড়া পেতে আজ অনেক দেরি।

বেশ, তাই আসুন। অন্তত একজনের সঙ্গে দেখা হোক।

একজন নয়। দুজন। খোকনও যাবে আমার সঙ্গে ওর বাবার প্রতিনিধি হয়ে।—রহস্য করে উত্তর দিলেন শ্রীমতী বসু।

ধন্যবাদ জানালাম।

নিচে নেমে এসে দেখি ডাইনিং হল প্রায় ভরতি। তখনও খালি মাঝখানের একখানি টেবিল। তিনখানা চেয়ারের একখানায় আসন নিলাম। এখুনি মুখার্জি হয়তো এসে পড়বেন তাঁর বন্ধুকে নিয়ে। দুখানা শূন্য আসন তাঁদের জন্যে। থাক যতোক্ষণ থাকে। না, খালিই থাকলো শেষ অবধি।

আমার খাওয়া প্রায় শেষ। চব্য চোষ্য লেহ্য পেয়। হ্যাঁ, এবার পানীয়েরই পালা। শেষ অংক। আমার বেলা অন্য কিছু নয়। একটু কফি শুধু।

ওরাও এসে হাজির। ডবল মুখার্জি। বিশ্বনাথ মুখার্জির বন্ধু কার্তিক মুখার্জি। একজনের হাতে ক্যামেরা। আর একজনের হাতে বাইনাকুলার।

বৃটিশ ভারতে জেলখাটা রাজনৈতিক কর্মী বিশ্বনাথ। এখন বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস গবেষণায় মত্ত। যুগান্তরে 'লণ্ডনের চিঠি'র লেখক। বন্ধুও

তাঁর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছেলে। এখন লণ্ডনের চাকুরে। যেমন লম্বা চেহারায়, লক্ষ্যও তেমনি উঁচু।

খেটে খাবো সে উপায়ও নেই স্বদেশে, তাই এদেশে এলাম। মোটামুটি ভালোই আছি। চেষ্টা করলে আরো কিছু করা যাবে।—কার্তিকের কথায় দুঃখের ছিটেফোঁটা, উদ্যমের আভাষ।

ওদের জন্যেও কফি এলো। কফির কাপে কথার হাউই। তবে তা বেশিক্ষণের জন্যে নয়। ওরই মধ্যে জেনে নিলাম কয়েক ঘণ্টার কর্মসূচী। বিশ্বনাথের মনের মতো করে তৈরি করা ব্যবস্থা।

অসম্ভব। এতো নিমন্ত্রণ রক্ষা চলে কখনো একবেলায়? আইজাকের চায়ের আসরে যাবো। আর ইণ্ডিয়া হাউসে। পথে মিলফোর্ডের সঙ্গে দেখা করে দে চম্পট। এবারের মতো এই যথেষ্ট। রাস্তাঘাট ঘুরে-ফিরে দেখবো না একটু?

বেরিয়ে পড়লাম তিনজন। আমি আর দুই বাহন। টাক্সি না নিলে সংক্ষিপ্ত সূচীও বান্‌চাল। ডাকো ট্যাক্সি। ঠিক কোলকাতার মতো নয় লণ্ডনের ট্যাক্সি। আকারে বড়ো। দরজা খোলা।

গাড়িতে এক চক্কর দিলাম যতোটা সম্ভব। ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেলাম এটা ওটা।

ট্রাফালগার স্কোয়ারের পাশ দিয়ে গেলাম। একটু থামলাম সামনে। দুনিয়া-জোড়া ওর নামডাক। কিন্তু আমাদের ডালহৌসি স্কোয়ারই বা খাটো কিসে? পুরোনো ডালহৌসি স্কোয়ারের কথা বলছি। শুধু বিস্তারেই নয়, সৌন্দর্য-বিচারেও।

আমাদের লালদীঘির প্রসন্নতার ছাপ নেই এখানে। আছে ইতিহাসের স্মৃতি। বৃটিশ বীরত্বের মহিমা-প্রশস্তি। মাঝখানে প্রায় দেড়শো ফিট উঁচু 'নেলসন কলাম'। চোখ ধাঁধানো ব্যাপার। সমুদ্র দেখছেন বীর নেলসন। সমুদ্রশাসনের সংকেত। অর্থাৎ পৃথিবী শোষণের। আর তাই তো মন বলছিলো অন্যকথা। এ ঠিক বীরত্বের প্রতীক নয়, বৃটিশ দম্ভের স্মারক স্তম্ভ। হ্যাঁ, স্মারকই বলছি। দম্ভ চিরস্থায়ী নয়। শতাধিক বছর ধরে—আঠারো শো একচল্লিশ থেকে এ স্তম্ভ এখনো দাঁড়িয়ে। কিন্তু আকাশ-ছোঁয়া বৃটিশ অহংকার আজ চুরমার।

ট্রাফালগার স্কোয়ার

দুধারের চার বৃটিশ সিংহ দুই পৃথিবীর সতর্ক প্রহরী বুঝি? তারাও আজ শ্রান্ত। ক্লান্ত অবসাদে যেন অবসন্ন দেখতে।

দুদিকে দুই জলাধার। দুটিতেই একটি করে ফুলঝুরি ফোয়ারা। অশ্রান্ত জলধারায় পূর্ণ জলাধার। বলিহারি ইংরেজের সৌন্দর্যবোধ! রাত্রির অপূর্বতা নাকি অবর্ণনীয়। কিন্তু তবু যেন হতশ্রী ট্রাফালগার স্কোয়ার। অন্তত আমার চোখে।

জোরে চলে ট্যাক্সি। বিশ্বনাথের তাগিদ। চোখের পলক ফেলতেও অনিচ্ছা। অনেক দেখার পথে। অনেক মিল কোলকাতার সঙ্গে। পথ পার্ক বাড়িঘর। লণ্ডনের নকল যে কোলকাতা। তাই অনেকাংশেই মিল। অমিলের দুরত্ব মনে মনে। সে ঘুচতে অনেক দেরি। আগে ওদের নেশা ঘুচুক। শোষণের নেশা আফিমের নেশা। ওরা তাতে এখনো বিভোর!

উঃ, ভারতকে কি গালাগাল! গাড়িতে বসে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে আমার গায়ে বিষের জ্বালা। সুয়েজের ব্যাপারে ভারতের মনোভাবে ক্ষিপ্ত ইংরেজ। পরের ঘরে বে-আইনী প্রবেশাধিকারের এতোই মত্ততা।

ষোল জাতির সভা চলছে তখন লণ্ডনে। ভারতের প্রস্তাবে ইংগ-মার্কিণ গোষ্ঠী ভীষণ গোঁসা। কিন্তু এ ব্যাপারে ফরাসী ও ইংরেজের দিকে আমেরিকা এতো টানে কেন? ওরা নাকি স্বাধীনতার স্বপক্ষে?

পথে পথে অনেক কিছুর দিকেই বিশ্বনাথের অংগুলি নির্দেশ। ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি। অ্যাডমিরালটি আর্চ। তারপরে সেণ্টজেমস পার্ক। এসবই পরের বারের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

এলাম ওয়েষ্ট মিন্ষ্টার আবের সামনে। বিখ্যাত সেণ্টপিটার গীর্জে। ঠিক উল্টো দিকে পার্লামেণ্ট ভবন। ভারত ইতিহাসের কয়েকখানা ছেঁড়া পাতা উড়ছে যেখানে। দুই-ই স্থাপত্যে ভাস্কর্যে অতুলনীয় ইংল্যাণ্ডে। এও দেখা এখন নয়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার আশা। হাতেই থাক।

আর একটু দূরে পবিত্র টেমস্। ও দেখেই মন জুড়ে বসে গংগাস্মৃতি। ভাবসাদৃশ্যের জড়াজড়ি।

ঘুরতে ঘুরতে এলাম স্মিথ স্কোয়ারে। লেবার পার্টির হেড কোয়ার্টারে। বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়নসমূহের কেন্দ্রভবন। শ্রমিক দলের মাথা-মাথা মুরুব্বিদের আড্ডাখানা। ওখানেই আমি আমন্ত্রিত। মিঃ সেসিল আইজাকের আমন্ত্রণ।

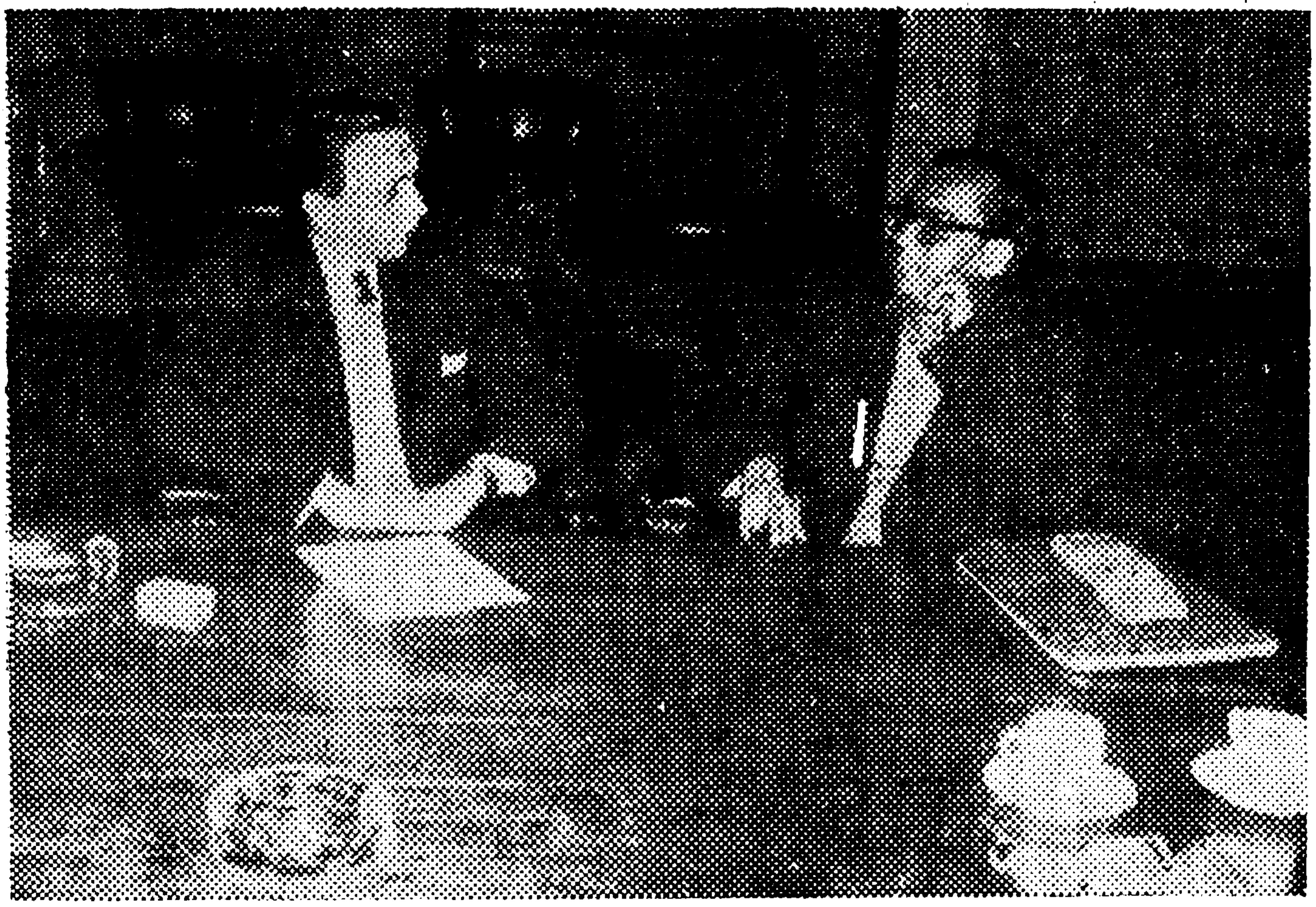

বৃটিশ লেবার পার্টির হেড কোয়ার্টারে চা-এর আসর। মিঃ সেসিল আইজাকের সঙ্গে লেখকের আলোচনা।

বৃটিশ এশিয়ান এ্যাণ্ড ওভারসিজ স্যোসালিষ্ট ফেলোশিপের সেক্রেটারী মিঃ আইজাক। বয়সে তরুণ, কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত। সদালাপী হাসিখুশি।

বৃটিশ সরকারের স্থয়েজ নীতি নিয়ে কথা উঠলো। সে নীতির তিক্ততা আইজাকের প্রতি কথায়। টোরি কাগজগুলোর ভারত-বিদ্বেষে ব্যথিত শ্রমিক দল।

ইংল্যাণ্ডে নির্বাচন হতে এখনো অনেক দেরি। কিন্তু এখন নির্বাচন হলে রক্ষণশীল দল নির্ঘাৎ গো-হারা!—আমার প্রশ্নের পিঠে আইজাকের কড়া জবাব। ভারতের কথাই এশিয়ার কথা, এ কথা স্বীকার করলেন তিনি। কমনওয়েলথ থেকে ভারতকে বার করে দেওয়া উচিত, টোরি কাগজের এ মন্তব্যে তাঁর প্রচণ্ড ক্ষোভ। আমার অপমান বোধের উদ্বেগে আইজাকের অস্থিরতা।

কেন তবু কমনওয়েলথ-এর সঙ্গে আমাদের গা ঘষাঘষি? কি যে লাভ কিছুই বুঝি না।

মিঃ এ্যাটলি আপনাদের বন্ধু। তিনি যাচ্ছেন আপনাদের দেশে শুভেচ্ছা মিশনে। আপনি খুশি হলেন নিশ্চয়ই শুনে।

নিশ্চয়ই। —এ্যাটলি আমাদের বন্ধু তাও স্বীকার করলাম। তবে দেশটাকে যদি খণ্ড খণ্ড না করে যেতেন তাহলে বৃটেনের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব-বন্ধন শিথিল হতো না কোনদিন। মনে মনে বল্লাম।

আরো অনেক কথা হলো চা-এর আসরে। সে সব থাক এখন।

সেখান থেকে গেলাম ফ্লিট স্ট্রীট এলাকায়। ওদিকটায় সাংবাদিকদের প্রবল আকর্ষণ। তবে এ যাত্রায় আর খবরের কাগজের অফিস পরিদর্শন নয়। সব আমন্ত্রণ বাতিল এবার। বন্ধু আইজাকের অনুমোদন নিয়েছি। তাঁরই উদ্যোগে লণ্ডনে আমার সব বিধিব্যবস্থা।

চারটের মধ্যে দেখা করার কথা রেভাঃ মিলফোর্ডের সঙ্গে। চারটে বাজেনি তখনো। সি এম এস বিল্ডিং। উঠে গেলাম চারতলায়। লিফটের দরজায় এসে অভ্যর্থনা করলেন মিলফোর্ডের সেক্রেটারী। সরাসরি নিয়ে গেলেন তাঁর কাছে।

একটু আগেই কে যেন বেরিয়ে গেলেন? মিসেস্ মিলফোর্ড নাকি? না, অন্য কেউ।

মিসেস্ মিলফোর্ডও পড়াতেন সেণ্টপলস্ কলেজে। তার চেয়ে তাঁকে ভালো লাগতো আমার চিত্র-শিল্পী হিসেবে। কোলকাতায় একবার তাঁর শিল্প-প্রদর্শনী দেখেছিলাম। বাঙলা দেশকে ভালোবেসেছিলেন তিনি। তাঁর ছবিতে তার পরিচয়।

মিলফোর্ড এখন একরকম বৃদ্ধ। কিন্তু বার্ধক্যকে অস্বীকার করে চলায় ওদের আনন্দ। অনেকের কথাই তাঁর মনে আছে দেখলাম। জিগ্যেস করলেন অনেকের কথা। কলেজের কথা। কোলকাতার নানা কথা। সময় নেই। তাই প্রায় প্রস্তাবনার পরেই প্রস্থান। অথচ আরো কতো আলাপের ইচ্ছে। দু তরফ থেকেই। তবে ফেরার পথের আমন্ত্রণ নিয়েই ফিরলাম সেখান থেকে।

ছুটে চলো এবার হোটেল মুখো। সেখান থেকে বোচ্‌কা-বুচ্‌কি নিয়ে এয়ারপোর্টে। তার পরে আবার উড়ন্ত পাখি। সকাল থেকেই কাণের দুয়ারে অতলান্তিকের আহ্বান। প্রাণের দুয়ারে মাতামাতি।

> 'কী জানি কী হল আজি জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
> দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।'

অতলান্তিকের আকাশ পাড়ি

হোটেলের পথে একটু ঘুরেই যাই।

ইণ্ডিয়া হাউস। লণ্ডনের অন্যতম সেরা রাজপথ অলডুইচে আমাদের হাই কমিশনের অফিস। বিরাট বাড়ি।

একটা ইতিহাস আছে এ বাড়ির। সে ইতিহাস জানার মতো। লণ্ডনে ভারতীয় হাই কমিশনার পদের সৃষ্টি ১৯২১ সনে। প্রথম হাইকমিশনার স্যার উইলিয়ম মায়ার। গ্রসভেনার গার্ডেন্স-এর তিনটি ছোট ছোট বাড়িতেই তখন হাইকমিশনের পুরো আফিস। তাতেই চলে যেতো কোন রকমে প্রথম কয় বছর। কিন্তু দ্বিতীয় হাই কমিশনারের আমলে নানা রকমের কাজবৃদ্ধি। দ্বিতীয় হাই কমিশনার একজন ভারতীয়। বাঙালী। স্যার অতুল চট্টোপাধ্যায়। দুবছর ধরে নানা বিচার বিবেচনার পর স্থির হলো লণ্ডনে 'ভারত ভবন' স্থাপনের। তার ভার পড়লো বিখ্যাত স্থাপত্য-শিল্পী স্যার হার্বার্ট বেকারের ওপর। ভারত-শিল্প বিশেষজ্ঞ তিনি। নয়াদিল্লী শহরের পরিকল্পনাকারদের তিনি অন্যতম। তাঁরই নেতৃত্বে এই মর্মর প্রাসাদের প্রতিষ্ঠা। তিন বছর ধরে বহু শিল্পীর শ্রম-সাধনার ফল। স্মরণীয় ১৯৩০। সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী এই ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন এই বছর। ইতিহাসের ইংগিত তখনো বুঝতে পারেনি কোন ইংরেজ। তাই এই ইণ্ডিয়া হাউসের দ্বার উন্মোচনের দিনেও অন্ত ছিলো না ইংরেজের অহমিকার। সে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সে কথাই আজ প্রথম মনে পড়ে। সেই ইণ্ডিয়া হাউস এবার শুধু একবার চোখে দেখা। ক্ষণিকের দেখা-সাক্ষাৎ।

ভেতরে ঢুকতেই গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের প্রতিমূর্তি। মাথা নোয়ালাম। কিন্তু মূর্তিতে কেন মালিন্য চিহ্ন? আমরা শ্রদ্ধাহীন। কর্তব্যে উদাসীন।

বুদ্ধ, অশোকস্তম্ভ আরো নানা শিল্পকর্ম। সবই তো ভারত-পরিচয়। পরিবেশে প্রাণ-চঞ্চল। কতো আপন আপন! কিন্তু এতো বিদেশী এধার-ওধার? অধিকাংশই হাইকমিশনের কর্মচারী। আমাদের দেশে শিক্ষিত

বেকারের সমস্যা বিরাট। লণ্ডনেও কি কম ভারতীয়? তবু এতো বিদেশীর আধিক্য কেন আমাদের হাই কমিশনে? সদুত্তর পাইনি।

কৃষ্ণ মেননের সাংবাদিক বৈঠক। দেরি আছে এখনো খানিকটা। ওপরে জড়ো হয়েছেন সাংবাদিকরা। তাঁদের সঙ্গেই দেখা করি। ডাঃ মৌলিককে নিয়ে এসেছি তাঁর ঘর থেকে। তিনিই পরিচয় করিয়ে দিলেন সবার সঙ্গে।

আবহাওয়া গম্‌-গম্‌। সুয়েজের উত্তেজনা। সুন্দর ভাই বেরিয়ে এলেন হল থেকে। আমি তাঁকে আগে জানাইনি কেন আমার আসার কথা, অভিযোগ করলেন। আমি অভিযোগ কাটালাম। বল্লাম, তিন মাস পর লণ্ডনে আসবো, এবার শুধু তারই খবর জানিয়ে গেলাম।

এলেন ডাঃ তারাপদ বসু। আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিনিধি তিনি। বিলেতে থেকেও বাঙালীয়ানা তাঁর চলায়-বলায়। পোষাক-পরিচ্ছদে না হলেও অন্তত মনে-প্রাণে। তাইতো বড়ো কথা। ভালো লাগলো ডাঃ বসুর সঙ্গে অল্পক্ষণ কথা বলে।

এককালে চলতো জাতীয়ত্ব বর্জনের প্রতিযোগিতা। বিশেষ করে এদেশে এসে। যে যতোটা সাহেব হতে পারলো তার বাহোবা ততোখানি। সে ছিলো আমাদের স্বদেশের বিদেশী আমল। তখনো আমাদের মধ্যে ছিলেন দুচারজন মাথাউঁচু মানুষ। অত্যন্ত বলিষ্ঠমনা তাঁরা। আজ স্বদেশী আমলে তেমন মানুষের অভাব হবে কেন?

আচার্য রায়ের কথা মনে পড়লো। তিনি তখন বিলেতে। ধুতি-পাঞ্জাবী পরা সাদাসিধে বাঙালী। আছেন লণ্ডনের বিলাস-বর্জিত এক দরিদ্র এলাকায়। ওল্ড কেণ্ট রোডে। অতি সাধারণ একখানি ভাড়াটে ঘরে। কিছুদিন বাদে এক বাঙালী ছাত্র এলেন লণ্ডনে পড়তে। বড়লোকের বাবু-ছেলে উঠলেন প্লাজা হোটেলে। বনেদী কেন্‌সিংটনে। আমি যে এলাকায়। পুরোদস্তুর সাহেব। কিন্তু সাহেবিয়ানায় খরচ যে বড্ড বেশি। ছাত্রটি কিছুদিন বাদে গেলেন আচার্যদেবের আস্তানায়। টাকার অংকের হিসেবে মাথা ঘুরে গিয়েছিলো তাঁর। ঝোঁকের মাথায় চলে এলেন আচার্যের আশ্রয়ে। কিন্তু কয়েক দিন না যেতেই কেমন যেন লজ্জা লজ্জা! ভালো ভালো 'খাওয়া-পরা' সব বাদ দিয়েই যাঁর চলা, তাঁর সঙ্গে চল্‌তে যাওয়া বিড়ম্বনা। আচার্য রায়ও জমিদারের ছেলে। কিন্তু দরিদ্র ভারতের প্রতিনিধি যে তিনি। ছাত্রটি উঠে

যেতে চাইলেন পিকাডেলিতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে হবে বলে। যাতায়াতের সুবিধের অজুহাত দেখিয়ে। প্রফুল্লচন্দ্র সবই বুঝলেন। বল্লেন, বেশ তাই যাও।

ভবিষ্যৎ জীবনে ঐ ছাত্রটিও খ্যাতিমান হয়েছিলেন। কিন্তু পরাধীন দেশের মানুষ হয়ে বলিষ্ঠ স্বাজাত্যবোধের জন্যে বিলেতে যে সম্মান পেয়েছিলেন আচার্য রায় তার তুলনা নেই।

একালে তেমন লোকের যথার্থ '.ভাব। তাই বিদেশে কোন বাঙালীর একটু বাঙালীয়ানা, একটু ভারতীয় ভাবের সন্ধানে আনন্দ হয় বৈ-কি !

ফিরে এলাম ইণ্ডিয়া হাউস থেকে। আবার ট্যাক্সি নিলাম। গাড়িতে বসেই চিঠি লিখলাম একখানা। লিখলাম অফিসে। আমার অন্যতম সহকর্মী রাজেন বাবুকে।

তাজ্জব ব্যাপার ! এয়ারপোর্টের বাস এসে ফিরে গেলো এরই মধ্যে ! এখনো যে দুঘণ্টার ওপর সময় বাকি। হাওয়াই জাহাজ ছাড়বে বিকেল সাতটায়। বিকেলই বল্‌ছি, কারণ রাত হবে তারও অনেক পরে।

কার্পেট ঢাকা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছি। ডেকে থামালেন রিসেপ্‌শনিষ্ট।

বল্লেন, কোথায় যাচ্ছেন আপনি ? আপনার মালপত্র সব এখানে। ওপরে আপনার ঘরে এখন অন্য লোক। —একটু হাসলেন।

আমি তো শুনে অবাক। আবার কোথায় কি গোলমাল করে বসেছি কি জানি ! নেমে এলাম।

রিসেপ্‌শনিষ্ট জানালেন, আপনার সুবিধের জন্যেই নামিয়ে রাখা হয়েছে আপনার সব জিনিষপত্র। আমাদের তো জানাই, আপনি আজ যাবেন। বেরিয়ে গেছেন তাও জানি। তাড়াহুড়োয় না পড়েন, তারি জন্যে সব তৈরি রাখা। একটু আগেই বাস এসে আপনার খোঁজ করে চলে গেলো।

কি করা যায় এখন ?

ট্যাক্সি করে চলে যান এক্ষুণি এয়ার টার্মিনাস্-এ। একটা ছোট বিল আছে আপনার। —কড়কড়ে একখানি বিলপত্র এগিয়ে ধরলেন রিসেপ্‌শনিষ্ট।

কিসের বিল ভাবছিলাম আমি। না, ঠিকই আছে। তাকিয়ে দেখলাম, আমার টেলিফোন চার্জ। দেনা-পাওনা মিটিয়ে দিয়ে বিদায় নিলাম।

বিশ্বনাথ আর কার্তিক। আমার দুই সঙ্গী। দুজনেই আশ্বাস দিলেন, ঘাবড়াবেন না।

কিন্তু ঘাবড়াইনি তো। তবু ওঁদের অভিজ্ঞতার বড়াই ছাড়বেন কেন ওঁরা? আমি যে অনভিজ্ঞ!

খুশি মাখানো একটি প্রীতি-নমস্কার। গাড়ি থেকে নামতেই দেখি শ্রীমতী কণিকা বসু। কমলবাবুর গৃহিণী। সঙ্গে তাঁদের ছেলে শ্রীমান কল্যাণ। আমার বড়ো ছেলের নামে নাম। নেমেই তাকে আদর করলাম।

হ্যাঁ, সন্দেশ আছে সঙ্গে। কোলকাতার কড়া পাকের সন্দেশ। বন্ধুদের দেওয়া সব উপহার। তারই কিছুটা। সেই রজনীগন্ধার গন্ধে এখনো যেন প্রাণ জুড়োয়।

আমি কি জানি সব সন্দেশই আবার বাক্সবন্দী। রাত্রিতে সুটকেশ খুলে অবাক বিস্ময়। ব্যাগে পুরে নেয়াই সুবিধে। তাই নিয়েছি। তারই থেকে এক প্যাকেট কল্যাণের হাতে দিয়ে পরম তৃপ্তি। আমাদের দুজনে তখন ভারি ভাব।

সে সন্দেশ আমরাও খেলাম। কোলকাতাকে স্মরণ করলাম সবাই মিলে একসঙ্গে। ভারি আনন্দ।

এয়ার টার্মিনাস্-এ দাঁড়িয়ে আমরা। ভিক্টোরিয়ায়। বিশ্বনাথ থাকেন এ অঞ্চলে। খুব কাছেই নাকি তাঁর নিবাস। বল্লেন বিশ্বনাথ। পরের বার দেখা যাবে।

বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে গল্প করি সাধ্য কি। এক্ষুণি ছুটবে এয়ারপোর্টের বাস। যাত্রীরা ছুটছে। আমিও এগুলাম সঙ্গে সঙ্গে। বাসে উঠে বসেও গল্পের শেষ নেই। মুখ বাড়িয়ে বাড়িয়ে কতো কথা।

আমরা গল্প ভালোবাসি। কথাপ্রিয় জাত। ইংরেজ কম কথার মানুষ। তাই বোধ হয় যখন হাতে কাজ থাকে না তখন মুখের সামনে থাকে ওঁদের খবরের কাগজ। কথাকে আড়াল দেওয়া আর কি!

শ্রীমতী বসুর আগাম আমন্ত্রণ। আমারও আগাম প্রতিশ্রুতি, ফেরার পথে তাঁর হাতের মাছ-ভাত না খেয়ে লণ্ডন ছাড়ছি না।

বাস ছাড়লো। ওদের হাত নাড়ায় বিদায় সম্ভাষণ। ওরা অদৃশ্য। কিন্তু হঠাৎ আমার পকেটে হাত পড়তেই চমকে উঠলাম। আমার পেন? এক

এক করে সব কটা পকেট হাতড়ালাম। না, কোথাও নেই। কোথায় ফেলে এসেছি কে জানে? কিংবা কোথাও হয়তো পড়েই গেছে। 'সব-পেয়েছির দেশ' লণ্ডন। আমি সেখানে কলম হারালাম! হঠাৎ যেন একটু দমে গেলাম। পেন ছাড়া আমি যে পংগু।

এয়ারপোর্টে এসে দেখি বেশ ভিড়। অনেকের সঙ্গেই কথা হলো। অনেক যাত্রী আমেরিকান। ওঁরা যেচে কথা বলেন। ডেকে বন্ধুত্ব করা ওঁদের স্বভাব। আগের শোনা কথা। আমেরিকায় পৌছানোর আগেই অনেকবার তার প্রমাণ পেলাম।

এবারের বিমান আরো বড়ো। আরো নতুন। অতলান্তিক অতিক্রমের জন্যে বিশেষভাবে তৈরি। মনও বিশেষভাবে প্রস্তুত সে জন্যে।

শোঁ-শোঁ-শোঁ। বিমানের চাকা ঘুরলো ঠিক সাতটায়। বৈদ্যুতিক আলোর সংকেতে সবার কোমরে বেল্ট বাঁধা। বিমানবান্ধবী এলেন লজেঞ্চ-চকোলেটের ডালা হাতে। যার যা ইচ্ছে নাও। খানিকটা মুখ চলুক। কেউ নিলেন, কেউ নিলেন না। প্রতিবারেই এই রকম।

আর একটু পরে দুজন দাঁড়িয়ে পড়লেন দুদিকে। তাঁদের হাতে একটি করে লাইফ জ্যাকেট। লাইফ জ্যাকেট পরে দেখালেন তাঁরা যাত্রীদের। হাতে-কলমে শেখানো বলে যাকে। আকস্মিক বিপদে আত্মরক্ষার উপায় বর্ণনা।

কি লাভ হলো তাতে? একটু রহস্য বই কিছু নয়। খানিকটা প্লেন ম্যাজিক। অকারণ বিপদের কথা স্মরণের কি প্রয়োজন? লাইফ জ্যাকেটে আমার জীবন, সে ভাবনায় হাসি পায়। আত্মরক্ষায় তবু মানুষের কতো চেষ্টা, কতো চিন্তা!

দেখতে দেখতে তখন নটা। কিন্তু আশ্চর্য, রাত হয়নি তখনো। পৃথিবী বিচিত্র। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে মানুষের মন-পার্থক্য। তবু পৃথিবী এক। অনেক অনৈক্য সত্ত্বেও অনেক মিল। তাই পৃথিবীর মানুষেরও একত্র হবার এতো চেষ্টা। সফল হবে সে প্রয়াস?

লণ্ডনের 'দি টাইমস্' কাগজখানা পড়ছিলাম। ইংরেজ জাতির সেরা কাগজ। প্রচারসংখ্যার দিক থেকে নয়, প্রভাবে। প্রভাবশীলদেরও প্রভাবিত করে তার মতামত। সাধারণ ধারণায়, 'টাইমস্' সরকারী টোরিদলীয় মুখপত্র। আত্ম-ঘোষণায় সে 'নিরপেক্ষ'। সময় সময় সরকারী কাজের কঠোর সমালোচনায় সে নিরপেক্ষতার পরিচয়। জাতীয় আন্তর্জাতিক

বিষয়ে সকল পক্ষের মতামত প্রকাশে তার অকৃপণতা। তাই যুক্তরাজ্যের 'জাতীয় সংবাদপত্র' টাইমস্। তার নানা মন্তব্যের সঙ্গে আমার মতভেদ। তবু যে একখানা নিখুঁত সম্রান্ত কাগজ পড়ছিলাম তা ভুলতে পারছিলাম না। মুহূর্তের জন্যেও না।

কেমন যেন একটু ঘুম ঘুম ভাব। কাল রাতটা কেটেছে ছুটো-ছুটিতে। তার ওপর অনভ্যাসের অসোয়াস্তি। আজ ঘুমোবো ভালো করে। কিন্তু দিনের আলো যে মিলায়নি এখনো।

খাওয়া-দাওয়া সারা। এবার রাত। এবার জমাট ঘুম। ঘুমের অতলে অতলান্তিক।

অতলান্তিক পারাপারের কথা ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভাবছিলাম লিণ্ডবার্গের কথা। সাড়ে তিন হাজার মাইলের সংক্ষুব্ধ জলধি-বিমানে অতিক্রমণ। প্রথম পথিকৃৎ। সভ্যতার অগ্র-যাত্রার ইতিহাসে অন্যতম পুরোধা।

অবশ্য তাঁরও আগে অতলান্তিক পাড়ির গৌরব ক্যাপ্টেন জন এ্যালকক আর লেঃ আর্থার ব্রাউনের। আরো আট বছর আগের সফল প্রয়াস। তাঁদের সাফল্যে সংবাদপত্র জগতে হুলুস্থুল। ছয় বছর পর হলেও নিজ ঘোষিত বিপুল পুরস্কারের প্রাপকের সন্ধানে বৃটিশ সংবাদপত্র জগতের অধিনায়ক নর্থক্লিফের সে কী উল্লাস! বৃটিশ বৈমানিক এ্যালকক ও তাঁর মার্কিণ সহকারী ব্রাউনকে লর্ড নর্থক্লিফের উদার অভিনন্দন। তিনি লিখলেন :

My dear Alcock—A very hearty welcome to the pioneer of direct Atlantic flight. Your journey with your brave companion, Whitton Brown, is a typical exhibition of British courage and organising efficiency.

Just as in 1913 when I offered the prize, I felt that it would soon be won, so do I surely believe your wonderful journey is the warning to the cable monopolists and others to realise that within the next few years, we shall be less dependent upon them unless they increase their wires and speed up. Your voyage was made more quickly than the average press message of 1919.

Moreover, I look forward with certainty to the time when London morning newspapers will be selling in Newyork in the evening, allowing for the difference between the British and American time, and vice versa in regard to Newyork evening journals reaching London the next day.

Then we shall no longer suffer from the danger of garbled quotations due to telegraphic compression. Then, too, the American and British peoples will understand each other better as they are brought into closer daily touch.

Illness prevents me shaking you by the hand and personally presenting you the prize, but I can assure you that your welcome will be equal to that of Hawker and his gallant American compeer, Read, whose great accomplishment has given us such valuable data for future Atlantic work.

I rejoice at the good augury that you departed from and arrived at those two portions of the British Commonwealth, the happy and prosperous Dominion of Newfoundland and the future equally happy and prosperous Dominion of Ireland.

Yours sincerely, Northcliffe.

নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড থেকে আয়র্ল্যাণ্ডের ক্লিফডেন। এক হাজার নশো আশি মাইল। আকাশ পথে সে দূরত্ব অতিক্রম ষোল ঘণ্টা বারো মিনিটে! সে যুগে অপরিসীম কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে। কিন্তু লিণ্ডবার্গের সাফল্য যেন অকল্পনীয়। একক অভিযান। দ্বিগুণ পথ অতিক্রম। নর্থক্লিফের স্বপ্ন সার্থক তাঁর দুঃসাহসিকতায়।

ত্রিশ বছর আগের কথা। আমাদের ছাত্র-জীবন তখন। ক্যাপ্টেন লিণ্ডবার্গের দুঃসাহসিক অভিযানের সংবাদে বিশ্বময় উত্তেজনা। চঞ্চল সব তরুণ-মন। সে দিনের সেই পুরোনো অনুভূতির কথাই মনে পড়লো।

হয়তো তাই স্বাভাবিক। রাত বোধহয় প্রায় এগারোটায় অতলান্তিকে আমাদের বিমানঝাঁপ। ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পাষাণ-নিস্তব্ধতা। যাত্রীরা

সব নীরব নিথর। অন্তত ক্ষণ-মুহূর্ত নির্বাক। কে কি ভাবছিলেন জানি না। আমার চোখের সামনে ক্যাপ্টেন চার্লস লিণ্ডবার্গ।

আমরা এতোজন যাত্রী। তবু ভয় ভয়। লিণ্ডবার্গ নিঃসঙ্গ। তবু নির্ভয়।

বিশে মে'র শুভ প্রভাত। উনিশশো সাতাশ।

মাত্র এক ইঞ্জিনের বিমান। তেজোদীপ্ত একটি নাম। 'স্পিরিট অব সেণ্ট লুইস্'।

বৈমানিক লিণ্ডবার্গ। যিনি বৈমানিক তিনিই যাত্রী। অতলান্তিকের আকাশে একক মানুষ। সেকালে অকল্পনীয়। অসম্ভবকে সম্ভব করার মধ্যে দিয়েই নব নব যুগের উন্মেষ।

কোটি কণ্ঠের প্রার্থনা-মুখর সেদিন পৃথিবী। যাত্রা নিরাপদ হোক! যাত্রা সার্থক হোক! হৃদয়ে হৃদয়ে আকুল অগ্নি-কামনা।

তারই মধ্যে আকাশে উড়লো 'স্পিরিট অব সেণ্ট লুইস্'। লক্ষ্য প্যারিস।

ঘণ্টায় একশো মাইল বিমান-দৌড়। সেকালের রেকর্ড। অপরাহ্ণ গড়িয়ে সন্ধ্যা। সন্ধ্যা ছাপিয়ে রাত্রি। আকাশে ফুটলো তারা। আবার দিন। কোথায় সেই ধূসর-শাদা বিমান। কোথায় লিণ্ডবার্গ। কতো দূরে। লক্ষ জোড়া চোখ উর্ধ্বমুখে।

আশা নিরাশার দোলায় ঘণ্টা ফুরোয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অস্থির উন্মাদনা।

নিউইয়র্ক টাইমস্ সদা সতর্ক। কখন আসে বেতার-বার্তা! সমুদ্রগামী সমস্ত জাহাজের সঙ্গে ব্যবস্থা। 'স্পিরিট অব সেণ্ট লুইস্'-এর দর্শন মাত্র সংবাদ চাই। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সংবাদ কাহিনী। অতলান্তিকের আকাশে প্রথম একক পাড়ি। নিউইয়র্ক টাইমস্-এ বেরুবে সে সংবাদ, বেরুবে তার বিস্তৃত বর্ণনা। সে কাহিনীর স্বত্ব কেনা তাদের। বিনিময় মূল্য পাঁচ হাজার ডলার। টাকার অংকে পঁচিশ হাজার। লিণ্ডবার্গের সঙ্গে চুক্তি। ত্রিশ বছর পরেও কি আমরা এমনি কোন একটি কাহিনীর জন্যে এতো টাকা খরচের কথা কল্পনা করতে পারি? আমরা খরচ করতেও জানি না।

টাইমস্-এর লক্ষ লক্ষ পাঠক উন্মুখ সেই কাহিনীর জন্যে।

কিন্তু কোথায় লিণ্ডবার্গের বিমান? তেত্রিশ ঘণ্টা অতীত। তবু দেখা নেই। দুশ্চিন্তার স্বেদবিন্দু কপালে কপালে।

হঠাৎ জয়ধ্বনি ওঠে। দেড় লক্ষ কণ্ঠের জয়ধ্বনি। বীর বৈমানিকের সম্বর্ধনায় প্যারিসের লে বুর্জেৎ বিমানঘাঁটিতে দেড় লক্ষ লোকের সমাবেশ। লিণ্ডবার্গের নির্বিঘ্ন অবতরণ। সাড়ে তিন হাজার মাইল সাড়ে তেত্রিশ ঘণ্টায়।

দেড়খানি মাত্র স্যাণ্ডউইচ আহার। মাঝে মাঝে তন্দ্রা-স্পর্শ চোখের পাতায়। কিন্তু সদা-জাগ্রত মন। লক্ষ্য সামনের দিকে। দৃষ্টি সীমান্তহীন। উত্তাল সমুদ্র। দূর চক্রবালও অদৃশ্য। একা মানুষের ঘুম আসে সেখানে? পৃথিবীর মাটিতে প্রাণচিহ্নের দর্শনে আনন্দ উল্লাস। ঘুম পালায়। নেমে পড়েন বিজয়ী লিণ্ডবার্গ। অবিরাম করতালিতে মহৎ কৃতিত্বের অভিনন্দন।

সেদিনের একক অভিযাত্রী আহার-নিদ্রাহীন। আমার বেলা ঠিক তার উল্টো। প্রচুর আহারের পর গভীর নিদ্রায় অভিভূত আমি। গভীর আত্মবিশ্বাসের ফল। যে আত্মবিশ্বাসের পথ উন্মুক্ত করে দিয়ে গিয়েছিলেন লিণ্ডবার্গ। সেই মহান্ লিণ্ডবার্গের কথা ভাবতে ভাবতেই নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তাঁকে নমস্কার।

যখন ঘুম ভাঙ্লো রাত তখন ঠিক ছটা। প্রায় ভোর ভোর। দিন বড়ো, রাত ছোটো যে!

কোথায় এলাম?

গুস্বে বিমান বন্দরে।

সে আবার কোথায়?

কানাডায় ল্যাব্রেডর উপদ্বীপে।

ও, তাহলে তো মহাসমুদ্র পার হয়ে এসেছি আমরা!

হ্যাঁ, তাই। —পাশের যাত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা।

ল্যাব্রেডরের পরিচয় জানা। খুব বিস্তারিত না হলেও মোটামুটি। কিন্তু গুস্বের নাম শুনিনি আগে।

চলুন। নামলেই একটু আভাষ পাবেন। আর একটু পরিচয় পাবেন। —বল্লেন মিঃ হক। আমার পাশের বন্ধু। ওয়াশিংটনে কমার্স ডিপার্টমেণ্টের একজন বড়ো চাকুরে। ফিরছেন লণ্ডন থেকে। একজন বয়স্ক আমেরিকান। সেই থেকে কথা বলার কোন সুযোগই হয়নি ভদ্রলোকের সঙ্গে। কথার সুরু গুস্বেতে এসে।

ল্যাব্রেডর। সভ্য মানুষের প্রথম পদার্পণ ঘটেছিলো যেখানে ৯৮৬ সালে।

গ্রীণল্যাণ্ড আবিষ্কার করতে যেয়ে এখানে আকস্মিক উপস্থিতি ঘটেছিলো হারজুলফ্‌সনের। তারপর মাছ আর কাঠের লোভে বহু বিদেশীর আবির্ভাব। ফরাসী, স্পেনিস, পর্তুগীজ। পশ্চিম গোলার্ধে বৃটিশ আধিপত্যেরও প্রথম সূত্রপাত ল্যাব্রেডরে আর তার পাশের দ্বীপ নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে। আজ এ দুই-ই স্বাধীন কানাডার স্বশাসিত প্রদেশ। পৃথিবীর প্রাচীনতম ক্ষয়িষ্ণু-পাষাণস্তূপ রকি পর্বত এ অঞ্চলে। এ নিয়ে অবশ্য মতান্তর আছে। কারুর কারুর মতে পাশের আপালেশিয়ান পর্বত শ্রেণী আরো পুরোনো। থাক মতভেদ। আমার কাছে ও সব অবান্তর। রকি, আপালেশিয়ান দুই-ই ক্ষয়িষ্ণু ভংগিল। প্রকৃতির লীলা-প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন সৃষ্টি। নতুন নতুন মালভূমি উপত্যকা আর বহু খরস্রোতা নদীর উদ্ভব। সাগর-কন্যা এসব স্রোতোধারা। অতলান্তিকমুখো তাই সবার গতি। তেমনি একটি নদী হ্যামিল্টন। তীরে তীরে তার সুন্দর সুন্দর জলপ্রপাত। গুস্‌বেও তারই অদূরে। মেলভিল হ্রদের দক্ষিণ প্রান্তে ল্যাব্রেডরের একটি প্রাণকেন্দ্র। একটি বিমান অবতরণ-ভূমি।

আরো জানলাম, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মার্কিন সমরবাহিনীর একটি বিরাট ঘাঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছিলো এই গণ্ডগ্রাম গুস্‌বে। বিমানঘাঁটির জন্যেই এই গ্রামের পত্তন। কানাডা সরকারের সৃষ্টি।

নেমেই থম্‌কে দাঁড়ালাম। উঃ, কী ভীষণ শীত গুস্‌বে বিমানঘাঁটিতে! বরফ-ধোঁয়া জমাটি শীত। লাউঞ্জে গিয়েও শীতে ঠক্‌-ঠক্‌। দরকার নেই আর বেড়াবার। দৌড়ে গিয়ে উঠলাম আবার বিমানে।

পাহাড় আর বরফের দেশ ল্যাব্রেডর। বছরের সাত-আট মাসই বরফ ঢাকা। তাই এতো ঠাণ্ডা।

এস্কিমোদের কথা মনে পড়লো। গ্রীণল্যাণ্ডের মতো এ দেশেরও আদিবাসী তারা। বরফের ঘরে বাস তাদের।

বরফের ঘরকে ইগলু বলে এস্কিমোরা। ওদের দেখবো কতো সখ। ওদের ঘর-বাড়ি। কিন্তু তখন যে গভীর রাত। কোথায় পাবো তখন সেই প্রকৃতির দুলালদের! থাক এবার।

প্রচণ্ড শীতে কাঁপতে কাঁপতেই যেন এবার উড়লো বিমান। কল্পনায় নিউইয়র্কের অভিজ্ঞান। আরো কয়েক ঘণ্টা। তারপরে উত্তরণ। তখন খাস মার্কিণ মুলুকের মাটি স্পর্শ।

এলেম নতুন দেশে

আর এক দফা ঘুম। তার পরে একটানা গল্প। গল্পের আবহাওয়ায় ব্রেকফাষ্ট জম-জমাট।

বেশ গল্পে লোক মিঃ হক। পুরো নাম পল হক ভদ্রলোক নিজেই লিখে দিলেন তাঁর নাম-ঠিকানা আমার নোট-বুকে। সময় পেলে একদিন দেখা করতে বল্লেন। আমার ঠিকানা আমারই অজানা। তা না হলে তিনিই দেখা করতেন। বয়সে অনেক তফাৎ। তাহলেও বন্ধুত্বে বাধা নেই। খুব খাতির জমে গেলো কথায় কথায়। আমায় তাঁদের অফিস ঘুরিয়ে দেখাতে পারলে তিনি খুব খুশি হবেন জানালেন।

ওয়াশিংটনের কমার্স বিল্ডিং-এ অফিস। রুম নম্বর—১৮৬৪। মিঃ হকের ঠিকানা। ব্যুরো অব ফরেন কমার্স। তারই ট্রেড মিশন প্রোগ্রামের ডাইরেক্টর তিনি। অনেক কথা বল্লেন শিল্প-বাণিজ্যের গতি-প্রগতি সম্বন্ধে। ব্যাগ থেকে বার করে তাঁদের বিভাগীয় প্রচার-পত্রিকা দেখালেন। তাতে নানা দেশের নানা তথ্য, নানা বিষয়ের রকমারি ছবি।

আপনি কিছু বলবেন আপনাদের দেশের শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে? তা হলে একটা বক্তৃতার আয়োজন করা যেতে পারে। কি বলেন?—জিগ্যেস করলেন মিঃ হক।

না, ও বিষয়ে আমি এক রকম অনধিকারী। এ কাজ আমার নয়।—সবিনয়ে আপত্তি জানালাম।

তারপরে এসে গেলো রাজনীতি। এ প্রসংগেও তেমন আনন্দ নেই আমার। কিন্তু এ যে আমার পেশার প্রধান অংগ। যতো এড়াতেই চাই, এড়ানো যে দায়!

কথায় কথায় রুজভেল্টের কথা উঠলো। মিঃ হককে দেখলাম ভীষণ বিরূপ রুজভেল্ট সম্পর্কে। তাঁর কঠোর সমালোচনা করলেন তিনি।

আমি তো আশ্চর্য। রুজভেল্টের 'নিউ ডীলে'র কথা পাড়লাম। তাঁর পরিকল্পিত 'রাষ্ট্র-উদ্যোগ' আমেরিকাকে রক্ষা করেছিলো উনিশ শো ত্রিশে।

বিশ্ব-মন্দার চরম বিপর্যয়ের কাল তখন। সে কথা স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু তাও স্বীকার করে নিতে আপত্তি মিঃ হকের। কি জানি কেন এ অশ্রদ্ধা। দেখলাম প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের ওপর অগাধ আস্থা তাঁর। জাতীয় আন্তর্জাতিক সব ক্ষেত্রেই মার্কিণ রাষ্ট্রপতি হিসেবে আইকের অবদান নাকি উজ্জ্বলতর। এই তাঁর মত। তাঁর দৃঢ় ধারণা। হয়তো দলভেদই এই মতভেদের মূল কারণ।

ঐ যে নিউইয়র্ক। তখনো দূর। তবু দৃষ্টি-সীমানায়। বিরাট অঞ্চল জুড়ে সুবিশাল মহানগরী।

·· এখন খুবই কাছে। কিন্তু বাইরে বৃষ্টি যে। টিপ্ টিপ্ থেকে ঝুপ্ ঝুপ্। কি করে নামবো?

একবার ঘড়ির দিকে চাইলাম। অনেকক্ষণ সময় দেখিনি। সে কি, এখুনি মধ্যাহ্ন, বেলা দুপুর! বারোটা বাজতে চলেছে যে আমার ঘড়িতে!

আপনার ঘড়িতে টাইম কতো, দেখুনতো একটু।

ঠিক সাড়ে সাতটা। —ঘড়ি দেখে বল্লেন মিঃ হক।

কাঁটা ঘুরিয়ে সময়টা আবার ঠিক করে নিলাম। প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টার তফাৎ লণ্ডন টাইমের সঙ্গে।

এবার নামবো। আমেরিকার মাটিতে পা পড়বে। মায়াবতী আমেরিকায়।

কিন্তু একে শীত শীত, তায় আবার বৃষ্টি। বিশ্রী আবহাওয়ায় মন খারাপ। তবে ব্যবস্থা পরিপাটি। সামান্য অসুবিধে হলেও ভিজতে হয় নি বৃষ্টিতে।

প্লেনের দরজায় দাঁড়িয়ে দুই এয়ার হোষ্টেস। উঠতে নামতে প্রতিবারই এমনি এসে দাঁড়ান তাঁরা। সাজগোজে কায়দা দুরস্ত। সাদর অভ্যর্থনা, বিদায় অভিনন্দন জানান যাত্রীদের।

গুড্ বাই!

গুড্ বাই!!

নমস্কার প্রতি-নমস্কার। একটু করমর্দন। একটু হাসি বিনিময়ে মন দরিয়ায় ছোট্ট ঢেউ। ক্ষণিক বিদ্যুৎ।

কিন্তু শুধু বিদায় সম্ভাষণ'নয় এবার। শুধু মিষ্টি হাসির অভিনন্দন নয়। হাতে হাতে একটি করে ছাতা। প্যান আমেরিকানের উপহার? সে যা হয়

হবে। অসময়ের বন্ধুতো বটে ! মাথায় মাথায় আকাশ-নীল ছাতা। অলুক্ষণে কালোমেঘ আবডাল। কালোমেঘের ছায়ামুক্ত এ পৃথিবী প্রাণখোলা হাসি হাসবে কবে ?

আইড্‌ল ওয়াইল্ড। নিউইয়র্ক ইণ্টার-ন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। মিউনিসিপ্যাল বিমান বন্দরও। বয়সে নবীন। মাত্র বছর নয় আগে প্রতিষ্ঠিত। পরিধিও বিরাট। প্রায় পাঁচ হাজার একর। একই শহরের দ্বিগুণ বয়সী বিখ্যাত বিমানঘাঁটি লা গার্ডিয়ার আট গুণেরও বেশি বড়ো। বিপুল ব্যস্ততা। মুহূর্তে মুহূর্তে ছোট বড়ো নানারকম বিমানের ওঠানামা। কিন্তু তবু অনলস আমেরিকার অতি ব্যস্ত এ বিমান বন্দরের 'অলস' তুর্নাম কেন ?

বিমান ময়দান পেরিয়ে এসে ছাতা জমা দাও দোর গোড়ায়। তারপরে হেল্‌থ সার্টিফিকেট ও কাষ্টম্‌স্‌ চেক।

কিন্তু প্রথম ছাড়া পেতে আমাদের বেলা দেরি কেন ? এশিয়ান বলে ? তা না হলে বেছে বেছে আমাদের কয়জন চীনা, জাপানী, ভারতীয় ও বর্মীকে অপেক্ষা করতে বলা কেন ? মনে সন্দেহ জাগে।

সে সন্দেহের সোজা উত্তর। আমেরিকান বা ইয়োরোপীয়ানদের বেলায় তেমন খোঁজ-খবরের বালাই নেই। আমাদের বেলায় নাকি একটু আছে।

থাক। তবে প্রথম গেটেই যা একটু দেরি। তারপরে সব নির্ঝঞ্ঝাট। প্রথম গেটে ছাড়া পেয়েই এগিয়ে চলি। একটা গোটা শহরই যেন বসানো বিমান বন্দরে।

সম্পূর্ণ আলাদা পৃথিবী। অপরিচিত পরিবেশ। সুশৃঙ্খল জনতার সঙ্গে আমিও চলেছি। কোন অসুবিধে বোধ নেই কোথাও।

তবু আশা করছিলাম স্টেট ডিপার্টমেণ্টের কাউকে। তেমনি কথা ছিলো। প্রথম গেটেই থাকার কথা। সেখানে খোঁজ করেন নি কেউ আমায়। আমিই খোঁজ করে দেখি। যদিই-বা কেউ এসে থাকেন।

না, স্টেট ডিপার্টমেণ্টের কারুর পাত্তা নেই কোথাও। হঠাৎ আবার মিঃ হকের সঙ্গে দেখা। তিনি আমেরিকান। কাজেই আগেই ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন আগে আগে।

কেউ আসেনি এয়ারপোর্টে আপনাকে রিসিভ করতে ?

না বোধ হয়। আর এলেও দেখা হবার কোন সম্ভাবনা দেখছি না।

সে তো ভারি দুঃখের কথা। যা হোক, কাষ্টমস্ চেকিংটা সেরে আস্থন। তারপরতো আর ভাবনা নেই আপনার। এক ঘণ্টায় ওয়াশিংটন।—এই বলে হাত দেখিয়ে ডান দিকে পাঁচ-সাত পা এগিয়ে যেতে বল্লেন মিঃ হক। এও একটু সাহায্য বৈ কি !

বারে, আমার দুটো স্থটকেশই হাজির এরই মধ্যে ! তখনও আসছে সব মালপত্র। কুলিতে মাথায় বয়ে আনছে না সে সব। ঠেলাতে করেও আসছে না। সবই আপ্‌সে বৈদ্যুতিক আকর্ষণে। অদ্ভুত দৃশ্য। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম খানিকক্ষণ ধরে।

ব্যাগেজ শ্লিপ দেখাতেই একজন কাষ্টমস্ কর্মী চাবি চাইলেন আমার স্থটকেশের। খুল্লেন স্থটকেশ দুটো। জিগ্যেস করলেন, কি আছে ওতে।

কিছুই তেমন নয়। আমার পোষাক-আসাক আর বন্ধুদের জন্যে সামান্য ভারতীয় সন্দেশ।—হাসতে হাসতে উত্তর দিলাম।

খড়িমাটির দাগ কেটে কাষ্টমস্ কর্মী ছেড়ে দিলেন স্থটকেশ দুটো। এও বলে দিলেন, এ নিয়ে আর ভাবতে হবে না আমাকে, ওয়াশিংটনে গিয়ে আমি ঠিক ঠিক পেয়ে যাবো আমার সব জিনিষ-পত্র। নির্ভাবনার বাণীই বটে। নিগ্রো ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম সেখান থেকে।

ওয়াশিংটনের বিমান সকাল নটায়। আমেরিকান এয়ার লাইনস্-এর সঙ্গে প্যান আমেরিকান এয়ার ওয়েজের বন্দোবস্ত।

গেলাম আমেরিকান এয়ার-লাইনস্-এর কাউণ্টারে। অনেকখানি দূর। সেখানে গিয়ে দেখি ওজনে বসেছে আমার সব মালপত্র। টিকিট দেখাতেই আমেরিকান সাহেব নতুন ব্যাগেজ রসিদ দিলেন একখানা। বল্লেন, আপনার প্লেন ছাড়বে এক নম্বর গেট থেকে।

অনেকটা পথ পেরিয়ে তবে এক নম্বর গেট। সে পথের দুধারে পুরু কাঁচের বেড়া। মাথার ওপরে আচ্ছাদন। বাইরে ঝড়-জল। ছোলাছুলি বাতাস। কিন্তু নির্বাধায় পথচলা।

এক নম্বর গেটে গিয়ে দেখি বিমান প্রস্তুত। গেটকিপারকে বল্লাম, আমি ওয়াশিংটন যাত্রী। তিনি ছেড়ে দিলেন আমায়। টিকিট না দেখেই ছাড়লেন। কিন্তু তাতে আমার বিড়ম্বনা।

বিমানে গিয়ে উঠতেই একজন টিকিট দেখতে চাইলেন। যেমন নিয়ম।

আপনি ভুল করেছেন। এ প্লেন আপনার নয়।—টিকিট চেকার আমার ভুল ভাংগালেন।

আমি নেমে আসতেই সিঁড়ি উঠলো। প্লেন ছাড়লো। আর একটু দেরি হলে ভুগতে হতো আরো তুর্ভোগ। অনেক ঘুরে তবে যেতাম ওয়াশিংটনে।

তবে কি অফিসেরই ভুল হয়েছে বলতে? সময় থাকতে জেনে আসি। গেলাম অফিসে। জিগ্যেস করলাম, ওয়াশিংটনের নটার প্লেন কখন আসবে!

ব্যস্ত হবেন না। এখনো কুড়ি মিনিট বাকি নটা বাজতে।—বিনীত কণ্ঠে ছোট্ট উত্তর।

আবার ফিরে এলাম যথাস্থানে। সেখানে তখন যাত্রীদের লম্বা লাইন। অদূরে তেমনি আর একটি বিমান।

এ আর আমার প্লেন না হয়ে যায় না। একরকম নিশ্চিত হয়েই আমিও গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম সেই লাইনে।

কিন্তু এবারও ভুল। গেটকিপার আমার টিকিট দেখে জানালেন, এ প্লেন আদৌ যাচ্ছে না ওয়াশিংটনে। আপনি আর একটু অপেক্ষা করুন।

বেশ একটু ঘাব্ড়ে গেলাম। চলে এলাম। বলে কি, এটাও নয় ওটাও নয়। তবে?

একজন আমেরিকান যাত্রী যাচ্ছিলেন পাশ কেটে। তাঁকেই পাকড়ালাম। জানালাম বিপদের কথা।

ভদ্রলোক শুনলেন সব। ব্যাগ-ট্যাগ রেখে আমায় নিয়ে এগিয়ে গেলেন এক নম্বর গেটের দিকে। গেটকিপারকে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, কি ব্যাপার!

তখন আসল রহস্যের উদ্ঘাটন। ওয়াশিংটনের ডাইরেক্ট প্লেন ছাড়বে নটা চল্লিশ মিনিটে। চল্লিশ মিনিট লেট। আর গেট নম্বর ডি। একটু আগের ঘোষণা। কান খাড়া না রাখায় এ ঝঞ্ঝাট। বেশ খানিকটা সময় আছে হাতে। একটু জিরোই। ডি গেটটা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন ভদ্রলোক। আর কি ভয়।

হাঁটতে হাঁটতে আবার এলাম লাউঞ্জে। একদিকের একখানা লম্বা কুশন আসন একদম খালি। এক কোণায় তার একখানা খবরের কাগজ। কে ফেলে গিয়েছেন। সেখানেই বসলাম। কাগজখানা তুলে নিলাম। সর্বশেষ সংবাদের

জন্যে সর্বাধিক পিপাসা। অপরিচয়ের সমুদ্র পারাপারে সংবাদপত্র সেতুবন্ধ। তা না পেলে মন উস্‌খুস্‌।

কিন্তু সংবাদের অংশ গেলো কোথায় কাগজখানার? এ যে নিউইয়র্ক টাইমস-এর দুটি অতিরিক্ত ক্রোড়পত্র। যাঁর কাগজ তিনি এ অংশ দুটিতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফেলে গেছেন নিশ্চয়। বোঝা কমিয়েছেন খানিকটা। এদেশে সাধারণত তাই করেন সবাই। বোঝা বয়ে কেউ বড়ো একটা বাড়ি নিয়ে যান না খবরের কাগজ।

ক্রোড়পত্র দুটিই উল্টে-পাল্টে দেখলাম। অনেক পড়বার অনেক জানবার সেখানে। কিন্তু সময় উত্তীর্ণপ্রায়। এবার আমি খুব সতর্ক। কান খাড়া রেখেছি গোড়া থেকে। আর দশ মিনিট বাকি ওয়াশিংটনের প্লেন ছাড়তে। ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে গেলাম। সরাসরি ডি গেটে যেয়ে হাজির।

আর কথার খেলাপ নয়। ঠিক সময়েই প্লেন ছাড়লো। এ বিমান অনেক ছোট। প্যান আমেরিকান এয়ারওয়েজ ইণ্টারন্যাশনাল। আমেরিকান এয়ার লাইনস্‌ ন্যাশনাল। কাজেই তফাং। কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায়, ব্যবস্থাপনায় এও নিখুঁত। কয়েক বছর আগে কুচবিহার গিয়েছিলাম, গৌহাটি গিয়েছিলাম আমাদের দেশী কোম্পানীর ছোট বিমানে। সে অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়লো। তার সঙ্গে এর পার্থক্য আকাশ-পাতাল।

একরকম বৃষ্টি মাথায় করেই যাত্রা, ঝড়বাদলের হুড়োহুড়ির মধ্যেই যাত্রা শেষ হবে বুঝি! ভয় ছিলো। কিন্তু ভয় কাটলো। মেঘের রাজ্য পেরিয়ে আমরা অনেক ওপরে। সেখানে সূর্যের হাসি। আমাদের বিমানের রৌদ্র-স্নান। পাশের কাঁচের জানলা দিয়ে আমার কোলেও একফালি রোদ। বড্ড ভালো লাগছিলো।

চা, না কফি?—জিগ্যেস করলেন এসে এক বিমান-বান্ধবী।

চা-এর কথাটাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো। অনেকক্ষণ চা-পান বন্ধ কি না, তাই হয়-তো। আমার পাশের আসনের মার্কিণ মহিলারও চা-এর অর্ডার।

চা এলো। কোলে কোলে ছোট্ট বালিশ। বালিশের ওপর ছোট ছোট ট্রে। তাতে কারুর চা, কারুর কফি। যার যেমন অর্ডার। সঙ্গে দুরকমের কেক-বিস্কুট।

কফি কাগজের গ্লাসে। তৈরি জিনিষ। চুমুক দিলেই হলো। কিন্তু চা-এর বেলা অন্য ব্যবস্থা কেন? তৈরি করো, তারপর খাও।

সেলুলয়েডের কাপ ডিস চামচ। কাপের গরম জলে সুতো বাঁধা চা-এর প্যাকেট। অদ্ভুত রকমের শক্ত পাতলা কাগজে মোড়া সে প্যাকেট। বেশি লিকার চাইতো, বেশিক্ষণ ভিজিয়ে রাখো। তারপর চামচের ওপর সে প্যাকেট তুলে নিয়ে সঙ্গের লম্বা সুতোয় মুড়িয়ে মুড়িয়ে দাও চাপ। মুখবন্ধ ছোট্ট কাঁচের কৌটোয় ক্রিম। ব্ল্যাক টি যাদের অপছন্দ তাঁদের জন্যে। চা-এর কাপে ঢেলে নিলেই খাসা রঙ্। আর এক প্যাকেটে মাপা চিনি। নিয়ে নাও যেমন দরকার। মিষ্টি যদি নিষ্প্রয়োজন, থাকবে পড়ে, কি ক্ষতি।

এমনি করে চা বানানো দেখা এই প্রথম। বিশেষ লক্ষ্য তাই পাশের ভদ্রমহিলার দিকে। তিনি সাহায্য করতে চাইলেন আমায়।

আমি বল্লাম, ধন্যবাদ, আপনার চা বানানো দেখেই আমি শিখে নিয়েছি।

চা পানে আমি তেমন তৃপ্ত হই নি। কি ভাবে যেন বুঝতে পারলেন ভদ্রমহিলা। বল্লেনও সে কথা। আমার মুখে নিরুত্তর হাসি। সে হাসি স্বীকৃতিরই নামান্তর।

হ্যাঁ, আমাদের চা ভালো লাগে না ভারতীয়দের কাছে। আপনারা চা-এর দেশের লেকে। আপনাদের চা বানানোর রকমই আলাদা।

কিন্তু চা বানানোর রীতি-প্রভেদে স্বাদে এতো পার্থক্য হবে কেন তা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি নি। একেবারে প্রথম শ্রেণীর সেরা দরের চাও বিস্বাদ আমেরিকায়। কি জানি কি এর কারণ। জল?

নামছে বিমান। হ্যাঁ, এক ঘণ্টা হলো বৈ কি! ঠিক এগারোটা পনেরোয় রাজধানীর ভূমিস্পর্শ। যাত্রা শেষ। আমি ওয়াশিংটন ডি সি-তে।

স্টেট ডিপার্টমেণ্টের কেউ না কেউ নিশ্চয়ই থাকবেন এখানে। আমি নিশ্চিত। আমি নিশ্চিন্ত।

নিউইয়র্কে কাউকে না পেয়ে অসুবিধে হয় নি কিছু। আর সেখানে কেউ না থাকলেও শেষ বন্দরে স্টেট ডিপার্টমেণ্টের কোন প্রতিনিধি যে আমাকে রিসিভ করতে উপস্থিত থাকবেন, সে নিশ্চয়তা পেয়েছিলাম কোলকাতার ইউসিস্ বন্ধুদের কাছ থেকে। এই নাকি রীতি। এই নাকি স্বাভাবিক ব্যবস্থা।

কিন্তু কোথায় কে ? কাউকে দেখছি না তো। এ হয়তো নেহাৎই ভুলের গোলমাল। ভাবি আর তাকাই এদিক ওদিক। ইতস্তত ঘোরাঘুরি করলাম একটু। কারুর কোন হদিস না পেয়ে এগিয়ে চলি। পথে পথে পথনির্দেশ। বিমান বন্দরের দোতলায় উঠে গেলাম সিধে। এক এক করে ওয়েটিং রুম, বুকিং অফিস সব পেরিয়ে সোজা গিয়ে উপস্থিত 'ব্যাগেজ ক্লিয়ারেন্স' হল-এ।

ঠিক এসেছি।

এখান থেকে মাল খালাস করে নিয়েই হোটেল গন্তব্য। কিন্তু কোন্ হোটেলে গিয়ে উঠবো আন্দাজে ? সে এক চিন্তার কথা। যাকগে মালপত্রগুলো আগে বার করে নেয়া যাক তো। তারপর দেখা যাবে।

ঐ যে আমার সুটকেশ দুটি। এখানেও আমার আগেই এসে তারা যথাস্থানে হাজির। অনাহত তারা। যন্ত্রের দৌলতে কতো দ্রুত এবং সহজ হয়েছে সমস্ত কাজ। এমন দিন হয়তো আসবে মানুষ যখন শুধু ভাববে, আর সমস্ত কাজ চালাবে যন্ত্র মানুষের সামান্য সহযোগিতায়।

এ সব দেখে শুনে আমার দেশের অবস্থার কথা আপনা থেকেই মনে এলো। আমরাও নিশ্চয় সমানতালে চলবো একদিন। কবে ? কতো দূরে সেদিন ?

আমার ব্যাগেজ টিকিট চাইলেন মালঘরের একজন কর্মী। টিকিটের নম্বর মিলিয়ে আমার সুটকেশ দুটো এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। তারপর কৌতূহলী প্রশ্ন, কোথায় যাবেন আপনি ?

বল্লাম সব খুলে।

তা হলে আপনি একটা হোটেলে গিয়েই উঠুন আগে। স্টেট ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে সেখান থেকেই না হয় যোগাযোগ করবেন ধীরে-সুস্থে।

ভালোই লাগলো ভদ্রলোকের পরামর্শ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার মালপত্র তুলে দিতে গেলেন ট্যাক্সিতে। ট্যাক্সি নয়, লিমোজিন। প্রায় এয়ার পোর্টেই এমনি লিমোজিন থাকে আমেরিকায়। আমাদের দেশের ট্যাক্সির চেয়ে বড়ো। লোক এবং মালপত্র বেশি ধরে লিমোজিনে।

একটু ভেবে নিয়ে আমি বাধা দিলাম ভদ্রলোককে।

দেখুন, প্রথমেই আমার কোন হোটেলে যাওয়া ঠিক হবে না বোধহয়। আমার হোটেল রিজার্ভেশন করা আছে খুব সম্ভব। কাজেই সোজা স্টেট ডিপার্টমেণ্টেই যাবো আমি।

ভদ্রলোকও কি একটু ভাবলেন। তারপর বল্লেন, বেশ, তাই যান। এই বলে আমাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে ড্রাইভারকে বলে দিলেন আমার গন্তব্যের কথা।

অটোমবিলের দেশ আমেরিকা। শত শত গাড়ি বিমান বন্দরের সামনে। নানা রঙের, নানা ধরণের। সব ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে।

এদেশের লোক পুরোনো গাড়ি চড়ে না বুঝি! ঢালু জমিনে সবুজ কচি ছাঁটাই ঘাস। গাড়ির সারিতে কুসুম-হাসির ছায়া। ভারি সুন্দর দেখতে।

তারই পাশ কেটে আমাদের লিমোজিন নগরমুখো। সে লিমোজিনে আরো তিনজন। সে তিনজনের দুজনই মহিলা। আমরা হয়তো প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অপরিচিত। তবু কথার বিনিময়ে পরিচয়-সুখ।

নতুন নতুন দৃশ্যে আমি বিভোর। সব নতুন। মনে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতাকলির প্রতিধ্বনি—এলেম নতুন দেশে।

তারপর?

রাজধানীতে প্রথম দিন

প্রশস্ত রাজপথ। মাঝে মাঝে ছায়াঘন। খানে খানে গাছের সারি যে দুধার জুড়ে! কিন্তু গাছের নিচেও ঝরাপাতা নেইতো! কখন কে এসে কুড়িয়ে নেয়। কী সুন্দর ঝাঁটপাট!

উন্মুক্ত উদার। সূঁচ-কুড়োনো সাচ্ছন্দ্য পথের বুকে। ইচ্ছে করে নেমে পড়ি। হেঁটেই চলে যাই যতো দূর পারি।

হঠাৎ থামলো গাড়ি। বিকল হলো নাকি? কি সর্বনাশ!

না, যাত্রী অবতরণ। দুজন নেমে গেলেন। নারী-পুরুষ। ওঁরা কি স্বামী-স্ত্রী? তাই হবে। আগে বুঝিনি।

এইতো কমার্স বিল্ডিং। এদিকেই গেলেন ওঁরা। মিঃ পল হুকের অফিসওতো এইখানে। অন্তত বাইরেটা দেখা হলো। কী বিরাট বাড়ি! হবে না? গোটা জাতটাই যে মেতে আছে বিরাটের বন্দনায়। ছোটতে বুঝি তৃপ্তি নেই ওদের! আছে। ছোটর মধ্যে বড়োর আবিষ্কারের আনন্দ। পরমাণুর প্রচণ্ডতায় চিত্তবিনোদন!

গাড়িতে তখন ড্রাইভার আর আমরা দুজন। আমি আর এক ভদ্রমহিলা। একটু যেয়েই আমার নামার পালা।

এই যে স্টেট ডিপার্টমেণ্ট।

ড্রাইভার দরজা খুলে দিতেই নামলাম। নেমেই চক্ষুস্থির! এর নাম অফিস? এযে নিজেই এক প্রাসাদপুরী। সামনের সুবিশাল প্রাসাদ রুজভেল্ট নামাংকিত। হালের তৈরি।

গাড়ি ভাড়া কতো?

এক ডলার।

কিন্তু ডলার নেই আমার সঙ্গে। স্টার্লিং দিতে চাইলাম। ড্রাইভার নারাজ। অগত্যা অনুরোধ জানালাম তাকে একটু অপেক্ষা করার জন্যে। আমার কাছে তিনশো ষাট ডলারের সরকারী চেক। তা ভাঙিয়ে ভাড়া না মেটানো পর্যন্ত অস্বস্তি।

ড্রাইভার রাজী তাতে। কিন্তু তবুও একটু কুণ্ঠা। গাড়িতে আর একজন যাত্রী রয়েছেন যে তার। আমার জন্যে সে বেচারার সময় নষ্ট। কিন্তু কি উপায় থাকতে পারে আর?

দুহাতে দুই সুটকেশ। রুজভেল্ট ভবনে ঢুকে গেলাম সরাসরি। শুধু সুটকেশ নয়, তার সঙ্গে আবার দুটো ব্যাগ। এক বৃদ্ধা ছুটে এলেন আমার দিকে। থমকে দাঁড়ালাম। মুখোমুখি হয়ে আমার ব্যাপার শুনেই বৃদ্ধার সে কি লজ্জা! সাদরে তাঁর ডেস্ক-এর কাছে নিয়ে বসতে বল্লেন তিনি। ফোনে কার সঙ্গে যোগাযোগ করতে উদ্যত হলেন। আমি বাধা দিলাম।

বৃদ্ধা চমকিত। আমার চেক ভাঙানোর জরুরী প্রয়োজন— সে কথা বলতেই ক্রেডিট ইউনিয়নের বাড়ির নম্বরটা তিনি লিখে দিলেন একটা স্লিপ টেনে নিয়ে। আমার জিনিষ-পত্রগুলো একটু আড়াল করে রাখার ব্যবস্থা করলেন। শুধু তাই নয়, নিজেও একটা সুটকেশ টেনে নিয়ে আমায় সাহায্য করলেন।

আমি সবে পা বাড়িয়েছি ক্রেডিট ইউনিয়নের দিকে, অমনি দেখি ড্রাইভার এসে উপস্থিত। তারই তাড়নার আশংকায় আমার তাড়া। কিন্তু আসলে ব্যাপার ঘটলো সম্পূর্ণ উল্টো।

ভাড়ার জন্যে অতো ব্যস্ত হবেন না স্যার। আমারই বরং তাড়াতাড়ি। আর একজন যাত্রী রয়েছেন যে গাড়িতে। আমি যাই। আপনি মনে করবেন না কিছু।—ড্রাইভারের সবিনয় নরম অনুনয়।

আমি বিচলিত। আত্মসম্মানের প্রশ্ন। তাই অনুরোধ জানালাম দয়া করে আর সামান্য অপেক্ষা করতে।

রুজভেল্ট ভবনেরই সংলগ্ন বাড়ি ক্রেডিট ইউনিয়ন। ঠিক পিছনে। ছুটে গেলাম সেখানে। ভিড় নেই বেশি। ভিড় জমতে দিলে তো! কাজ চটপট্। আমাদেরই মতো ব্যাংক কাউণ্টার। চেক দিতেই একটা সই চেয়ে নিলেন তরুণী কর্মী। সঙ্গে সঙ্গে একগোছা কড়কড়ে ডলার নোট আমার হাতে। এখুনি গাড়ির ভাড়া মেটাবো। তা ভেবে শান্তি।

মিনিট দু'একের মধ্যেই চেক ভাঙানোর কাজ হাসিল। আমার দেশে তার জন্যে কতো হয়রানি, কতো সময় নষ্ট!

দ্রুত পায়েই ফিরে এলাম আগের জায়গায়। কিন্তু ড্রাইভার কোথায়? গেটে আর সেই লিমোজিন নেই তো! কী লজ্জার কথা! এখন উপায়?

সবই লক্ষ্য করছিলেন রিসেপশনিষ্ট। তিনি তাঁর চেয়ারে বসে। সেই বৃদ্ধা। তাঁর কাছেই ফিরে এলাম।

আপনি বড্ড ভাবছেন যেন!

হ্যাঁ, তাই।—খুলে বল্লাম পুরো ঘটনা। জানতে চাইলাম কি করা যায়।

কোন উপায়ইতো দেখছি না আর। তবে ওজন্যে এতো দুর্ভাবনা অকারণ। আপনি বিদেশী। ড্রাইভার বুঝতে পেরেছে আপনার অসুবিধে। তারও তাড়া। তাই সে চলে গেছে। আপনি ভাববেন না কিছু।

কিন্তু তা কি করে হতে পারে? আমার অসুবিধে ড্রাইভার উপলব্ধি করেছে, ভালো কথা। তার সময়ের মূল্যবোধেও আমি মুগ্ধ। কিন্তু তার পাওনাটা যদি আর কারুর কাছেও রেখে যেতে পারতাম! এই ভেবে একখানি নোট এগিয়ে দিলাম বৃদ্ধার দিকে। হাত সরিয়ে নিলেন তিনি। ঘন ঘন মাথা নেড়ে বল্লেন, না না তা হয় না! সে বেচারা কি আর আসবে এখানে? এক ডলারের জন্যে তিন ডলার খরচ করবে?

মহিলার এ যুক্তি কাটাই তেমন সাধ্যি নেই। চুপ করে গেলাম। তাঁর মাথায় তখন আমার ভাবনা। আমায় আর একখানা চিরকুটে লিখে দিলেন কার ঠিকানা। ফোনে জানিয়ে দিলেন তাঁকে আমার কথা। আমি সেদিকে গেলাম।

রুজভেল্ট ভবনের প্রধান করিডর। দুধারে তার কয়েকটি করে লিফ্ট। লিফ্ট্‌কে এদেশে বলে এলিভেটর। বেশির ভাগ এলিভেটর চালায় মেয়েরা। বিশেষ করে নিগ্রো মেয়েরা।

একের পর এক এলিভেটরের ওঠানামা। স্টেট ডিপার্টমেণ্টের কর্মব্যস্ততার পরিচয়। প্রধান করিডর পেরিয়ে যেতে যেতে দেখছিলাম এসব।

পিছন দিক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গিয়েই বাঁ দিকে স্টেট ডিপার্টমেণ্টের আর এক বিল্ডিং। আর একটি প্রকাণ্ড বাড়ি। গেটের সামনেই এলিভেটর চালিকা তেমনি এক নিগ্রো মেয়ে।

আমি যে ঘরে যাবো, তার নম্বর ছ'শো কতো। কাজেই সে-ঘর ছ তলায়। মোটামুটি এমনি ব্যবস্থা এ-দেশের সর্বত্র।

ছ তলায় উঠে নিগ্রো মেয়ের ডিরেকশন মতো বাঁ হাত ঘুরে যেতেই নির্দিষ্ট ঘর। দরজায় গিয়ে দাঁড়াতেই আসন ছেড়ে উঠে এলেন সেক্রেটারী।

মধ্য বয়স্কা মহিলা। তাঁর অফিসারও তাই। তাঁর আসন আর একটু দূরে। আর একটু ভেতরে।

অভিবাদন বিনিময়ের পর সেক্রেটারী তাঁর অফিসারের কাছে গিয়ে উপস্থিত আমায় নিয়ে। তিনি তখন কাজে নিমগ্ন। হঠাৎ চোখ তুলে চেয়ে আমায় অভ্যর্থনা। কাঁচের মতো স্বচ্ছ সে চোখ। ব্যস্ততার স্পষ্ট ছাপ সেখানে। আমায় কি সাহায্য করতে পারেন তিনি, তা জানতে তাঁর ব্যগ্রতা।

ওঃ, আপনার সমস্ত ব্যবস্থার ভার মিঃ কুকের ওপর। একটু বসুন, আমি এক্ষুণি তাঁর কাছে নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে।—আমায় লেখা মার্কিণ সরকারের আমন্ত্রণলিপি দেখে ভদ্রমহিলার তাড়াহুড়ো।

আমি বল্লাম, আপনি ব্যস্ত হবেন না। মিঃ কুকের রুম নম্বরটা বরং বলে দিন, আমি নিজেই চলে যেতে পারবো সেখানে।

মহিলার তীব্র আপত্তি তাতে।

না না, তা কি হয়? আমি নিজেই সঙ্গে করে নিয়ে যাবো আপনাকে। এ আমার কর্তব্য।

তারপর নানা প্রশ্ন। আমার তরফ থেকে নানা উত্তর।

ভারতকে আমার খুব ভালো লাগে। আজকের ভারত অনেক এগিয়ে গেছে। আরো এগুবে। তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।—কথায় কথায় হঠাৎ যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন ভদ্রমহিলা। তাঁর অপূর্ব দীপ্তি তখন আরো যেন মধুর লাগছিলো। ভারত প্রশংসায় মুখর বলে? হয়তো তাই।

জিগ্যেস করলাম, আমার দেশে গেছেন কখনো?

হ্যাঁ, দুদিনের জন্যে দিল্লীতে ছিলাম একবার। দু'একটা উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ দেখে আগ্রায় গিয়েছিলাম তাজমহল দেখতে। চমৎকার লেগেছে সত্যি!

চিত্তে আমার খুশির দোলা। ভারতের কুৎসা গেয়ে আনন্দ এদের, এইতো সাধারণ ধারণা আমার দেশে।

সে ধারণার কারণ আছে। সে কারণের বীজ বুনেছেন কুখ্যাত মিস্ মেয়ো থেকে স্বরু করে হাল আমলের তরুণ নিগ্রো সাংবাদিক কার্ল টি রোয়ান অবধি নানা লোকে। সুদূর পথ আমার দেশের নর্দমার নোংরা বয়ে তারা নিয়ে গেলেন স্বদেশে। তা নিয়ে ঘাঁটাঘাটি। তাতে কি লাভ হলো কার?

মিস্ মেয়োর 'মাদার ইণ্ডিয়া'র জবাব দিয়েছেন ভারত মায়ের সোনার ছেলে ধনগোপাল, লালা লাজপৎ। জবাব দিয়েছেন আরো অনেকে। সে সব পুরোনো কথা। কিন্তু রোয়ানের জন্যে আমার করুণা। বিশেষ করে সমধর্মী বলে। ধর্মবোধ-হীনের জন্যে করুণাবোধ! কয়েক দিন এদেশ ঘুরে বেড়িয়ে তিনি লিখে ফেললেন বিরাট গ্রন্থ—The Pitiful and the Proud! ভারত-কুৎসার মহাভারত! এ কি সাংবাদিক নিরপেক্ষতা, না কাকবৃত্তি? খারাপ খুঁটে খুঁটে খারাপের দিকেই নজর, ভালো আর চোখে পড়বে কি করে?

ওদের আসা-যাওয়ায় দুদেশের ভালোয় ভালোয় জানাজানি হলো না সেই দুঃখ, অথচ দেশে দেশে মিতালি চাই আমরা। এই বিশ্বমৈত্রীবোধ নতুন নয় কিছু ভারতের কাছে।

"অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।

উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥"—ভারত ঐতিহ্যের এই শিক্ষা। সারা পৃথিবীকে আত্মীয় মনে করি আমরা। কিন্তু নিন্দা-কুৎসা সে পথের বাধা। মিতালি নয়, মন কষাকষিই বাড়ে তাতে। সুখের কথা, ভারত-প্রেমী মানুষেরও অভাব নেই আমেরিকায়।

তাই শ্রদ্ধা জাগলো এ মেয়েটির ভারত প্রশংসায়। কথাটা বলেও ফেল্লাম এক সময়। বল্লাম তখন, তিনি যখন চার তলায় নেমে এসে আমায় পরিচয় করিয়ে দিয়ে গেলেন মিঃ পল কুকের সঙ্গে। বিদায় নেবার আগে আর এক দিন এসে গল্প করার আমন্ত্রণ জানালেন তিনি। তাঁর ভারত দর্শনের গল্প শোনার যে কী ইচ্ছে আমার, সে আগ্রহেরই আভাস দিলাম।

তাহলে আসবেন কিন্তু নিশ্চয় করে আর একদিন।—এক ঝলক হাসি ছড়িয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন মহিলা। তাঁর নাম-ঠিকানা নিই নি সেদিন ভুল করে। স্টেট ডিপার্টমেণ্টে আরো কবার এসেছি নানা কাজে। কিন্তু নাম-না-জানা লোকের খোঁজাখুঁজি কঠিন কাজ। বিশেষ করে এমনি কাজের জায়গায়। তাই আর দেখা-সাক্ষাৎ হয়ে ওঠেনি তাঁর সঙ্গে।

ভদ্রমহিলা বেরিয়ে যেতেই কুকের সঙ্গে আলাপ সুরু। মিঃ পল ক্রুক। প্রথমে নামটা শুনে মনে হয়েছিলো ভারিক্কি গোছের লোক হবেন তিনি। কিন্তু এযে নেহাৎই তরুণ। যাকে বলে টু ইয়ং! বয়সে ত্রিশের বেশি নয় কিছুতেই। অথচ কথাবার্তায় যেমনি সহজ, তেমনি তীক্ষ্ণ।

আজই কি আসার কথা ছিলো আপনার ?—সাদর সম্ভাষণের পর প্রথম প্রশ্ন। সে প্রশ্নে গভীর বিস্ময়, কেমন যেন একটা অনুযোগের স্বর।

হ্যাঁ, ব্যবস্থা মতোইতো আমি এসেছি।

কিন্তু কেউ তো আপনাকে রিসিভ করতে যান নি এয়ারপোর্টে! নিউইয়র্কেও নিশ্চয়ই আমাদের দপ্তরের কারুর সঙ্গে দেখা হয়নি আপনার। আমি অত্যন্ত দুঃখিত মিঃবোস, অত্যন্ত লজ্জিত। কোথাও কোন রকম একটা ভুল হয়ে গিয়ে থাকবে। তাই এ গোলমাল। আমাদের ক্ষমা করবেন তার জন্যে।—বলতে বলতে একবার আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন মিঃ কুক।

এজন্যে আপনি ব্যস্ত হবেন না মোটেই। এ যে একটা ভুলের ব্যাপার তা আমি প্রথম থেকেই ধরে নিয়েছি। আমার একটুও অসুবিধে হয়নি কোথাও। তাছাড়া জানেন তো, a journalist is never lost, আমিও হারাই নি। কাজেই চাপা থাক এ প্রসংগ।—আমার অনুরোধ।

কিন্তু কুক নাছোড়বান্দা। কবে কোন্ প্লেনে আমি কোলকাতা ছেড়েছি, তা টুকে নিয়ে অন্য কথা। ত্রুটি হবে, তার অনুসন্ধান হবে না ? সে কি হয় ?

এবার কাজের কথা।

আমেরিকায় কোথায় কোথায় যাবার ইচ্ছে আপনার ?—রাজধানীর একখানা সুন্দর মানচিত্র আমার হাতে তুলে দিয়ে প্রশ্ন কুকের।

বল্লাম সব এক এক করে। ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক নানা কেন্দ্রের নামোল্লেখ। সবশেষে শেষ ইচ্ছের প্রকাশ। নিগ্রোদের জীবনধারণ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের আগ্রহ। দক্ষিণে যাবার ইচ্ছে আমার। দক্ষিণ মানে দক্ষিণ আমেরিকায় নয়। উত্তর আমেরিকারই দক্ষিণাঞ্চলে। বর্ণ-বিরোধ প্রবল যেখানে। সংখ্যায় নিগ্রোরা বেশি যেখানে।

আমার দক্ষিণে যাওয়ার আপত্তি নেই বোধ হয় আপনাদের ?

না না, কোন কারণই নেই আপত্তির। আমরা সানন্দে তার ব্যবস্থা করে দেবো। তবে কি জানেন, এখনো বর্ণবিদ্বেষের যথেষ্ট গোলমাল রয়েছে দক্ষিণে।

সে জন্যেইতো বেশি করে যেতে চাই সেখানে। —আমি বল্লাম।

আর সে জন্যেই একটু ঝুঁকি নিতে হয় এ ধরণের ব্যবস্থা করতে। তবে বিদেশীদের ওপর কোন হামলা হয় না সাধারণত। আপনার পোষাকই

আপনার বড়ো বাঁচোয়া। আশংকার কোন কারণ নেই আপনার। —আশ্বাস দিলেন মিঃ কুক।

আমি স্মরণ করিয়ে দিলাম তাঁকে কিছু দিন আগের একটি ঘটনার কথা। আমাদের রাষ্ট্রদূত মাননীয় শ্রীমেহতা স্বয়ং অপদস্থ হয়েছিলেন দক্ষিণ সফরে যেয়ে। সে কথা।

সে একটা ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার। আমরা সেজন্যে অত্যন্ত দুঃখিত। —সখেদে গভীর লজ্জা প্রকাশ করলেন কুক।

এও বল্লেন, সর্বজাতির সমন্বয় যে দেশের ভিত্তি এবং আদর্শ, সে দেশে এই বর্ণবিদ্বেষ একটা কলংক। তবে ব্যাপক চেষ্টা চলেছে এ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে। ফলও হয়েছে খানিকটা। উত্তরাংশে বর্ণবৈষম্যের গোঁড়ামি এক রকম নেই বল্লেই চলে। দক্ষিণে এখনো এ বৈষম্য থাকার কারণও রয়েছে কতোগুলো। সে কারণ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক। কতোগুলো যুক্তি দিয়ে আমায় বোঝাবার চেষ্টা।

আমি জিগ্যেস করলাম, সুপ্রীম কোর্টের বর্ণ-বৈষম্য বিরোধী রায়ের পরেও এ সমস্যার তীব্রতা হ্রাস পেলো না, এ কেমন কথা ? সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ আড়াই বছরেরও বেশি পুরোনো। এখনো স্কুল-কলেজে শাদা-কালোর একত্র পঠন-পাঠন ব্যবস্থা কার্যকরী করায় বিলম্ব, এ কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার !

এ ঠিক জোর জবরদস্তির ব্যাপার নয় মিঃ বোস। শুধু আইনের চাপে এর সমাধান সুকঠিন। এ পুরোনো পাপ। প্রতিকারও তাই সময় সাপেক্ষ। এর জন্যে মনের পরিবর্তন আগে প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

বলে কি ? মনের পরিবর্তনের ওপর এতোটা আস্থা এদেশের শাদা লোকের ! আমি তো অবাক ! এ যে গান্ধী-নীতির শক্তির ওপর আস্থা।

নিগ্রোরা শ্বেতাংগ পীড়ন প্রতিরোধ করছে গান্ধীজীর আদর্শে। নিষ্ফল হয় নি তাদের অহিংস লড়াই। সম্পূর্ণ সাফল্যের জন্যে সংগ্রাম চলছে এখন। গান্ধীনীতি ও জংগীনীতির যুদ্ধ। গান্ধীনীতির জয় সম্বন্ধে সুনিশ্চিত নিগ্রোরা। মনের পরিবর্তনের প্রতীক্ষা। সে দিন আর কতোদূর ?

এর পরেই মোড় ঘুরলো আলোচনার।

কোথায় ওঠবার ব্যবস্থা করেছেন ?

থতমত খেলাম প্রশ্ন শুনে। পরে সামলে নিলাম। বল্লাম, এখনো পর্যন্ত

কিছুই ঠিক করিনি তো। তাইতো সোজা চলে এসেছি আপনাদের দপ্তরে। আমার কোন ধারণাই নেই এখানকার হোটেল সম্বন্ধে।

তার জন্যে আর ভাবনা কি? তবে এ ব্যাপারে আমরা কিছু করিনা আগে থেকে। অতিথির ইচ্ছেই শেষ কথা। আপনি যদি চান তো আমরাই সব ব্যবস্থা করে দেবো।

হাতে যেন স্বর্গ পেলাম। বাঁচা গেলো। এঁরা যদি ভার না নিতেন তাহলে আবার ছুটোছুটি। কোথায় হোটেল, কোথায় হোটেল! কী মুস্কিল হতো তা হলে? হোটেল তো পথে পথে। এধার ওধার। দু'চার পা পরে পরেই। কিন্তু কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ, কোন্‌টা হবে মনোমতো জানবো কি করে আগে থেকেই। আর শুধু মনোমতো হলেই হবে না তো, সংগতি মতোও হওয়া চাই।

তাই বল্লাম, হোটেলের ব্যবস্থা আপনাদেরই করে দিতে হবে। মুক্তকণ্ঠেই বল্লাম।

তা বেশ। কিন্তু কী রকম হোটেল পছন্দ আপনার, তা বলুন।—জেনে নিতে চাইলেন মিঃ কুক।

বিশেষ রকম কিছু নয়। তবে অবশ্যই সস্তার মধ্যে ভদ্র হওয়া চাই। এটাচড্‌ বাথরুম একখানা ঘর পেলেই খুশি আমি। বিশেষের মধ্যে চাই একটু নিরিবিলি।

ঠিক আছে। ফরেন লীডারদের থাকার জন্যে হোটেল প্রেসিডেন্সিয়াল-এর সঙ্গে বন্দোবস্ত আমাদের। আমাদের অতিথিদের জন্যে কন্‌সেসন রেট। কাজেই একটু সুবিধায়ই থাকা যায় সেখানে।

কি রকম?—প্রশ্ন করলাম।

এই ধরুন, পাঁচ কি ছ ডলারের মধ্যেই একটা স্যুট পেয়ে যাবেন আপনি।

একটু চিন্তায় পড়লাম কথাটা শুনে। দৈনিক দক্ষিণা বারো ডলার। ঘর ভাড়াতেই যদি ছ ডলার দিন খরচ, তা হলে তো বিপদের কথা। চালাবো কি করে? আচ্ছা দেশ বটে! শুধু মাথা গোঁজবার জন্যেই দৈনিক ত্রিশ টাকা! এও আবার কনসেসন রেট!

আপন মনে বিড় বিড়।

বলতেই বা কি। বলে ফেল্লাম। যদি পরিকল্পনা-কর্তাদের কানে ওঠে। যদি আমার পরবর্তীদের একটু সুবিধে হয়।

নেতৃ-বিনিময় পরিকল্পনায় দৈনিক ব্যয় বরাদ্দের ব্যবস্থাটা বোধ হয় অনেক পুরোনো। কালের পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু এ বরাদ্দের অংকটা হয়তো অপরিবর্তিতই আছে।

কথাটা কুকও স্বীকার করলেন। বল্লেন, সত্যি ওতে আর ভালো মতো চলে না আজকাল। আমাদের অফিসারদের ট্র্যার এলাউয়েন্সও বারো ডলারই ছিলো। কিন্তু অবস্থা বিবেচনায় কংগ্রেস তা বাড়িয়ে দিয়েছে। হয়তো ফরেন লীডারদের গ্র্যান্টটাও সে অনুপাতেই বাড়বে।

তা হলে ভালো হবে।—আমার মন্তব্যে এ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি।

চলুন এবার। আপনাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসি।

চলুন।

আমরা এলাম হোটেল প্রেসিডেন্সিয়ালে। নাইনটিন্থ ষ্ট্রীট, নর্থওয়েষ্ট। বাড়ির নম্বর নাইন হানড্রেড। ওয়াশিংটন ডি সি। এই ঠিকানা।

লাল রঙের নতুন বাড়ি। বেশ বড়োসড়ো। উঁচু দশ-বারো তলা। প্রস্থেও বৃহদায়তন। ঠিক মাঝখানে প্রবেশপথ। সামনের দুপাশে দুফালি খালি জায়গা। ঠিক খালি নয়, সেখানে কুসুম শোভা। নেহাৎই অসময়। এ দেখা হাতে থাক।

অত্যন্ত পুরু কাঁচের প্রকাণ্ড দরজা।

ঢুকেই হোটেলে ম্যানেজারের কাউন্টার। নাম সই দিয়েই আমি ভাড়াটে। কনসেসন রেটে পাঁচ ডলারে একখানি ঘর। শীততাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না চাইতো আরো এক ডলার কম।

শীত তো নয় এখন। এদেশে বসন্ত। বেশ গরম। দুঃসহ নয়। কী দরকার এয়ারকণ্ডিশন রুমের? বাঁচুক এক ডলার।

পাশে দাঁড়িয়ে পোর্টার। ম্যানেজার চাবি দিলেন তার হাতে। সঙ্গে শ্লিপ। ব্যাগেজ উঠলো এলিভেটরে। পোর্টার আমায় নিয়ে উর্ধ্বগমনের অপেক্ষায়।

এবার আপনি নিশ্চিন্ত মিঃ বোস। আজ বিশ্রাম করুন। কাল আবার দেখা হবে। বেলা ন টায়। —বিদায় নেবার আগে পরদিনের প্রথম এনগেজমেন্টের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন মিঃ কুক।

হ্যাঁ, আর একটা কথা। পোর্টারকে কোন টিপস্ দেবেন না এবারের জন্যে। আমিই দিয়েছি।

তার মানে? আপনি দেবেন কেন টিপস্? আপনি এমনিতেই অনেক করলেন আমার জন্যে।

মোটেই অতিরিক্ত কিছু করিনি আমি। আপনার কাছে খুচরো নেই। সে আমার জানা। তাই টিপস্‌টা দিয়ে দিলাম। এর মধ্যে কি আছে? গুডবাই!

কুক বিদায় নিলেন। ঘরে গিয়েও তাঁর কথাই কিছুক্ষণ ধরে ভাবছিলাম। প্রত্যেকটি কথায় তাঁর আন্তরিকতা। কিন্তু ছোট ছোট ঋণ বড়ো বোঝা হয়ে উঠছে যে!

প্রশস্ত সুবিন্যস্ত একটি ঘরে একা আমি। ছ তলায় ঘর। রুম নম্বর ছশো সাত। নিখুঁত পরিপাটি সব ব্যবস্থা।

এখন একটু আরাম চায় দেহ। মুক্তি চায় মন। স্নানান্তে কী প্রশান্তি! এখন আর বাইরে যাওয়া নয়। সঙ্গেইতো আছে কিছু ফল। কিছু সন্দেশ। ফলাহার শেষে সুখশয্যায় কিঞ্চিৎ দিবানিদ্রা। ঠিক ঠিক নিদ্রা নয়, স্বপ্ন ঘুম। চোখের পাতায় প্রজাপতি রঙ-এর স্বপ্নদের সব আনাগোনা। এই শুধু।

বিকেলে যখন বাইরে এলাম সূর্য তখন ডোবে ডোবে। পরনে আমার সাধের ধুতি-পাঞ্জাবী। পায়ে নাগরা। ফুলবাগানের কাছে এসে দাঁড়ালাম খানিক। বেগ্‌নে-নীল হল্‌দে ফুলের ডগায় ডগায় প্রজাপতিরা ঘুর্ ঘুর্। তারই ছায়া পড়ছিলো বুঝি আমার স্বপ্নঘুমে? কী আশ্চর্য!

রাজধানীর পথের পাঁচালী

রাত না দিন? এতো হাসি এতো আলো! আলোর হাসি। হাসির আলো। শুধু রাজধানী নয়, এ যেন রাজরাণী।

সবে এসেছি। আজ আর বেশি ঘোরাঘুরি নয়। একটু বেড়াই।

আমার হোটেলের রাস্তা নাইটিন্থ স্ট্রীট। সে পথেই পদাতিক আমি। সোজা পথের মানুষ। বেশি ঘুরতে গিয়ে পথ হারানোর দুর্নাম নেবো? তা হয় না। আগে পথ চিনি। আগে লোক জানি। তারপর ঘুরবো।

কিন্তু এও তো বেশ দীর্ঘ পথ। অনেক রাস্তাকে ক্রস করে গেছে নাইনটিন্থ স্ট্রীট। আমার হোটেলের দক্ষিণে বামে অনেকগুলো করে রাজপথ। সমান্তরাল তারা। সংখ্যা-নামা নয়, অক্ষর-নামা। আই স্ট্রীট, কে স্ট্রীট, এমনি সব নাম।

ডান হাতে আই স্ট্রীট। তা পেরিয়ে খানিক গিয়েই পেনসিলভেনিয়া এভিন্যু। এ রাস্তার ইজ্জত বেশি। প্রস্থেও প্রকাণ্ড। দৈর্ঘ্যেও বিরাট। হবে না? একটা গোটা রাজ্যের নামে যে এর নামকরণ। ট্রাম চলে এ পথে। ট্রামকে এদেশে বলে স্ট্রীট কার।

এক কাপ কফি খেয়ে পরিতৃপ্তি। অবসাদ মুক্তিও বটে। আমার হোটেলের সামনেই সুন্দর রেস্তোরাঁ। একেবারে মুখোমুখি। আমার ঘর থেকেই দেখছিলাম সেই দুপুরে। দোরবন্ধ দোকান। কিন্তু সন্ধ্যায় আলো ঝল্‌মল্‌। ভেবেছিলাম খুলেছে বুঝি। কিন্তু দোরতো দেখছি তেমনি বন্ধ। থাক। খানিক এসে নয়া রেস্তোরাঁ। সেখানে কফি পেলাম। এক কাপ দশ সেণ্ট। আমাদের হিসেবে প্রায় আট আনা।

পরম আনন্দ পায়ে চলায়। অন্ধকারের ভূত-ছায়া নেই কোথাও। আলোর মেলায় এগিয়ে চলি। অনেক ওপরে রাত্রি-রূপ। সে রাত রমণীয়। তারও ওপরে অনেক দূরে আকাশ-খুশি। সে দিকে তাকাই। বড়ো ভালো লাগে। আর কেবলি ঘুরে ঘুরে কোলকাতার আকাশকে মনে পড়ে।

অনেক দূর এসে গেছি। ফিরবো এবার। ওদিকে ড্রাগ স্টোরে এতো লোক? ওখানে খানাপিনা? নামের সঙ্গে সংগতিহীন। শুধু ওষুধ বিক্রি নয়, ভোজনালয়ও বটে। খেয়েই নেয়া যাক। নৈশাহার শেষ। ভরপেট খানায় প্রায় দু ডলার বিল। টাকার অংকে প্রায় দশ টাকা। অনেক রকম খাবার নিয়েছি। কোনটা খেয়েছি, কোনটা ফেলেছি। সে তুলনায় দু ডলার দাম কি এমন বেশি? দেশটা যে আমেরিকা।

ড্রাগস্টোরের কথা বই পড়ে জানা ছিলো সামান্য। আমেরিকা ফেরত এক বন্ধুর কাছেও শুনেছিলাম তার কিছু বৈচিত্র্যের কথা। ভালো করে এবার একটু দেখেই নি।

এ যেন সত্যি সত্যি এক 'সব পেয়েছির পসরা'। কি নেই এখানে? ওষুধ-পত্র তো বটেই, নিত্য প্রয়োজনীয় প্রায় সব কিছুই পাওয়া যায় ড্রাগস্টোরে। নিজের চোখেই দেখলাম, খাওয়া শেষে এক জোড়া মোজা কিনে নিলেন এক মেমসাহেব। আর এক দিকে একটি ছোট্ট ছেলে বায়না ধরেছে সুন্দর পোষাক পরা পুতুলটি তার চাই-ই চাই। সে পুতুল তার হাতে তুলে দিয়ে তবে বাপের অব্যাহতি। মোটর গাড়ি না পাওয়া গেলেও তার অনেক যন্ত্রপাতিই রয়েছে দেখলাম দোকানে।

স্টোরের মাঝখানে কয়েকটি দ্বীপের মতো। এগুলো সব কাউন্টার। এ ছাড়াও রয়েছে নানা ধরনের সুসজ্জিত সব শো-কেস। এসব শো-কেসকে বলা হয় 'গণ্ডোলা'। অদ্ভুত নাম। ভিনিস নগরীর নৌকোর মতোই দেখতে অনেকটা, তাই বোধ হয় এ নাম। তারই কোথাও চোখে পড়ে খেলার সব সাজ-সরঞ্জাম, আবার আর একদিকে নানা রকমের পারফিউমারী বা স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের পেন-পেন্সিল ইত্যাদি। ছাতা, ঘড়ি, ছোট ছোট ব্যাগ-সুটকেশ সবই রয়েছে সাজানো গোছানো। এক কাউন্টার থেকে প্রেসক্রপশন অনুযায়ী ওষুধ দিচ্ছেন একজন।

খাবার টেবিলে খুব গল্প জমিয়েছে কয়েক জোড়া ছেলে মেয়ে। কিন্তু খাচ্ছেনা তারা তেমন কিছু। কথার মত্ততায় খাওয়ার কথা ভুলেই গেছে হয়তো। আমি ড্রাগস্টোরে ঢুকেই দেখেছি তাদের। বেরিয়ে আসার সময়ও দেখি তেমনি গল্পোন্মাদ তারা। খুব হাসিখুশি।

কোকাকোলার চাহিদা দেখলাম সবচেয়ে বেশি ড্রাগস্টোরে। পাশের বয়স্ক

ভদ্রলোক বল্লেন, কোন এক ড্রাগস্টোরের মালিকই নাকি আবিষ্কারক কোকা-কোলার। খাওয়ার পরেও ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ আলাপ। তিনিই ঘুরে ঘুরে বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দিলেন ড্রাগস্টোরের। বল্লেন, এ অনেকটা ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরেরই ক্ষুদে সংস্করণ।

কিন্তু এমনি স্টোরকে ড্রাগস্টোর বলা ঠিক কি? আমার কাছে কিন্তু এ নাম বড্ড বিভ্রান্তিকর বলেই মনে হয়।—প্রশ্নের সঙ্গে সবিনয়ে নিজের মত প্রকাশ।

এ নামের সঙ্গে তার বর্তমান রূপের সামঞ্জস্য নেই সত্যি কথা। কিন্তু এ অমিলের একটা ইতিহাস আছে।—আমার প্রশ্নের উত্তরে ভদ্রলোক বলে চল্লেন সে ইতিহাস। বলতে বলতে বেরিয়ে এলেন আমায় নিয়ে।

ড্রাগস্টোরের সামনে দাঁড়িয়েই ড্রাগস্টোরের গল্প শুনে চলেছি আমি। স্টোর গেটের দু পাশের গ্লাস কেসে রকমারি আলোর আকর্ষণ। সেখানে জনপ্রিয় লেখকদের নানা বই-এর পকেট সংস্করণ। এক এক গ্রন্থের এক এক খানি নমুনা কপি। নানা ধরণের ম্যাগাজিন। ছোটদের ছবি ও ছবি আঁকার বিচিত্র সম্ভার। বার বার সেদিকে চোখ টানলেও আমার মনে ড্রাগস্টোরের ইতিকথার তোলপাড়।

ভদ্রলোক বলছেন: পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছর আগে ড্রাগস্টোরের এমনি ছড়াছড়ি ছিলো না আমেরিকায়। এখন ছোটবড়ো সব শহরের আনাচে কানাচেই পাবেন ড্রাগস্টোর। কিন্তু আমাদের ছাত্রজীবনে এই রাজধানীতেও ওষুধ কিনতে ছুটোছুটি করতে হতো। তখন সত্যি সত্যি শুধুমাত্র ওষুধেরই দোকান ছিলো ড্রাগস্টোরগুলো। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সুরুতে নতুন নতুন সব বড়ো বড়ো ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী গজিয়ে উঠতে লাগলো সারা দেশে। পুরোনো ড্রাগস্টোরগুলো ক্রমশই ঝিমিয়ে পড়লো। নিরুপায় হয়ে দরকারী সব জিনিষপত্রও রাখতে সুরু করলেন ড্রাগিস্টরা। আশাতীত ফল পাওয়া গেলো তাতে। ক্রমে ক্রমে সোডা ফাউণ্টেন, এমন কি ভোজনালয়েরও ব্যবস্থা হলো ড্রাগস্টোরে। গত কয়েক বছরের মধ্যে ড্রাগস্টোরের জনপ্রিয়তা এমনি বেড়েছে এদেশে যে, তাকে আজ আর শুধু বেচাকেনার দোকান বা ভোজনালয় বলে মনে করলে ভুল করা হবে। ড্রাগস্টোর একালের মধ্যবিত্তদের একধরনের সামাজিক মিলন ক্ষেত্র এবং 'এ নাইস মিটিং প্লেস ফর ইয়ংমেন এণ্ড গার্লস'।

মাকিন সমাজজীবনে ড্রাগস্টোরের গুরুত্ব যে কতোখানি বুঝতে পারা গেলো ভদ্রলোকের কথায়। তাঁকে আমার অজস্র ধন্যবাদ। হাসিমুখে বিদায় নিলেন তিনি। আমায় ড্রাগস্টোরের বিষয়টি বুঝিয়ে দিতে পারায় তাঁর যেন কতো পরিতৃপ্তি!

হোটেলে ফিরতে ফিরতে রাত ন টা। কি করবো এখন? চিঠি লিখি। না থাক। রাজধানীর পরিচয় জেনে নি। তা দরকার। এইতো মিঃ কুকের দেওয়া মানচিত্র, হোটেলের লিটারেচার। আজ রাতে তাই দেখি।

রাজধানী ওয়াশিংটন। ডি সি কথাটি কি আবার তার সঙ্গে? রাজধানীর অংগাভরণ? অনেকটা তাই। একটা স্বতন্ত্র আভিজাত্য চাইতো রাজধানীর! কোন রাজ্যের অংগীভূত নয় এ মহানগরী। সমগ্র দেশের হৃদপিণ্ড ওয়াশিংটন। ফেডারেল ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়া। তারই সংক্ষিপ্তকায় ডি সি। রাজধানীর পরিচয় দিতে তার প্রযুক্তি প্রয়োজন। ওয়াশিংটন নামে একটি পৃথক রাজ্য আছে যে আমেরিকায়।

রাজধানী পত্তনের কাহিনীটিও অপূর্ব। ঠিক যেন একটি রোমান্টিক গল্প।

জন পাচ ছয় ঘোড়-সওয়ার। কদম্-কদম্ ছুটছে ঘোড়া ছুটছেই। ধুলো উড়িয়ে বালি ছড়িয়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে দল বেঁধে সব যায় কোথায়? একই প্রশ্ন গাঁয়ের মানুষের মুখে মুখে। কিন্তু কেউ কিছু জানে না। কে দেবে উত্তর? তাকিয়ে তাকিয়ে ক্লান্ত চোখ। দৃষ্টি ঝিমোয়। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, তারপরে কোন্ সুদূর সীমায় ঘোড়া মিলায়। সব একাকার।

তখনো শীত। একশো ছেষট্টি বছর আগের কথা। ত্রিশে মার্চ। আপাদ-মস্তক ঢাকা সবার শীত-পোষাকে। ভুষো ওভারকোটে সবারই দেহ দ্বিগুণ বপু।

ছুটতে ছুটতে হঠাৎ হাঁক। ঘোড়া থামান অগ্রগামী ঘোড়-সওয়ার। মায়ামুগ্ধ জেনারেল! নামলেন ঘোড়া থেকে। প্রকৃতি মায়াময়ী এখানে। এখানেই প্রেম নিবেদন।

স্থির করলেন জেনারেল ওয়াশিংটন, এই রাজধানী হবার যোগ্য স্থান। অপূর্ব পরিবেশ। পশ্চিমে পটোম্যাক। মনোহারিণী পটোম্যাক তীরে সুরম্য নগরী গড়ে উঠবে। এই হবে দেশের প্রাণ-কেন্দ্র। এ নির্বাচন সায় পায় নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের সংগীদের।

মেজর পিয়ের চার্লস লেঁ ফঁ্যা বিখ্যাত ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার। শুধু তাই নয়, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে জেনারেল ওয়াশিংটনের অতি বিশ্বস্ত সহকারী। তাঁরই ওপর পড়লো নগর পরিকল্পনার ভার।

রাজধানী সাজাবার জন্যে প্রেসিডেন্টেরও সে যে কি চিন্তা! কতো প্রস্তাব, কতো সুপারিশ! মাঝে মাঝে এক একটি গোলাকার পার্ক। অনেকগুলো করে রাজপথ বুকে জড়ানো। বহু সন্তানের জননী যেন এক একটি। ভারি সুন্দর দেখতে। প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটনের ইচ্ছেতেই রাজধানীর এই রূপসজ্জা। প্রথম যুগের প্রধান প্রধান অনেক সরকারী ভবনও তাঁরই পরিকল্পনায় তৈরি।

কংগ্রেসের অনুমোদন নিয়ে আড়াই বছরের মধ্যেই ভিত্তি স্থাপন হয় রাজধানীর। তবে শহর গড়ে উঠে সরকারী কাজ সুরু হতে আরো সাত বছর। কিন্তু হাল-ফ্যাশনের আধুনিক রাজধানী সে দিনের। তার রূপায়ণ সুরু সিকি শতাব্দী আগে থেকে।

প্রায় সত্তর বর্গমাইল জুড়ে আজকের ওয়াশিংটন। ছায়া-সুশীতল পার্ক-স্কোয়ার এদিক সেদিক। প্রাকৃতিক পরিবেশের পূর্বস্মৃতি এখানে ওখানে। কতো প্রাসাদ, কতো ভবন। অফিস-কাছারী, সংঘ-সংস্থা লেখাজোখাহীন। লোক-সংখ্যা বেড়ে বেড়ে এখন তেরো লক্ষ প্রায়। বিগত যুদ্ধকালের প্রায় দ্বিগুণ। পৃথিবীর আন্তর্জাতিক নগরীসমূহের অন্যতমা আজ ওয়াশিংটন। অনন্যা সে।

আবহাওয়ার কিন্তু বেশ খানিকটা মিল কোলকাতার সঙ্গে। কোলকাতার আগষ্টেরই গরম এখানে আগষ্টের শেষ সপ্তাহে। পাতলা ধুতি পাঞ্জাবীর সুখ মোলায়েম। তাই নামিয়ে, পরে বেড়িয়ে কতো আরাম! কিন্তু 'সাত সমুদ্র তেরো নদী' পেরিয়ে এসেও সেই একই রকমের জলবায়ু, সে কেমন?

নজর পড়লো বুক শেলফ-এর দিকে। কাল সকালে বই সাজাবো সেখানে। নিচের তাকে বড়ো বড়ো তিন তিনখানা কেতাব কিসের? খুবই কৌতূহল। দেখাই যাক। একখানার শক্ত বাঁধাই। আর দুখানির কাগজ মলাট।

বাঁধানো বইখানাই প্রথমে তুলে নিলাম। ও, এ যে একখানি বাইবেল? বাইবেল মানেই তো বই। অনেক বইয়ের সংগ্রহ সংকলন। ধর্মগ্রন্থ। পৃথিবীর মানুষকে ধর্ম-সজাগ রাখার জন্যে ধর্মগ্রন্থের এমনি ছড়াছড়ি। টাল টাল সদুপদেশ। কিন্তু কোথায় ধর্ম? কে কার উপদেশের পরোয়া করে আজ? এমনি যুগ।

মনে পড়ে ইস্রেলীদের ইতিহাস-কথা। বাইবেলের অনেক বই-ই তা নিয়ে লেখা। মিশরীদের সঙ্গে তাদের বিরোধের কতো কাহিনী সেখানে। আজো হয় নি সে বিরোধের অবসান। আজ তা আরো তীব্র, আরো ভয়ংকর। সে তীব্রতায় আজ সারা দুনিয়া চঞ্চল। চমকিত। কিন্তু ইন্ধনের যোগানদার কারা তাতে? বাইবেল-অনুরক্ত খৃষ্টভক্ত পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠী। মনে পড়ে ইহুদীদের ধর্মবিধি প্রণেতা মহামানব মুসাকে। তাঁর শিশু-জীবনের অপূর্ব কাহিনী। সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার কথা। শিশু মুসাকে রক্ষা করেছিলেন মিশরের ফারাও কন্যা তাঁর পিতার ঘোষিত মৃত্যু-নির্দেশ থেকে। কিন্তু আজ পৃথিবীর সাধারণ মানুষকে অপমৃত্যুর আতংক থেকে কে রক্ষা করবে, কোন্ সে রাজকন্যা? আমার ঘরে সাজানো বাইবেল দেখে সে প্রশ্নে মন উত্তাল। ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা প্রচার। মুসার আজীবন প্রয়াস। একশো বিশ বছরের দীর্ঘ সে সাধনা। সে সাধনা ব্যর্থতার পথে। নরহত্যায় নিষেধাজ্ঞা। দশ আজ্ঞার সেরা নির্দেশ। সেই বিধির বিধান অমান্যে ইস্রেলীদের উন্মত্ততা কেন? কোথা থেকে আসে এর প্রেরণা? প্রভু যীশুর জীবনেও মহাত্মা মুসার কতো প্রভাব! তাঁরও বাণী, পৃথিবীর মানুষ ভাই ভাই। কিন্তু আমরা কতোটুকু কথা শুনি তাঁর? আমরা পৃথিবীর এ ঘরে ও ঘরে ছুরি শানাই। তলোয়ায় তুলে দিই যার হাতে নাই। বাইবেল আমার মাথায় থাক।

আরো বড়ো বই দুখানা টেলিফোন ডাইরেক্টরী! হাতে তুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে বই দেখি কি সাধ্যি। এক এক খণ্ড এমনি বিরাট, তার এমনি ওজন। আমাদের ভাবনা-সীমার বাইরে পুরোপুরি। মহাভারতকে হার মানায়। পৃষ্ঠা উল্টে আরো চমৎকার! এতো ছোট টাইপও আছে নাকি? নিখুঁত নির্ভুল ছাপা। কিন্তু বেশিক্ষণ ধরে চোখ বুলোই সে দুঃসাধ্য। সে শক্তি আর নেই চোখের। চোখ খারাপ। অসংখ্য নামের নীরব মাতামাতি। নীরবই থাক তা বইয়ের পাতায়। আমি সরে পড়ি।

এখন শোবার সময়। অনেক রাত। শুয়েই পড়ি। কিন্তু দোর বন্ধ করার কি উপায়? নেই খিল, নেই সিটকিনি। এমনি থাকবে? দোর খোলা ঘরে ঘুমুই সে সাহস নেই। আচ্ছা ফোন করে দেখি হোটেল ম্যানেজারকে।

ম্যানেজার জানালেন, ও দরজা অটোমেটিক। চেপে দিলেই বন্ধ। ভেতর থেকে খুলতে নির্ঝঞ্ঝাট। বাইরে থেকে ভেতরে ঢুকতে চাবি চাই।

বুঝে নিলাম। মিলিয়ে নিলাম বিধিব্যবস্থা। সহজ সাবধানী কলাকৌশল। যন্ত্রের জাদু এ দেশের যন্ত্রতন্ত্র। কিন্তু এ অটোমেটিকেরও বিপদ আছে। ঠেকে শেখার অভিজ্ঞতা আমার। ভুলের মাশুল দৌড়ঝাঁপ দুশ্চিন্তা। ঘরে চাবি রেখে বাইরে বেরিয়ে গেছি একদিন। দোর তো আপনা থেকেই বন্ধ। ফিরে এসে সে কি যন্ত্রণা! ঘর খুলি কি করে? আবার ম্যানেজারের শরণাপন্ন হয়ে মুস্কিল আসান।

শেষ রাতে আবার শীত লাগবে না তো! কি জানি বলা যায় না। শুধু স্লিপিং স্যুটে ভরসা নেই। বিদেশ বিভুঁইয়ে বিপাক ডেকে ফ্যাসাদে পড়বো? সুটকেশ থেকে চাদরটা তাই নামিয়েই নি।

ঘরের এক কোণায় মাল-কুঠুরি। সবুজ নরম কার্পেট-মোড়া মেঝেয় বেশ একটু হাঁটাহাঁটি। বিদ্যাসাগরী চটির তলার নীরব তাল।

আর দেরি নয়। সুবিস্তৃত সুখশয্যায় শয়ন-লোভ। চাদর জড়িয়ে এবার তা হলে সটান শুই। বড্ড একা একা। টেলিফোনটা সংগী বটে। একবার যদি বেজে ওঠে মন্দ নয়। কারুর সঙ্গে তবু একটু কথা কয়ে আনন্দ পাই।

বাতি নেভানো ঘর। তবু সেখানে আলো ঝিকমিক! দূরের আলোর ঝলকানি। উল্টোদিকের সামনের বাড়িটায় লেবোরেটারি বুঝি? সে বাড়ির সাত তলায় সাত রঙ-এর আলোর খেলা। তারই মিহি-মহিমা আমার ঘরে। দেয়ালে টাঙানো যোশেমাইট ভ্যালির দৃশ্যপটে লাল-নীলাভা। সে দিকে তাকাই। পাতলা আলোয় প্রকৃতি মধুর। ধূসর পাহাড়ের পাদমূলে ঘন সবুজ। দূর ওপরে আকাশ উদার। সে নীল নিরুদ্দেশে কখন যেন মন উধাও।

সকালে যখন ঘুম ভাঙলো বাইরে তখন স্নিগ্ধ রোদ। আমার জানালা সূর্যমুখী। চোখ খুলেই রোদ-চমক।

ঘড়ি বিশ্বস্ত। মনিব খুশি। দুঘণ্টা এখনো সময় হাতে। কাজও অবশ্য অনেক। কাজ জমালেই কাজ বাড়ে। কাল যে কিছুই হয়নি করা। সবই ফেলে রাখা আজকের জন্যে। তার শাস্তি।

আগে বই গুছোই। কীই-বা এমন বই। গীতা আর গীতাঞ্জলি, আমাদের সংবিধান, ইণ্ডিয়া টুডে, আমার লেখা শতাব্দীর-সূর্য আর নিউ ইণ্ডিয়া স্পীকস্—অন্যান্য আরো দু তিনখানা। হ্যাঁ লুই ফিসারের গান্ধী বইখানাও সঙ্গে আমার। গান্ধী-ভক্ত লুই ফিসারের নেহরু-বিরূপতা কেন? কারণ

যাচাইয়ের ইচ্ছে ছিলো সাক্ষাৎ আলাপে। সুযোগ হয় নি। নির্বাচনী ঘূর্ণিপাকে তিনি চঞ্চল। আমিও অস্থির। আজ এখানে, কাল সেখানে। শেষ অবধি বাধা ঘটেছে তাই যোগাযোগে।

এবার টেবিল সাজাই। আমার সব ফাইল-পত্র। গান্ধীজীর ছবি। একখানা পরিবারিক ফটো। তারপরে দেরাজে পোষাক-পরিচ্ছদ সব গুছিয়ে রেখে এবারের মতো নিষ্কৃতি।

নাইনলের পর্দা ঢাকা টাবে শাওয়ার বাথ। দিনে তিন পিস্ হোটেল-সাবান। নিত্য-ধোয়া চার তোয়ালে রকম রকম। পরিচ্ছন্নতায় মন ধব্‌ধব্‌।

সাজগোজ করে সকালে যখন নিচে নেমে এলাম লাউঞ্জে তখন বেশ ভিড়। হাতে হাতে খবরের কাগজ। বেরুবার মুখে ক্ষণিক বিরাম। পারস্পরিক আলাপ পরিচয়। আমার সময় নেই যে আমি বসি। ডেস্ক থেকে 'ওয়াশিংটন পোষ্ট' কিনে নি একখানা। দাম পাঁচ সেণ্ট। সেখান থেকে সোজা রেস্তোরাঁমুখো। আমাদের হোটেলের সামনের রেস্তোরাঁয়। এখনো দোর বন্ধ। কিন্তু এবার আর ভুল হবার নয়। অনেক দোকান রেস্তোরাঁই দরজা-বন্ধ এমনি। আসলে বন্ধ নয়। অনেক লোককেই ঢুকতে দেখেছি। আমিও ঢুকে যাই।

আমার দিকে অনেক দৃষ্টি। বাঙালী পোষাক অভিনব যে এদেশে!

ফলের রসের প্রাচুর্য আমেরিকায়। দেশ থেকেই সে কথা জানা। প্রায় সবারই সামনে ফলের রস। রসপানেই রসস্থ হই আগে। পাইন এ্যাপ্‌ল জুস্ এক গ্লাস। অতি উপাদেয়। তারপর কফি-অমলেট-টোষ্ট। সব ঝট্‌পট্। মেশিনে টোষ্ট তৈরি। সুন্দর ব্যবস্থা। ঠিক এক মিনিট। মেশিনের নামই যে টোস্ট মাষ্টার। হবে না তাড়াতাড়ি!

বিল এলো। এক গ্লাস আনারসের রস, দাম মাত্র কুড়ি সেণ্ট। এ কিন্তু আমাদের দেশের তুলনায় সস্তা। ষাট সেণ্টে মোটামুটি বেশ ব্রেকফাষ্ট! উপরি খরচ দশ সেণ্ট টিপস্। যে সুন্দরী অমন সুন্দর করে পরিবেষণ করলে তাকে বখশিস্ না দিলে চলে!

ঘর্ ঘর্ ঘরাং। বিল পেমেণ্টের রসিদ আসে মেশিন থেকে। তাই নিয়ে বেরিয়ে আসি।

নটায় এনগেজমেণ্ট। মিঃ কুকের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা। আবার সেই

স্টেট ডিপার্টমেণ্ট। মনের আয়নায় আগের দিনের ছায়ামিছিল। পররাষ্ট্র দপ্তরের ছবি কল্পনা।

দূর নয় খুব! হেঁটেই যাওয়া চলে। কাল এসেছি যে পথে। গত সন্ধ্যায় একা হেঁটেছি যে পথে। আর একটু গিয়ে ডান দিকে ঘুরেই মাত্র দু ব্লক। তার অদূরেই রুজভেল্ট ভবন। পর পর এক থেকে আর এক পথের দূরত্বকে 'ব্লক' বলেন ওঁরা। পায় চলতে সাধারণত দু'তিন মিনিট। প্রায় গায়ে গায়ে সব লাগালাগি।

থাক এ বর্ণনা। ঠিকই এয়েছি। কাঁটায় কাঁটায় ন টা এখন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ধন্যবাদ জানালেন কুক।

বসুন। আপনার কথাই হচ্ছিলো।

কার সঙ্গে?

টেলিফোনে মিঃ লিণ্ডের সঙ্গে।

কে তিনি?

তাঁরই ওপর আপনার সব ব্যবস্থাপনার ভার। গভর্ণমেণ্টাল এ্যাফেয়ার্স ইন্সটিট্যুটের একজন অফিসার তিনি। ভারি চমৎকার লোক।

কুকের কথায় মন খুশি। নির্ভাবনা। ভালো লোকের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ পেলে আনন্দ না হয় কার? গভর্ণমেণ্টাল এ্যাফেয়ার্স ইন্সটিট্যুট সম্বন্ধে জানতে চাইলাম।

সরকার অনুমোদিত এ একটি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান। এ ধরণের আরো কয়টি সংস্থা রয়েছে এদেশে। আমন্ত্রিত সরকারী অতিথিদের দায়িত্ব নেন এঁরা। এঁদের মাধ্যমেই অতিথিদের প্রাপ্য লেনদেন।

বেশ সুব্যবস্থা। পররাষ্ট্র দপ্তর ডলার দিয়েই মোটামুটি খালাস। খুঁটিনাটি অন্য সব ব্যবস্থা আর কেউ করবে, সেই তো ভালো।

কবে যেতে হবে মিঃ লিণ্ডের কাছে? —প্রশ্ন করলাম।

আজই।

কখন?

সাড়ে দশটায়। এখান থেকেই সোজা চলে যাবেন।

এখান থেকে কতোদূর তাঁর অফিস?

সে অনেকটা পথ। প্রায় আধ ঘণ্টা লাগবে ক্যাবে। এখনো সময় আছে।

আমিই তুলে দেবো আপনাকে গাড়িতে। আপনি নতুন।—অভয় দিলেন কুক। ইনষ্টিট্যুটের ঠিকানা দিলেন ১৭২৬ ম্যাসাচুসেটস্ এভিন্যু, এন ডব্লিউ, ওয়াশিংটন-৬, ডি সি।

আরো খানিকক্ষণ ধরে আলাপ দুজনে। এ-কথা সে-কথা। তারপর উঠলাম দুজনেই। কুক তার নাম ঠিকানাও দিলেন লিখে সরকারী সীলাংকিত একখানি কার্ডে। নামতে নামতে বল্লেন, যখনই মনে হবে আমি কোন কাজে আসতে পারি আপনার, জানাবেন আমায়। ফোন করবেন বা চিঠি লিখবেন আর নয়তো চলেই আসবেন সরাসরি।

দরকার হলে নিশ্চয়ই তা করবো।—উত্তর দিলাম। এক ফাঁকে পুরো নাম ঠিকানাটা দেখে নিলাম একবার। পল এ কুক, ডিপার্টমেণ্ট অব স্টেট। ২১৪৫ 'সি' স্ট্রীট, নর্থ-ওয়েষ্ট, ওয়াশিংটন ডি, সি। ফোন নম্বর—রিপাব্লিক ৭-৫৬০০, এক্সটেনশন ৫৪৪২। এ থেকেই অফিসের বিরাটত্ব মালুম।

আমরা নিচে রাজপথে। দাঁড়িয়ে একটা শিস্ দিতেই একখানি ক্যাব ঘুরে এসে থামলো সামনে। ট্যাক্সি ট্যাক্সি করে ডাক চিৎকারের বালাই নেই। গাড়ি হাজির। এই তো ভালো।

বাই বাই।

বাই বাই।

বিদায় নমস্কার বিনিময়। কুক বলে দিলেন ড্রাইভারকে আমায় গভর্ণমেণ্টাল এ্যাফেয়ার্স ইন্সটিট্যুটে পৌছে দেবার কথা।

অবিলম্বে গাড়ি দে-ছুট। নতুন নতুন পথে চলি। নানা দৃশ্যের ক্ষণদর্শন। দেখার নেশা বাড়ে তাতে। দু'দুটো গোলপার্ক পেরুই পরপর। আহা কি মনোরম!

এখানে একটু থামলে হতো। ভারি ভালো লাগছে। ওয়াশিংটন ডি সি'র বোধহয় সবচেয়ে বড়ো রাজপথ কনেটিকাট এভিন্যু। এ রাজপথও যে এক রাজ্যের নামে। তাই এতো বড়ো। তারই বুকের ওপর কী সুন্দর গোল-পার্ক! বড়ো বড়ো গাছের তলায় সাজানো বেঞ্চি। মাঝখানে মস্ত বড়ো ফোয়ারা ঘিরে মূর্তিকলা। কোন বেঞ্চিতে বুড়ো-বুড়ি। কোথাও কোথাও তরুণ-তরুণী জোড়ায় জোড়ায়। মন দেয়া-নেয়ার খাসা পরিবেশ। ফেলে-আসা জীবনের পাতা ওল্টাও, তাও চলে। কিংবা বসে বসে বই পড়ো। ছবি আঁকো।

অনেক পথের মিলন-কেন্দ্র এ পার্ক। পাঁচ পথের মোড়। আমাদের কোলকাতার শ্যামবাজার মোড়ের বৃহত্তর শোভন সংস্করণ আর কি!

কি এর নাম?—জিগ্যেস করলাম।

ডু পন্ট সার্কেল।

একি সেই ই আই ডু পন্টের নামে এ পার্ক, যিনি প্রেসিডেণ্ট জেফারসনের অনুমতি নিয়ে প্রথম বারুদের কারখানা স্থাপন করেছিলেন আমেরিকায়?

না, তা নয়। আগে এর নাম ছিলো প্যাসিফিক সার্কেল। নৌ-সেনানী স্যামুয়েল ডু পন্টের মূর্তি প্রতিষ্ঠার পর ষাট পঁয়ষট্টি বছর আগে এর নাম বদল। —উত্তর এলো ড্রাইভারের কাছ থেকে।

ও তাই! আর কতোদূর গভর্ণমেণ্টাল এ্যাফেয়ার্স ইন্সটিট্যুট এখান থেকে?

এই তো এসে গেলাম প্রায়। ম্যাস এভিন্যুতে পড়লাম এবার। এ পাশে নিউহ্যাম্পশায়ার এভিন্যু, এ ধারে নাইন্‌টিন্থ স্ট্রীট আর ওদিকে পি স্ট্রীট।

বেশ খাসা এ পথের পাঁচালী!

আপন বাহিরে মেল চোখ

মিনিট কয়েক আগেই এসে গেছি। স-টিপস্ এক ডলারে ড্রাইভার বিদায়। পথে পথে সামান্য আলাপ। তাতেই তার পরিষ্কার পরিচয়। নিজের দেশকে জানে সে। ভালো করেই জানে।

আর আমরা? আমরা যে যতো বিদেশ এক্সপার্ট তাঁর ততো শিক্ষার বড়াই। স্বদেশকে ভালো করে জেনে বিদেশকে জানি, সে ভালো কথা।- তাই কাজের কথা। দেশের মাটি দেশের মানুষকে উপেক্ষা করে বাইরের জ্ঞানমোহ শিক্ষার বঞ্চনা। নিজের মাকে না জেনে পরের মাকে বুঝতে যাওয়ার বিড়ম্বনার মতো।

ম্যাসাচুসেটস্ এভিন্যু। নিরিবিলি শান্ত বনেদী এলাকা। একটি স্কুল বাড়ি ছাড়িয়ে গিয়েই গভর্ণমেণ্টাল এফেয়ার্স ইন্সটিট্যুট। খুব বড়ো বাড়ি নয়। মাঝারি। আরো কয়েকটি অফিস সে বাড়িতে। ইন্সটিট্যুটের দিকে তীরাংকিত পথ-নির্দেশ। এক তলায়। আমার মতো বিদেশী লোকের পক্ষে সন্ধান সহজ।

দোর ঠেলে ঘরে ঢুকতেই এক গাল মিষ্টি হাসি।

গুড মর্ণিং।

গুড মর্ণিং।

সম্ভাষণ। প্রতি-সম্ভাষণ। মেয়েটির চোখের তারায় বিদ্যুৎ লহরী। অপরূপ। শুধু সুন্দরী নয়, অদ্ভুত কর্মী। একাধারে রিসেপ্শনিষ্ট, টেলিফোন অপারেটর, টাইপিষ্ট। এতো কাজেও সর্বক্ষণ খুশি-খুশি।

আমার আগমনবার্তায় মিঃ লিণ্ডের তাড়া। ফোনে খবর পেয়ে আমায় একটু বসতে অনুরোধ। কার সঙ্গে তখন কথায় ব্যস্ত তিনি। মেয়েটি জানালেন।

উড ইউ প্লিজ লাইক টু হ্যাভ সাম ড্রিংক?

প্রচুর ধন্যবাদ জানিয়ে শুধু এক কাপ চা চাইলাম উত্তরে।

তক্ষুণি উঠে গেলেন তরুণী পাশের ছোট ঘরে। তাঁর চলার ভংগিটিও চমৎকার। শিল্পী-কুশল।

রিসেপ্‌শন রুমে আমি একা খানিকক্ষণ। চারদিকে তাকিয়ে চোখের তৃপ্তি। ভারি সুন্দর শিল্পবোধের পরিচয় গৃহসজ্জায়। পবিত্র পরিচ্ছন্নতা। আমাদের এক এক অফিসের চেহারা মনে পড়লে গা ঘিন্ ঘিন্। পরিবেশ যে কাজের সহায়ক সে বোধই এখনো হয়নি আমাদের।

সামনের দেয়ালে দুখানা অপূর্ব ছবি। জাপানী শিল্পীর আঁকা। টেবিলে সাজানো কিছু ফাইলপত্র, টাইপরাইটিং মেশিন, আরো কি কি। তারই এক পাশে কয়েক দেশের কয়েক রকমের ছোট ছোট পুতুল।

উঠে দেখতে গেলাম। আগ্রহ স্বাভাবিক। কোন্ কোন্ দেশের পুতুল দেখি একটু। এইতো চীনা পুতুল। এগুলো আলাস্কার। এদিকে রেড ইণ্ডিয়ানদেরও রয়েছে কয়টি। আমাদের দেশের পুতুলও আছে নাকি? না, নেই তো! থাকলে কতো আনন্দ হতো?

এই যে আপনার চা।

ধন্যবাদ।

পুতুল দেখছিলেন বুঝি?

হ্যাঁ।

কেমন লাগলো আপনার?

খুবই ভালো। কিন্তু আমার দেশের পুতুলও খুব বিখ্যাত। খুবই সুন্দর। তা নেই আপনার টেবিলে।—এই বলে আমাদের কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের পরিচয় দিলাম। বল্লাম বাঁকুড়ার কাঠের পুতুলের কথা। কথায় যতোটুকু বোঝানো সম্ভব ততোটুকু বোঝালাম।

এ আমার একটা 'হবি'। বাড়িতে এমনি আমার অনেক পুতুল। নিশ্চয়ই আপনাদের দেশের পুতুল সংগ্রহের চেষ্টা করবো।

এ কথার জবাব না দিয়ে পারি? চা খেতে খেতে বল্লাম—শুধু চেষ্টা নয়, এমনি সংগ্রহে কৃষ্ণনগরের পুতুল অপরিহার্য। তা না হলে তার অংগহানি। সুযোগ পেলে আমিই বরং উপহার পাঠাবো।

অশেষ ধন্যবাদ।—অগ্রিম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ তরুণীর তরফ থেকে।

একজন জাপানী ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন লিণ্ডের ঘর থেকে। আমার

মতোই হয়তো একজন। তিনি চলে গেলেন। আমারও চা-পান শেষ। এ চা-তো অনেক ভালো! অথচ রকম একই। সেই স্থতোয় বাঁধা প্যাকেটের চা।

আস্থন, আস্থন মিঃ বোস। আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হলো। এ জন্যে দুঃখিত। মার্জনা চাই।—এই বলে করমর্দন। তারপর এক রকম টেনেই নিয়ে গেলেন লিণ্ডে তাঁর নিজের ঘরে। যেন কতোকালের পরিচয়। অথচ মুহূর্ত আগেও অজানা।

ধীর-স্থির লোক মিঃ লিণ্ডে। পুরো নাম আর্নষ্ট লিণ্ডে। জার্মাণ-আমেরিকান। চেহারা দেখেই মালুম অনেকটা। আমারই বয়সী। দু'এক বছরের বড়োও হতে পারেন। বয়সের সান্নিধ্যের জন্যে বন্ধুত্ব গভীর? তাও হতে পারে। বাস্তবিকই প্রথম দিন থেকেই ভদ্রলোককে অত্যন্ত ভালো লেগেছে আমার। সে ভালোলাগা শেষদিন অবধি। তাঁর ও তাঁর অফিসের কাজের শৃঙ্খলায় আমি মুগ্ধ। আমার তিন মাসের নানা অভিজ্ঞতা বর্ণনায় বার বার আসবে সে কথা। তাই সে আলোচনা এখন নয় আর।

রাস্তার দিকেই ঘর লিণ্ডের। সামনে একফালি ফালতু জমি। কচি কচি ঘাস সেখানে। নব দুর্বাদলঘন। শ্যাম-সবুজের সমারোহ। মেশিনের ঘূর্ণী জলে অবিরাম তৃণস্নান। এ সবই চোখে পড়েছিলো এ বাড়ির প্রবেশ পথে। এ ঘরে বসেও তাই দেখেছি। তবে এ দেখা স্বপ্নময়। সমুখ জান্‌লায় পর্দাজাল। তাই বাইরেকার আব্‌ছা রূপ। বেশ কেমন একটা মায়া ছড়ানো ঘরজুড়ে!

এক পাশের দেয়ালে মহামতি লিংকনের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। আর এক পাশে তাঁরই আমেরিকার বিরাট এক মানচিত্র। লোক কল্যাণকামী লিংকন, মানবদরদী লিংকন। তাঁর স্বপ্ন, তাঁর আদর্শকে রূপদানে এদেশের গৌরব। সে কাজে কতোটা আন্তরিক আজকের আমেরিকা? সামরিক চুক্তিতে নয়, শান্তির ভিত্তিতেই তা সম্ভব।

আপনি কোন্ কোন্ জায়গায় যেতে চান মিঃ বোস?—মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন মিঃ লিণ্ডের।

আমারও মুখে নামোল্লেখ নানা শহরের! তার কতোগুলোর ঐতিহাসিক খ্যাতি। কোন কোনটির পরিচয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে। আবার কোনটার হয়তো বা দৃশ্যবাহার।

হ্যাঁ, পাশের দেশ কানাডা। তা দেখারও খুবই ইচ্ছে।—বল্লাম মিঃ লিণ্ডেকে।

তার আর কি অসুবিধে? নায়গ্রা যখন দেখবেনই কানাডা তখন হাতের মুঠোয়। এপারে আমেরিকা ওপারে কানাডা। নায়গ্রা জলপ্রপাতের দুই রূপ—আমেরিকান ও কানাডিয়ান। একখানি যষ্টি সাহায্যে ম্যাপ দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন মিঃ লিণ্ডে। আমার দেওয়া সব জায়গার নামগুলো টুকে টুকে রাখলেন। তারপর একখানি টাইপ করা কাগজ এগিয়ে দিলেন আমার দিকে।

দেখুন তো সব ঠিক আছে কিনা!

ওমা, এযে আমায় নিয়েই কথার মালা—আমার পরিচয়। কি দরকার এর?

দরকার আছে বৈকি। কতো জায়গায় যাবেন আপনি, তাঁদের জানাতে হবে না আপনার কথা?

তার জন্যে এতো দীর্ঘ তালিকা নিষ্প্রয়োজন। বাড়তি কথা বাদ দেয়াই ভালো।—সে তালিকা থেকে কেটে দিলাম কিছু কিছু। লিণ্ডে খুশি কি অখুশি বুঝা কঠিন। তিনি গম্ভীর। কি যেন ভাবছিলেন।

হ্যাঁ, আর একটা কথা। ওয়াশিংটনে কতোদিন থাকতে চান আপনি?

তা যতোদিন দরকার। এখান থেকেই যখন ঠিক হবে সব, তখন এখানে কিছু বেশি দিন কাটাতে হবেই।

ঠিকই বলেছেন। আর আমেরিকার হালচাল সম্বন্ধে রপ্ত হতে ওয়াশিংটনই ঠিক জায়গা। হপ্তা দুই আপনার লাগবে এখানে।

বেশ।

ইণ্টারন্যাশনাল সেণ্টার। ওয়াশিংটনের একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান। তার সঙ্গে যোগাযোগে সম্ভবত উপকার হবে আপনার। নবাগত বিদেশীদের খুবই সহায়ক এ সংস্থা।

কোথায় এই ওয়াশিংটন ইণ্টারন্যাশনাল সেণ্টার? কি তার কাজ?—জিগ্যেস করলাম।

এখান থেকে খুবই কাছে। লোক বিনিময় ব্যবস্থায়, আরো নানাভাবে নানা দেশ থেকে কতো লোক আসেন এদেশে। ছাত্র, শিক্ষক, ব্যবসায়ী এবং নেতৃস্থানীয় বহুব্যক্তি। তাঁদের সবার সামনে আমেরিকার পরিচয়-ছবি তুলে ধরেন এই সেণ্টারের পরিচালকেরা।

তাহলে তো সত্যি খুব ভালো কাজ করেন এরা।

বাস্তবিকই তাই! মাত্র বছর ছয়েকের প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এরই মধ্যে দীর্ঘ এদের কর্মতালিকা।

শুনে খুশি হলাম। আরো বিস্তারিত জানার আগ্রহ। এমন একটি স্বেচ্ছাসেবী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকর্ষণ বোধ স্বাভাবিক। ঠিক হলো, পরদিনই যোগ দেবো সেণ্টারের লেকচারে।

আসছে সপ্তাহের প্রথম দিকেই আর একবার আসা দরকার। আর কোন্ কোন্ জায়গায় যেতে ইচ্ছে জাগে, কার কার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে চান, সবই বেশ ভালো করে ভেবে আসবেন সেদিন।—বল্লেন মিঃ লিণ্ডে।

বেশ তাই হবে। সোমবারই আসবো।—কথা দিলাম। মিঃ লিণ্ডে নোট করে রাখলেন। সময় বেলা এগারোটা। সেণ্টার থেকে ফেরার পথে।

কথায় কথায় বেলা দুপুর। এবার যাই তা হলে। বিদায় নিতে গিয়ে ক্ষণিক বাধা। লিণ্ডের আকস্মিক অনুরোধ।

চলুন না, এক সঙ্গেই খাওয়া যাক আজ।

ধন্যবাদ। আজ থাক, আর একদিন। —জবাব দিলাম।

ঠিক আছে, তাই হবে। হ্যাঁ, আর একটা কথা ভুল হয়ে গেছে বলতে। একটা ইনস্যুরেন্স করে নেয়া দরকার আপনার। —এই বলেই ফোন তুলে কাকে ডাকলেন।

এক ভদ্রমহিলা এলেন। বয়স্কা। কিন্তু খুবই আমুদে। মিষ্টভাষিণী। আমায় বিস্তারিত বুঝিয়ে বল্লেন ইনস্যুরেন্স করার প্রয়োজনীয়তা। নিয়ম-কানুন জানালেন। খরচেরও একটা আভাষ দিলেন।

নতুন দেশ। নতুন জলবায়ু। তা ছাড়া চষে বেড়াতে চাই সারা আমেরিকা। অসুখ-বিসুখ তো হতেই পারে। কখনো কোন দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়াও বিচিত্র নয়। তখন এ বীমা অনেকটা রক্ষা-কবচ। নিঃখরচায় চিকিৎসা। সে কি বড়ো কম কথা? তিন মাসের জন্যে এ বীমায় দশ বারো ডলার ব্যয়। কি আর তেমন?

বেশ, ব্যবস্থা করুন তা হলে। ইস্যুরেন্সটা করেই ফেলি। —অনুরোধ জানালাম ভদ্রমহিলাকে। শরীরটা একবার ভালো করে পরীক্ষা করিয়ে

নেবার ইচ্ছে। আর কিছু না হোক, সেওতো একটা কম স্যাটিসফেকশন নয়। মনে মনে ভাবলাম।

মহিলা বিদায় নিলেন। এবার আমার পালা। দোর অবধি এগিয়ে দিয়ে গেলেন মিঃ লিণ্ডে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে দাঁড়াই। ফুটপাত ছায়াশীতল। মৃদুমন্দ বাতাস মধুর। অনেকটা আমাদেরই বাসন্তী ঢঙ্। এ যেন বাঙলার উতলা ফাগুন। আঃ মরি মরি!

সামনের শাদা বাড়িটায় নজর পড়ে। ভাষা গবেষণা পরিষদ ভবন। আমাদের দেশের ভাষা নিয়েও গবেষণা চলে নাকি এখানে? হয়তো হবে, তাঁতে আর বিচিত্র কি? ইণ্ডোলজির প্রতি অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিরই আকর্ষণ এদেশে।

বাঁধা কোন কাজ নেই এখন। আমাদের দূতাবাসে যাই। প্রথমেই সেখানে যাওয়া উচিত। আমাদের রাষ্ট্রদূত শ্রীমেহেতা। জানি খুবই ভালো লোক। তাঁর সঙ্গে পরিচয় আছে আমার। সেবার অনেকক্ষণ ধরে আলাপ হয়েছিলো আমাদের রাজধানীতে। কিন্তু সে কথা তাঁর মনে নাওতো থাকতে পারে! ওঁরা যে বহু-ব্যস্ত মানুষ। তুষারবাবুর চিঠিটা ফেলে এলাম! কী মস্ত ভুল?

ঠিক আছে। একটা ক্যাব ডেকে উঠে বসলাম। চলো ইণ্ডিয়ান এম্বাসি। ঠিকানা দিলাম।

ঠিক জায়গায় পৌছে দিলে ড্রাইভার। সামান্য পথ। ডুপণ্ট সার্কেলের খানিকটা ঘুরে সোজাসুজি। কিছুদূর গিয়েই বদ্বীপ আকারের ছোট্ট পার্ক। তারই এক পাশে স্বমহিমায় সবিশেষ একটি শাদা ধব্‌ধবে বাড়ি। ভারত-শুভ্রতার পরিচয় বুঝি!

এও ম্যাসাচুসেটস্ এভিন্যু। ২১০৭ নম্বর। আমাদের রাষ্ট্রদূতের অফিস। চ্যান্সারি। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রপতাকা নেই কেন এখানে?

গাড়ি থেকে নামতেই চ্যান্সারির গেটে রিসিভ করলেন আমায় এক বিদেশী ভদ্রলোক। বেশ লম্বা-চওড়া দেখতে। বয়স প্রৌঢ়ত্বের সীমা ছাড়িয়ে। রিসেপশনিষ্টের কাছে আমায় পৌছে দিয়ে তাঁর কাজ শেষ।

কাকে চান আপনি? —লিপষ্টিকের রঙে রাঙা ছোট্ট প্রশ্ন।

রাষ্ট্রদূত শ্রীমেহতার সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রার্থী আমি।—রিসেপশনিষ্ট সিন্ধি তরুণীর প্রশ্নে আমার উত্তর।

তিনি তো বাইরে এখন। কয়েকদিনের জন্যে টুরে বেরিয়েছেন।

তা হলে?

আর কারুর সঙ্গে দেখা করবেন? কোথা থেকে এসেছেন আপনি? কতোদিন থাকবেন এখানে? —এক দমে অনেক জিজ্ঞাসা। ভারি তীক্ষ্ণবুদ্ধি মেয়ে।

এসেছি কোলকাতা থেকে। আছি কয়েকদিন। দিন বারো চৌদ্দ।—এই বলে পরিচয় পেশ ধীরে ধীরে।

কিন্তু কয়েকদিন তো দেরি হবে আপনার মাননীয় রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করতে। ডাঃ হালদারকে চেনেন আপনি? তার সঙ্গেই বরং দেখা করুন আজ।

তা বেশ। খুবই ভালো কথা।—বাঙালী নাম শুনেই কেমন যেন একটা ঘন আকর্ষণবোধ। শুধু বাঙালী কেন, ভারত-পাকিস্তানের যে কোন লোকের সাক্ষাতের জন্যেই আর্ত পিপাসা। এতো হবেই। এ আমার দেশের মাটির টান। তাইতো সিন্ধি তরুণীর শাড়ি-শোভায় মুগ্ধ চোখ। কিন্তু ঠোঁটে কেন রঙ-লালিমা? ও নিছক বিদেশী প্রভাবের বিকৃতি-বিলাস।

ডাঃ হালদারকে ফোন করলেন রিসেপশনিষ্ট। তিনি তো নেই ঘরে। এখন লাঞ্চ টাইম। লাঞ্চেই গেছেন তিনি। একঘণ্টা পর দেখা হবে।

আমিও খেয়ে নি তাহলে। আশে-পাশে কোথায় রেস্তোরাঁ সে আবার খুঁজে নিতে হবে। জিগ্যেস করেই দেখি একবার।

খাবার জন্যে বাইরে যেতে হবে না আপনাকে। মোটামুটি বেশ ভালোই আমাদের অফিস ক্যান্টিন। ইচ্ছে করলে এখানেই খেতে পারেন।—এই বলে আমায় ক্যান্টিনের পথ দেখিয়ে দিলেন মেয়েটি।

খুবই সুবিধে হয়ে গেলো এ সন্ধানে। মধ্যাহ্নের ঘোরাঘুরি থেকে অব্যাহতি। এতো ছুটোছুটি গা-সহা হতে সময় চাই।

কিন্তু এ আবার কোথায় এলাম? ক্যান্টিনের পথে পথহারা আমি। আণ্ডার গ্রাউণ্ড হল। আঁকা-বাঁকা পথ। থমকে দাঁড়াই। তারপর প্রশ্নোত্তরে সঠিক দিগ্‌দর্শন।

বাঃ ছোটখাটো ভারি সুন্দর খানাঘর তো! স্টাফ লাঞ্চ চল্ছে এখন। অধিকাংশই মেয়ে। তারমধ্যে প্রায় বিলকুল বিদেশিনী। অষ্ট্রেলিয়ানই বেশি। জানি না কি এর কারণ। হয়তো কারণ আছে। কাজের অভাবে আমার দেশে হা-হুতাশ। আর বিদেশে আমাদের চাকরিতে অভারতীয়ের ছড়াছড়ি। সে কথাই এ দেখে মনে জাগে।

কি কি চাই আপনার?—পাচিকার প্রশ্ন। রসুঁইঘরের জানালা মুখে ছোট্ট লাইন। সে লাইনে এবার আমি প্রথম।

মাছ আছে?—মাছ খাওয়া হয়নি ক দিন। তা পেলে আর কথা নেই।

না, মাছ নেই আজ।—এ উত্তরে আশাভংগ।

মাংস?

হ্যাঁ, মাংস আছে। একথা বলেই দু রকমের মাংসের নাম করলেন মহিলা। কিন্তু আমি অনভ্যস্ত ওতে।

'হ্যাম'-এ আপত্তি কেন আপনার?—প্রশ্ন করলেন এক পাঞ্জাবী যুবক। দূতাবাসেরই একজন কর্মী তিনি। লাইনে ঠিক আমারই পাশে দাঁড়িয়ে।

এতো ভাই 'কেন'র ব্যাপার নয়, এ অভ্যাসের কথা, ইচ্ছে-অনিচ্ছের কথা।—আমার উত্তরে নীরব প্রশ্নকর্তা।

অগত্যা একটা সুপ, কিছু ভেজিটেবল, ডিম-রুটি ও পায়েস খেয়ে খানা শেষ। খাওয়ার শেষে একটি আপেল ও একটি মর্তমান কলা। সত্তর সেণ্টে দিব্যি ভোজন। বাইরের রেস্তোঁরা থেকে এখানে অনেক সস্তা।

আর একটি সুন্দর ব্যবস্থা এ ক্যাণ্টিনে। যাঁর যাঁর কাজ তাঁর তাঁর। রঁসুইঘর থেকে খাবার নিয়ে খানাঘরে গিয়ে গুছিয়ে বসো। খাওয়া শেষে ডিস-কাপ-গ্লাস সব বাইরে রেখে এসে দায়মুক্তি। কাফেটেরিয়ায় এমনি ব্যবস্থা জানতাম। এখানে তার চেয়েও একটু বেশি বেশি। দর কম হবার এও অন্যতম কারণ হয়তো।

রিসেপ শনিষ্ট-এর আফিস-আসন এখনো খালি। লাঞ্চ টাইম শেষ হয়নি এখনো। অতিথি ঘরে বসি খানিক। সে হলঘর বেশ সাজানো-গোছানো। দেয়ালে দেয়ালে ভারত-দৃশ্য। গান্ধীজী ছাড়াও সরকারী অধিনেতাদের প্রতিকৃতি—রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ছবি-পরিচয়। সংবিধানে ঘোষিত আমাদের মৌলিক অধিকারের সূচী-চিত্র।

দেশের পত্র-পত্রিকা পড়ার গভীর তৃষ্ণা। কোলকাতা থেকে আমার পত্রিকা এসে পৌছয়নি এখনো। এই যে এখানে আমাদের দেশের অনেক দৈনিক। তাই দেখি। স্থানীয় পত্রিকায় ভারত-সংবাদের ছিঁটেফোঁটা। তাতে কি আর তৃষ্ণা মেটে ?

কিন্তু সবগুলো কাগজই যে এক মাস আগের পুরোনো! এতো পুরোনো কাগজ এখানে রাখার মানে ? নিশ্চয় এর মূলে অব্যবস্থা। এসব খবর তো আমার সবই জানা। আবার আশাভংগের মনস্তাপ।

একটি ভারতীয় তরুণ এলেন। এদেশে শিক্ষার্থী। অবাঙালী হলেও কোলকাতা থেকেই ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তিনি। যন্ত্রবিদ্যায় আরো পারদর্শিতা লাভের উচ্চাশা তাঁর। শ্রেষ্ঠ যান্ত্রিক দেশ আমেরিকায় তাই আগমন।

তাঁর কয়েক মাসের অভিজ্ঞতা বর্ণনায় মুখর-যুবক।

কেবল নিন্দা-সমালোচনায় কি লাভ আমাদের ? এদের কাছ থেকে কতো ভালো যে আমাদের নেবার আছে, তাই ভাবা দরকার।

সব দেশেই কিছু না কিছু ভালো আছে। বিশেষ করে যে দেশ এতো অগ্রগামী, তার পেছনে বড়ো গুণ না থেকে পারে কখনো ?—তরুণ বন্ধুর কথায় সায় দিতে গিয়ে আমার স্মৃতি-প্রদীপে কবি-কথার শিখা জ্বল্ জ্বল্। তাই বল্লাম :

‘আপনার রুদ্ধদ্বার মাঝে
অন্ধকার নিয়ত বিরাজে,
আপন বাহিরে মেল চোখ—
সেইখানে অনন্ত আলোক।’

আমার ভারত, ওদের আমেরিকা

এ যেন ক্ষণ বিদ্যুৎ !

চলুন। কালচ্যুরাল এ্যাফেয়ার্স দপ্তরের ডাঃ হালদার অপেক্ষা করছেন আপনার জন্যে।—বলেই অদৃশ্য সিন্ধি মেয়ে। তাঁর আবির্ভাবের মতোই আকস্মিক।

হল ঘরের বাইরে এসে ক্ষণিক দাঁড়াই। তাকাই এদিক ওদিক।

এই যে, কোথায় চলে গেলেন চোখের নিমেষে ! আমি তো অবাক।

টুক্ করে একটা কাজ সেরে এলাম।—পাশের একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমার সঙ্গে এটুকু কথা। তার পরেই আমায় নিয়ে এলিভেটরে উঠলেন রিসেপ্শনিষ্ট। সেলফ্ এলিভেটর। সামনেই নানাতলার বোতাম সাজানো। ক্রমিক সংখ্যায় নম্বর বসানো। টিপতেই এলিভেটর উর্ধ্ব বা নিম্নগতি। তারপর নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে অবতরণ।

ডাঃ হালদারের ঘরে আমায় পৌঁছে দিয়ে শ্রীমতী অন্তর্ধান। ভারি চট্পটে মেয়ে।

আমাদের দুজনে এবারে অনেক কথা। দেশের, এ দেশের। কথায় কথায় কথার স্তূপ। ছোট পাহাড়। ডাঃ হালদার বছরখানেক আছেন এদেশে। অধ্যাপনা ছেড়ে এসে এদেশে একাজে। কাজ ভালোই। তবু আপন দেশের মাটির টানে মন কাঁদে।

দেশে রাজ্য সীমানা পুনর্গঠনের হট্টগোল। তার প্রতিক্রিয়া তীব্রতর দূর প্রবাসীদের মনে মনে। বিস্তারিত জানবার ভারি আগ্রহ। আমার দেওয়া নানা সংবাদে কতো তৃপ্তি ! বম্বে সমস্যায় মুখ্যমন্ত্রী মোরারজীর অনশনে গভীর উদ্বেগ।

কিন্তু কেন এ অনশন ? কি তার যুক্তি ? অতি দুর্বল। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ নীতির সীমা লংঘন। গান্ধীবাদীর পক্ষে নিতান্ত অশোভন।

ডাঃ হালদারের মনে সংশয় দোলা। আমার কথায় নিরুত্তর তিনি। আলোচনা মোড় নেয় অন্য পথে। আমার সফরসূচী নয়া প্রসংগ। সে সূচী এখনো তৈরি নয়। তাই সে কথা কতোক্ষণ আর।

আপনার কিন্তু একবার দেখা করা উচিত মিঃ ট্যাগুনের সঙ্গে।

কে তিনি ?

আমাদের পাব্লিক্ রিলেসন্স অফিসার। আপনার কোন সাহায্যের দরকার হলে সানন্দেই তার ব্যবস্থা করবেন তিনি।

দয়া করে চলুন তাহলে, আজই তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে নি।

বেশ।—ফোন তুলে যোগাযোগ করলেন হালদার। আমায় নিয়ে একটু পরেই নেমে এলেন।

ট্যাগুনের ঘরে তখন ছোট্ট বৈঠক। সহকারীদের নিয়ে সম্মেলন। আমাদের আগমনে সব নিথর। ওঁদেরও নাকি কাজ শেষ। সবার সঙ্গে সহজ পরিচয় এক এক করে। প্রীতিময় পরিবেশে প্রশান্ত মন।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন। কখনো আমি বক্তা। কখনো শ্রোতা। চা-এর আসরে গল্প ধূম।

দেশীয় প্রথায় চা এখানে। নিজে তৈরির ঝামেলা নেই। একটানা তাই গল্পে সুখ।

কথার যাদুকর শ্রীট্যাগুন। চমৎকার ব্যবহার। তাঁর পদযোগ্যতায় এই তো চাই। আমার যখন যা প্রয়োজন, আমি যেন তাঁকে জানাই, সে অনুরোধ। আমার কর্মসূচী জানারও তাঁর বিশেষ ইচ্ছে। বক্তৃতা, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর—এসব কাজে প্রস্তুতির জন্যে রেফারেন্স বই-এর প্রয়োজন। আমারও দরকার হবার সম্ভাবনা। শ্রীট্যাগুনের ঠিক অনুমান। একজন সহকারীর ওপর তাই তাঁর নির্দেশ, আমার হোটেলে তেমনি কিছু বই-পত্র পাঠিয়ে দেবার। কিছু কিছু ভারত-তথ্য। তা পেয়েও ছিলাম। তাতে আমার সুবিধেই হয়েছিলো। সে কথা স্বীকার করি।

দিন ছয় সাত পর রাষ্ট্রদূত ফিরবেন। তিনি এখন ক্যালিফোর্ণিয়ায়। আগে থেকেই একটা এপয়েন্টমেন্ট করে রাখা ভালো।—শ্রীট্যাগুনের পরামর্শ। রাষ্ট্রদূতের সেক্রেটারী মিস্ ক্যাম্বেলের সঙ্গেও একবার সাক্ষাৎ করতে বল্লেন তিনি।

আজ আর নয়, কাল আসবো আবার। তখন এসে সব পাকাপাকি।

বেশ। মিঃ চন্দের সঙ্গেও বোধহয় দেখা হয়নি। সময় পেলে কাল তাঁর সঙ্গেও আলাপ হতে পারবে।

আচ্ছা, আজ যাই তাহলে। নমস্কার।

নমস্তে, কাল আবার দেখা হবে। নমস্তে।—দূতাবাসের বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার সূর্যালোকে। সিড়িমুখে আবার মুখোমুখি সেই বিদেশী ভদ্রলোকের সঙ্গে। তিনি দ্বারপাল। প্রথম অভ্যর্থনা ও শুভ বিদায়ের ভার তাঁর ওপর। তাঁর কাজ দেখে আমার তাই ধারণা।

কমজুরি রোদ। শেষ বিকেল। এখন পায়ে চলায় কষ্ট কম। হেঁটেই বেড়াই। শহর দেখি।

চলতে চলতে একটি প্রশ্নের উঁকিঝুঁকি। প্রায় সব বাড়িই মস্ত বড়ো। মিথ্যে নয় যা শুনেছি, যা পড়েছি ঠিকই বটে। কিন্তু বাড়িগুলো তেমন উঁচু নয়তো! আট নয় কি দশ তলা। ব্যস, এতেই এতো দেমাক। বিশ ত্রিশ পঞ্চাশ তলা তাহলে সব কথার কথা। ছোঃ!

কিন্তু তা নয়। এ রাজধানী শহর। নগর-সজ্জায় বেশ বাধাবাধি এখানে। নিয়ম কড়া। বেশি উঁচু-নীচুয় নয়ন-পীড়া। তা চলবে না। শহর-সুষমা বজায় চাই। তাই বারো তলার বেশি বাড়ি নিষেধ। ওয়াশিংটন ডি সি-র সৌধ-সাম্যের এই কারণ। না, অন্য কিছু?

ইচ্ছে করেই ঘুরে ঘুরে চলি। পথ হারাবার ভয় নেই আর। আমি মোটামুটি রপ্ত এখন।

একটু দূরেই ছোট্ট পার্ক। মাঝখানে কার মূর্তিরূপ। এ যেন কবি কবি। ঠিকই তাই। কাছে দাঁড়িয়ে-নাম পড়ি। কালো পাথরে সোনালী নাম। অতি পরিচিত কবি লংফেলোর নাম। তাঁর অসংখ্য রচনা অজস্র দানের এ স্বীকৃতি। আরো কতো কোথায় আছে. তা কি জানি। উনবিংশ শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে তাঁর কীর্তি-কাল। এ মূর্তি দেখে সে মহাজীবনকে স্মরণ করি। নমস্কার।

হঠাৎ কেন লোক কিল্‌বিল্‌? আফিস ছুটি। গাড়ির মিছিলও অন্তহীন। সাড়ে চারটায় সব ঘরমুখো। সায়াহ্ন-সুখের মধু-কল্পনা। পথ চলা যেন ছন্দোময়।

আমার প্রথম জিজ্ঞাসার উত্তর পেলাম। আপাত উত্তর। আমেরিকার মাটিতে পা দেওয়া থেকেই যে প্রশ্ন, তার উত্তর:

কি সে প্রশ্ন: এতো অল্প সময়ে এতো সমৃদ্ধি এতো উন্নতি কি করে সম্ভব? কম করে হলেও পাঁচ হাজার বছরের লিখিত ইতিহাস রয়েছে আমাদের।

উজ্জ্বল ঐতিহ্যমণ্ডিত সে ইতিহাস। অতুলনীয় সে গৌরব। কিন্তু তা সত্ত্বেও বৈষয়িক ক্ষেত্রে আমরা কোথায়? আমাদের তুলনায় আমেরিকা তো সে দিনের। একান্ত শিশু। তার বৈষয়িক সাফল্যের মূলমন্ত্র কি?

তার উত্তর: অতুলনীয় এদের কর্মনিষ্ঠা, অপূর্ব এদের সততা ও শৃঙ্খলাবোধ এবং অত্যন্ত গভীর এদের দেশপ্রেম। ফাঁকির প্রতিযোগিতায় আমাদের জাতীয় অগ্রগতি পদে পদে ব্যাহত। কাজের প্রতিযোগিতায় এদের অগ্রগমন অভাবনীয়। পরিপূর্ণ দায়িত্বের সুষ্ঠুসাধনে এদের প্রাণ-শান্তি। সবাই এরা দায়িত্বশীল। তাই সুপারভাইজারের কোন বালাই নেই কোথাও। আমরা অধিকাংশই যেনতেন প্রকারেণ দায় সারি। আমার দেশে কর্মী তুলনায় কর্ম-পরিদর্শক সংখ্যাধিক। তাঁদের অনেকেরই আসন আগলানো আসল কার্জ। কর্মচারীদের সন্তোষ বিধানে এদেশে কর্তৃপক্ষ সদা সজাগ। আমার ভারতে তাঁরা সাধারণত স্বভাব কৃপণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেশপ্রেমের নামে আত্মপ্রেম। প্রগতি তাই এতো মন্থর। তবে একাল তো নয় চিরকালের। এ হাল দেশের ঘুচবেই, এই আশা।

জাতি হিসেবে আমরা পিছিয়ে। তার নানা কারণ। কিন্তু ব্যক্তি-বিকাশে ভারত অদ্বিতীয়, এ কথা কে অস্বীকার করবে? শ্রীঅরবিন্দের একটি বিখ্যাত কথা মনে পড়ে। "In India we have seen how high individuals can rise and how low a nation can fall". তাঁর একথা খুবই সত্যি।

আমেরিকায় জাতিকে এগিয়ে নেবার জন্যেই সকলের সমান সুযোগ। তাই গণতন্ত্রের গোড়ার কথা। সকলের বিকাশে জাতির বিকাশ। কয়েক-জনের চিন্তায়, কয়েকজনের চেষ্টায় বিরাট ভারতের কতোটুকু অগ্রগতি সম্ভব?

হঠাৎ থামি। একটা চৌমাথায় এসে গোলক ধাঁধাঁ। আর কতোদূর?

আর ইউ লষ্ট? ক্যান আই হেলপ্ ইউ?—একটি আকস্মিক জিজ্ঞাসা। একজন অপরিচিত পথিক আমার মুখোমুখি। বিদেশীকে সাহায্য করার অকৃত্রিম আগ্রহ।

না, ঠিক পথহারা নই আমি। ধন্যবাদ। ভাবছি, কোন্ পথে আমার হোটেল কাছে। এতো আই স্ট্রীট। আর একটু গেলেই কে স্ট্রীট। সে পথ থেকে আমার হোটেল সামান্য দূর।

কি হোটেল আপনার ?

উত্তর শুনে ভদ্রলোক বল্লেন, ঠিকই এসেছেন আপনি। কে ষ্ট্রীট ধরে খানিক দক্ষিণে গেলেই নাইন্টিন্থ ষ্ট্রীট। সে পথসংযোগ থেকে হোটেল প্রেসিডেন্সিয়াল কয়েক পা।

তা জানি আমি। ধন্যবাদ।—এর পরেই আমরা তুজনে ছাড়াছাড়ি।

হোটেল লবীতে এবেলা এতো ভিড় ? নবাগতের বহু সমাগম। কিন্তু আর ঘর নেই। সীটও শেষ। একটি ভারতীয় ছাত্রের হতাশ চোখ। আমায় দেখে কী উল্লাস ! নতুন মানুষ। এ অবেলায় সে কোথায় যায় ? তার ঘরের খোঁজে আবার পথে বেরুই। সহজ সমাধানে স্বস্তিবোধ। কাছেরই এক হোটেলে বিহারী ভাই-এর ব্যবস্থা করে দিয়ে ঘরে ফিরি।

শূন্য ঘর। বড়ো ফাঁকা ফাঁকা। তবু সুরম্য। কি ফিটফাট ! আমার সকাল বেলার অগোছানো শয্যা এমন সুবিন্যস্ত ! সব নতুন। গৃহকর্তার অনুপস্থিতিতে গৃহবিন্যাস। চমৎকার !

ঘরের কবাটে কি এই নোটিশ ? নজর পড়েনি তো কাল রাতে ! আজ সকালেও নয়। তখন যে তাড়াহুড়ো। এখনই পড়ি।

এ যে ভারি ভয়ের কথা ! আগুন সম্পর্কে সতর্কতা ! দস্যু-ডাকাত সম্পর্কে সতর্কবাণী !

আকস্মিক আগুন তুর্ঘটনায় আত্মরক্ষার উপায় নির্দেশ। খুবই উত্তম। চুরি-ডাকাতি সম্বন্ধে হুঁশিয়ারি। সেও ভালো কথা। কিন্তু এমন প্রগতিশীল দেশেও দস্যু-গুণ্ডার এতো উৎপাত থাকবে কেন ? ডাকাতি-রাহাজানির নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কারের তুর্নাম এ দেশের। তা নিয়ে কতো সাহিত্য, কতো গবেষণা ! তা যে মিথ্যে নয়, তার ইংগিত এ নোটিশে।

বেশি ধন-দৌলত নিরাপদ নয় ঘরে রাখা। তার জন্যে কোন দায়িত্ব নেই হোটেল কর্তৃপক্ষের। হীরে-জহরৎ, বাড়তি ডলার জমা রাখার পৃথক ভাণ্ডার। শুধু সে ভাণ্ডারেরই দায় তাঁদের। এই নোটিশ। আর তার সঙ্গে ঘর ভাড়ার রেট।

আমার ভাবনার বাইরে ওসব। সামান্য পকেটের মানুষ আমি। কিন্তু যথেষ্ট নিয়ে যাদের চলাফেরা, তাদের তুশ্চিন্তা। কেন তা হবে ? বিপুল উন্নতির উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল নয় তবে।

তবে ভালো-মন্দ নিয়েই মানুষ। প্রত্যেকটি দেশের বেলাও তাই সত্য। সুন্দর এবং অসুন্দর। জীবনের দুই দিক। তাইতো ওয়াল্ট হুইটম্যান তাঁর Song of myself কবিতায় বলেছেন :

I am not the Poet of
goodness only,
I do not decline to be
the poet of wickedness also.

মানবতার কবি হুইটম্যান। অখণ্ড মানুষের বন্দনা তাঁর কাব্যে।

তবু প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। অসুন্দরকে জয় করে, মন্দকে বর্জন করে, চলা কি অসম্ভব? প্রাচুর্যের পৃথিবী আমেরিকা। আনন্দের দেশ আমেরিকা। সেখানেই চলুক না এ প্রশ্নের পরীক্ষা! তার উন্নতির উদ্দেশ্য সার্থক হোক! তাই বলে আমরাই বা চেষ্টা করবো না কেন আমাদের দেশকে সবচেয়ে সেরা করে গড়ে তুলতে?

গোছলখানা বেশ ফিট্‌ফাট। সাবান-তোয়ালে সব বদল। বিকেলী স্নানে শ্রান্তি দূর। বাইরে এখনো রোদ রাঙা। মনের আকাশে তার ছায়া। কে থাকে ঘরে এ সন্ধ্যায়।

আমিও বেরুই। দূর দূরান্তে মন বিছাই। একলা চলি। বেশ লাগে। আকাশ বুকে ময়ূর-নীল। সেই আকাশে কাস্তে চাঁদ। এক ফালি। ফুল ছড়ানো দুচার তারা চারদিকে। বেশ লাগে। প্রতিপদ না দ্বিতীয়া আজ? কি জানি।

বিজ্ঞাপনও প্রাণ জুড়োয়। একটি ছবির নিচে দুটি মাত্র কথা। সে ছবি সে কথার কি আকর্ষণ! সে আমন্ত্রণে দিই সাড়া। দেখিই না কি ব্যাপার। ঠাণ্ডা ঘরে আরো ঠাণ্ডা ফলের রস। রকম রকম আইস্‌ক্রিম। আমেরিকান আইস্‌ক্রিমের খুব সুনাম। নিই একটা।

ছোট না বড়ো?

ছোটই দিন।

চকোলেট না হোয়াইট?

চকোলেট।

অনেকে জিনিষপত্র কিনে নিয়ে গৃহযাত্রী। কারুর চাহিদা আইস্‌ক্রিম,

কারুর ফ্রুট জুস। মোটরবাহী কেউ কেউ আবার দুধের ভার নিয়ে ঘরমুখো। অনেকের অবশ্য দোকানঘরেই পানাহার শেষ করে প্রাণঠাণ্ডা। আমি শেষ দলে। কিন্তু একি বিচিত্র ব্যাপার! এ যে একেবারে বাটিশুদ্ধ গলাধঃকরণ! আইস্‌ক্রিম খাওয়ার এই নমুনা দেখে আমি অবাক। আমিও খেলাম। কিন্তু এ এক রকমের বিস্কুট-বাটি! মিষ্টি। আইসক্রিমের মতোই সুস্বাদু।

এ দোকান একটি বিখ্যাত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ষ্টোর। অনেকগুলোর মধ্যে অন্যতম। এক প্রৌঢ়া এর পরিচালিকা। তাঁর সহকারিণী নব-যৌবনা। সেদিকে একটু ভিড় বেশি।

প্রৌঢ়ার কাছ থেকেই আমার কেনাকাটা। পনেরো সেণ্ট দাম মিটিয়ে আমার যখন ফেরার মন, চমকে উঠি। স্নিগ্ধ-মধুর ছোট্ট কথায় আপ্যায়ন। আমার দেশের মেয়েদের সঙ্গে কেমন মিল! 'প্লিজ কাম্‌ এগেইন'। এতো 'আবার এসো' কথারই অনুরূপ। তবে এ এক দোকানীর কথা। এই যা তফাৎ।

আর একটু ঘুরে নৈশাহার শেষে হোটেলে ফিরি। লবীতে কিসের যেন সভা সমারোহ? টেলিভিশনের আকর্ষণে লোক জমায়েৎ। আমিও বসি।

সান ফ্রান্সিস্কোয় রিপাব্লিকান পার্টির ন্যাশনাল কন্‌ভেনশন। সারা দেশময় বিপুল উত্তেজনা। বিশ তারিখ থেকে সুরু হয়েছে এ সম্মেলন। আজ বাইশে। কাল অবধি চল্‌বে। আজই সব চেয়ে বেশি উত্তেজনার দিন। আস্‌ছে নির্বাচনে প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস প্রেসিডেণ্ট পদের জন্যে পার্টি থেকে মনোনয়ন দেওয়া হবে আজ। প্রেসিডেণ্ট পদ নিয়ে বিতর্ক নেই। কিন্তু ভাইস প্রেসিডেণ্ট পদে নিক্সনের মনোনয়ন নিয়ে যতো গোলমাল। স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ারের নিরস্ত্রীকরণ উপদেষ্টা মিঃ হ্যারল্ড ষ্ট্যাসেন সে মনোনয়নের ঘোর বিরোধী। নিক্সন ভাইস প্রেসিডেণ্ট দাঁড়ালে আইজেন-হাওয়ারকে অনেক ভোট হারাতে হবে, তাঁর কথা। সে পদে তাঁর পছন্দ ম্যাসাচুসেটস্‌-এর গভর্ণর হার্টারকে। এ নিয়ে এতো দিন ধরে কতোরকম গবেষণা, কতো প্রচার।

ওমা, কার্যকালে এযে দেখছি সব ওলট-পালট! গভর্ণর হার্টার নিজেই ভাইস প্রেসিডেণ্ট পদে নাম প্রস্তাব করে বসলেন মিঃ নিক্সনের! আর স্বয়ং মিঃ স্টাসেন সে প্রস্তাবের সমর্থক!

সকালবেলা ছিলো রাষ্ট্রপতির প্রেস কনফারেন্স। সেখানেই সব খবর ফাঁস। সব গোলমালের ফয়শলা। পার্টি সম্মেলন নির্বিবাদ। সর্বসম্মত প্রস্তাবে পুনরায় পূর্ব-জুড়ির মনোনয়ন। বিরুদ্ধ কণ্ঠ সব নীরব। সিদ্ধান্ত ঘোষণায় টেলিভিসনের মুখর ছায়া-দৃশ্যে সে কী বিপুল উল্লাস! সম্মিলিত এক হাজার তিনশো তেইশটি মানুষের একটি মন। একদল, এক প্রাণ, একতা! তাই কি?

এ নিয়ে তর্ক-তুফান। অনেক অ.লোচনা, অনেক গবেষণা। সে সব থাক এখন।

আরো কিছুক্ষণ টেলিভিসনে নাচ দেখি আর গান শুনি। তার পরে ওপরে যাই। আমার যেখানে শয্যাঘর।

সুটকেশ খুলে কাগজপত্র নিয়ে খানিক নাড়াচাড়া। ফাইলগুলো ভালো করে গুছোনো দরকার। এই যে এখানে তুষারবাবুর চিঠি! হারাই নি তা হলে। সযত্নে পকেটে রাখি। কালই সাক্ষাতের কথা মিস্ ক্যাম্বেলের সঙ্গে। ভালোই হলো চিঠিটা পেয়ে।

চুপি চুপি ঘুম নামে। চোখের পাতায় তার ছোঁয়া। শুই তবে। মনের কোন ঘুম নেই বুঝি! স্বপ্নপরীর দুষ্টুমি। তার অনেকই অর্থহীন। অন্ধকার গলে গলে রাত্রি ভোর। শিশির-ভেজা আলোর স্পর্শে চোখ খুলি।

নতুন দিন।

অনেক দেশ, এক পৃথিবী

আর একটি মনোরম সকাল। বৃহস্পতিবার। ইণ্টারন্যাশনাল সেণ্টারের সঙ্গে পরিচিত হবার দিন। অনেক দেশের মানুষের মধ্যে নিজেকে দেখবো। নিজের অন্তরে অনেক দেশের মানুষকে অনুভব করবো। তেমনি করেইতো দেশে-দেশে অন্তরংগতা। তাই আন্তর্জাতিকতা। সে ভাবনায় ভারি আনন্দ।

সঙ্গে মিঃ লিণ্ডের দেওয়া ঠিকানা। পথ-চিত্রে আমার জন্যে পথাংকন। প্রাতরাশ সেরে সে পথে পথিক। গতি-লক্ষ্য ১৭২০ রোড আইল্যাণ্ড এভিন্যু, নর্থওয়েষ্ট। সেণ্টারের বাড়ি সেখানে।

পাশের কে ষ্ট্রীট ধরে কনেটিকাট এভিন্যু। কানেক্টিকাট বানানের কনেটিকাট উচ্চারণ। সে পথে উত্তরমুখো। রোড আইল্যাণ্ড এভিন্যুর সুরু বা শেষ। তার একটি মুখ কনেটিকাটে। সেখানে পৌঁছে পূব দিকে খানিক দূর পদচারণা। সেণ্টার-সৌধ আর একটু গিয়েই ডান হাতে। তার মুখোমুখি রাস্তার ওপারে ধর্মধাম। একটি পুরোনো গীর্জে।

সেণ্টারের দুপাশ বেশ নয়ন-ত্রাণ। আপন খেয়ালের সৃষ্টি নয়। তৈরি বাগ। সামান্য ঝোপঝাপ্। অজানা পাখির হঠাৎ ডাক। সে ডাক শুনে পাখি-মন ছুট্ কোন্ সুদূর। কান খাড়া। কিন্তু সে ডাক শুধু একবারের। আগের মতোই আবার চুপ।

বাড়ির প্রবেশ পথ। সামনে দুটি তরুণ। অচেনা। তবু চিরচেনা। ঢাকা থেকে আগত। তাঁরা কতো আপন। আজ আর নাম মনে পড়ছে না। কিন্তু নাম তো শুধুই নাম। মানুষ বড়ো কথা। তাঁদের ভুলিনি।

তখন তাঁদের খুব তাড়া। টেক্সাস যাত্রার প্রাক্ মুহূর্ত একজনের। বিদায় সম্ভাষণ জানাতে সেণ্টারে আগমন। সংগীটিও টেক্সাস-যাত্রী। তবে তাঁর যাত্রা কদিন পর। কৃষি-বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা লাভে উচ্চাশা।

এতো তাড়ায়ও আমায় দেখে গতিস্থির। মিনিট কয়েক কথা-বার্তায় প্রাণ-শীতল। এমনি টান। ওরাও যে বাঙালী। হোক পাকিস্থানী, তবু আমার বাঙ্লার ভাই।

মিসেস্ মামুদের সঙ্গে দেখা হয়েছে? তিনিও এদেশে এসেছেন ক'দিন হলো। এখানকার আজকের সভাতেও আসবেন হয়তো।—একটি যুবক বল্লেন।

কে? মিসেস্ মামুদ? মনের গভীরে হঠাৎ ডুব। চিন্তানুসন্ধানে ব্যর্থশ্রম।

ও, আপনি মিসেস্ মামুদকে চেনেন না বুঝি? জনাব হবিবুল্লা বাহারের বোন তিনি। বেগম শামসুন্নাহার। আমেরিকায় এসেছেন সমাজ-সেবার কাজ দেখতে, সে বিষয়ে বিশেষ ট্রেনিং নিতে।

তাই নাকি? সেই 'বুলবুল'-খ্যাত বেগম শামসুন্নাহার?

হ্যাঁ।

খুব ভালো কথা। সমাজ-সেবার কাজে মেয়েদেরই প্রধান ভূমিকা এদেশে। মিসেস্ মামুদ সে কাজে এসেছেন শুনে খুব আনন্দ হলো। —এই বলে চুপ করে গেলাম।

ওঁরা চলে গেলেন। জানিয়ে গেলেন আমার হোটেলের কাছেই চার-পাঁচজন আছেন ওঁরা। ওঁদের ন্যাশনাল হোটেল।

সভা বসেছে দু তলায় আর তিন তলায়। এক-এক গ্রুপের জন্যে এক-এক হলে। আমি নতুন। আমার সভা তেতলায়। নটা বেজে দশ। সভা চলছে। দু-একটি আসন তখনো খালি। নিঃশব্দে একটিতে বসি। 'সুন্দর আমেরিকা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন একজন। আমেরিকায় কোথায় কি দেখবার, কোথায় কি জানবার মানচিত্র দেখিয়ে ছবি দেখিয়ে বক্তা বোঝাচ্ছিলেন। বেশ ইণ্টারেস্টিং। কলেজের ক্লাসে বক্তৃতা শোনার মতোই লাগছিলো। আরো ভালো লাগছিলো নানা দেশের নবীন-প্রবীণদের ভিড় দেখে। দ্বিতীয় বক্তৃতার বিষয় 'হুভার বাঁধ'। একজন প্রৌঢ় অধ্যাপকের জ্ঞানগর্ভ ভাষণ। আমেরিকার উন্নয়নে নদী নিয়ন্ত্রণের অপরিসীম দান। এ বক্তৃতায় সে বিষয় পরিষ্কার।

আজকের সভার পরিসমাপ্তি। সভাশেষে পরদিনের কর্মসূচী ঘোষণা। সকাল নটাই সভার বাঁধা সময়। বক্তৃতার বিষয় 'আমেরিকায় নাগরিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা'। সে বক্তৃতার পর মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্যে দু ঘণ্টা বিরাম। তারপর সেণ্টারের ব্যবস্থাপনায় নগর পরিক্রমা।

এ ঘোষণায় মন খুশি। দল বেঁধে বেড়ানোর আনন্দ বেশি। বিশেষ করে ভাবনা-শূন্য মন যখন। ভ্রমণ-দক্ষিণা দু ডলার দিয়েই দায় খালাস। আর কি চাই?

ফেরার পথে সেণ্টারের কিছু উপহার। কিছু বইপত্র। আমেরিকাকে জানবার সুবিধার জন্যে কিছু ইতিহাস, কিছু বিবরণী, কিছু ইস্তাহার। সঙ্গে সেণ্টারের মুখপত্র 'ইণ্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ নিউজ'। এটিই মুখপত্রের প্রথম সংখ্যা। এ বছরেই জুন মাসে তার প্রথম প্রকাশ। সেণ্টারের মাধ্যমে নানা দেশের মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব-বন্ধন। তাকে চিরস্থায়ী করার প্রয়াস। সে বন্ধুত্বের যোগসূত্র এই ত্রৈমাসিক মুখপত্র। একটি মহৎ কাজ।

ইণ্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ নিউজ পড়ে সেণ্টারের বিশদ পরিচয় লাভ। তার কথাই একটু বলি।

এখন আগস্ট মাস। ১৯৫৬। এ বছরেরই মার্চ মাসে পালিত হয়েছে ওয়াশিংটন ইণ্টারন্যাশনাল সেণ্টারের ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী। আমেরিকান কাউন্সিল অব এডুকেশনের এ একটি শাখা প্রতিষ্ঠান। পররাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে ব্যবস্থায় এর সৃষ্টি। আন্তর্জাতিক শিক্ষা ও নেতৃ-বিনিময় ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা এবং সৈন্য বিভাগীয় সিভিল অ্যাফেয়ার্স ডিভিশনের মাধ্যমে আগত লোকদের সামনে আমেরিকার পরিচয় তুলে ধরা। প্রধানত এই-ই কাজ সেণ্টারের। পাঁচ বছরে বিশ হাজারেরও বেশি পরিদর্শকের সমাগম হয়েছে এ সংস্থায়। বিভিন্ন মহাদেশের তাঁরা। মোট ৯৪টি দেশের প্রতিনিধি।

সেণ্টারের সব সময়ের কর্মী খুব বেশি নয় সংখ্যায়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবীর সংখ্যা অনেক। কম করে হলেও এক হাজার। এ কয় বছরে অন্তত তিন হাজার স্বেচ্ছাকর্মীর সেবা সহযোগিতা লাভ করেছেন রাজধানীতে সমাগত বিদেশী পর্যটকেরা। প্রতি বছর গড় সংখ্যায় এই পর্যটকরাও বড়ো কম নন। পাঁচ হাজার।

এবার ভাবুন একবার। সেণ্টারের ষষ্ঠ বছরের শেষ অংক চলছে এখন। পঁচিশ হাজার নর-নারীর নাম তালিকাভুক্ত সেখানে। পঁচানব্বইটি দেশের লোক তাঁরা। পৃথিবীর কোন এক প্রান্তে তাঁরা যদি একটি নগর গড়ে তোলেন, তাই হবে তাহলে সবচেয়ে সেরা আন্তর্জাতিক শহর। একটি ছোট্ট পৃথিবী। বিদ্বেষমুক্ত। শান্তির জগৎ। সেখানে থাকবে নানা দেশের নানা বৃত্তির মানুষ। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, আইনজীবী, সাংবাদিক, অধ্যাপক, সাহিত্যিক সব। সব রকমের লোকই তো আসেন সেণ্টারে। একটি প্রীতির সুতোয় আবদ্ধ হয়ে যায় হাজার হাজার মন। এও তো সত্যি কথা, নানা দেশে নানা

ওয়াশিংটন ইণ্টারন্যাশনাল সেণ্টার। সেণ্টারের কর্মসূচী নিয়ে আলোচনারত মিঃ রবার্ট হ্যাপ, মিস্ ফ্রিডম্যান, মিসেস্ জুডিথ রাসেল প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মী।

জাতির বাস হলেও পৃথিবী এক। আমাদের সবার মাতা বসুন্ধরা। আর এদেশ-সেদেশ যাই বলি, নানান্ দেশের মানুষে মানুষে অনেক মিল। আর অমিল? সে তো সামান্য। এই অমিলটুকুকেই আমরা বাড়িয়ে বলি, ফাঁপিয়ে তুলি। জগৎ জুড়ে হাংগামা বাঁধাই। এতো মিলকে ভুলে গিয়ে মিলনের গ্রন্থি ছিঁড়ে ফেলি। হায় মানুষ!

ইণ্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ নিউজ পড়তে পড়তে এসব কথাই ভাবছিলাম। নেমে এলাম নিচে। সেখানে সিঁড়ির একপাশে একখানা টেবিল নিয়ে একজন মহিলা কর্মী।

আপনি কার্ড ফিল-আপ করেছেন?

না তো! —বলতেই মহিলা একখানি সবুজ কার্ড তুলে দিলেন আমার হাতে। নাম-ঠিকানা আর কি সূত্রে এদেশে, তা লিখে দিয়েই কাজ শেষ। পিছন ফিরতেই দেখি আমার দেশের মানুষ।

আমি মিসেস্ মামুদ। আপনি?—বাংলা কথা। কি মধুর! তাই তো কবি গেয়েছিলেন, আ মরি বাংলা ভাষা!

আমার পরিচয় দিয়ে বল্লাম, আপনার কথাই হচ্ছিলো ঢাকার দুটি ছেলের সঙ্গে। দেখুন না, হঠাৎ কেমন দেখা হয়ে গেলো।

পথ চলতে এমনি করেই তো কতো মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় জীবনে।—মিসেস্ মামুদ বল্লেন।

কিন্তু একি শুধু পথ-চলতি দেখা? এ যে প্রাণের পরিচয়। কতো দিনের কতো পুরোনো এ আত্মীয়তা! আজ আমাদের মাঝখানে বিচ্ছেদের লবণ-সমুদ্র। বিভেদ বিভাগের পশ্চিমী কারিগরিতে বিরাট ব্যবধান। যখন ভাবি আমরা এক, আমরা অভিন্ন, লবণ-সমুদ্র অমনি গর্জে ওঠে। বলে: না, না। তোমরা আলাদা। তোমরা পৃথক। তোমরা নিজেদের মধ্যে মিল খুঁজো না। মিল হবে না। অথচ বিশ্বের লীলাংগনে মানুষ যে শাশ্বত—আমাদের অনুভূতির তারে তারে যে একই সুরের অনুরণন, অনৈক্যের আলোড়নে আমরা তা ভুলে যাই। তা না হলে ভারত-পাকিস্তানের মানুষ কি নিজেদের কখনো আলাদা ভাবতে পারে?

মনের কথা মনে মনে। হঠাৎ একটি ভারতীয় তরুণী এসে দাঁড়ালেন মিসেস্ মামুদের সামনে।

এই যে ইনি মিস্ রাধালক্ষ্মী। কোলকাতার হেল্‌থ্ অ্যাণ্ড হাইজিন ইন্সটিট্যুটের কর্মী।— মিসেস্ মামুদ পরিচয় করিয়ে দিলেন আমার সঙ্গে। আমার পরিচয়ও দিলেন তাঁকে।

মাদ্রাজী মেয়ে। কিন্তু প্রায় পুরোপুরি বাঙালীয়ানা চালচলনে। চেহারায়ও বাঙালী মেয়ের সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য রাধালক্ষ্মীর। কথা না বললে ধরা কঠিন তিনি সুদক্ষিণী। আমিও আগে বুঝিনি।

বাঙালী হলে বাংলাতেই আলাপ হতো। আলাপ হলো ইংরেজিতে। রাধালক্ষ্মী জানালেন, তাঁরা মাদ্রাজের। তবে অনেকদিন আছেন বাংলাদেশে। তাঁর বাবা ডাক বিভাগের একজন বড়ো অফিসার। এক ভাইও। বুঝলাম, অনেকদিন বাংলায় থাকার ফলেই এই বাঙালীয়ানা।

একটু বাদেই আমার আর একটা এনগেজমেণ্ট। আজ যাই। কাল এখানে আসবেন তো আবার? তখন দেখা হবে।—বলেই হঠাৎ বিদায়। ছোট্ট এক

টুকরো হাসির রেশ। বেনারসী শাড়ির রেশমী চমক। কালো বেণীতে জড়ানো শাদা ফুলের মালার দ্যুতি। জড়ি-ঝলমল নাগরা-পায়ের ক্ষীণ আওয়াজ। অনেক দৃষ্টি বিদায়ী-বালা রাখালক্ষ্মীর দিকে।

আমরা দুজনে রাস্তায় নেমে এলাম। আমি ও বেগম নাহার। রাজপথে তখন লোকনিয়ন্ত্রণ।

কি ব্যাপার? কি হচ্ছে ওদিকটায়?—একজনকে জিগ্যেস করলাম।

আজ গীর্জেতে এক অনুষ্ঠান। নতুন প্রধান ধর্মযাজকের আজ অভিষেক উৎসব।—উত্তর পেয়েই উৎসুক দৃষ্টি। তাকালাম একবার গীর্জের দিকে।

বিচিত্র পোশাক ধর্মযাজকদের। তাঁদেরই বিচিত্র মিছিল। নীরব শোভাযাত্রা রাজপথের দুপাশ জুড়ে। অসংখ্য লোক। সে লোকনিয়ন্ত্রণে ঘোড়সওয়ার পুলিশ। ঘোড়া ছুটিয়ে ছুটছে তারা এপাশ-ওপাশ। ঘাড় বাঁকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে ঘোড়া ছোটে। আত্মসম্ভ্রমে সজাগ তারা। পরের সম্ভ্রম হানিও সহজে ঘটায় না তারা। 'The horse is a noble animal'—সত্যি তাই।

ট্রাফিক বন্ধ। মিসেস্ মামুদের গাড়ি চাই। কোথায় জানি নেমন্তন্ন। কিন্তু এ অনুষ্ঠান কখন শেষ হবে কে জানে?

কথায় কথায় মিসেস্ মামুদের মুখে তাঁর দাদার কথা। মিঃ হবিবুল্লা বাহারের কথা। পাকিস্তানী রাজনীতির আগের যুগ। বাংলাদেশে প্রগতিশীল লেখক মহলে সাহিত্য-সমালোচক হিসেবে তখন জনাব বাহারের পরিচয়। বোধহয় একচল্লিশ কি বিয়াল্লিশ সাল। কোলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিট্যুটে প্রগতি লেখক সম্মেলনের অনুষ্ঠান। জনাব বাহার তার প্রেসিডিয়ামের অন্যতম। সে সময় তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। সে কথা জানালাম মিসেস্ মামুদকে। তাঁর কুশল জিগ্যেস করলাম।

সে উত্তর দিয়ে মিসেস্ মামুদ বল্লেন, ও কতোকাল শান্তিনিকেতনে যাইনি। বিশ্বভারতীর ভার তো এখন ভারত সরকারের। আশা করি ভালোই চলছে এখন বিশ্বভারতী।

একটু থেমে আবার বল্লেন, বুঝলেন, যদিও ঢাকায় থাকি তবু মন ঘুরে বেড়ায় কোলকাতায়। কতোকাল কাটিয়েছি সেখানে। কোলকাতার অনেক পরিচিত মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কিন্তু তাঁদের কাছে যেতে

না পারায় ভারি কষ্ট।—বলতে বলতে নাম করলেন ডাঃ নাগের, সীতাদেবী-শান্তাদেবীর আর নরেনদা-বৌদির।

আমারও ঠিক একই অবস্থা। থাকি বটে কোলকাতায়, কিন্তু জন্ম-গ্রাম আমার বজ্রযোগিনী। গোটা স্কুল-জীবনটাই কেটেছে সেখানে একটানা। ঢাকার কথা কি ভুলতে পারি? মন নিরালায় অনেক সময় অতীত স্মৃতির কিলিবিলি। চোখ বুজলে ঢাকার জন্মাষ্টমী মিছিলের ছোট চৌকি বড়ো চৌকির চুড়ো ঝিকমিক। কিন্তু সে সবই তো আজ বন্ধ!—বলতে বলতে পাজরকাঁপানো দীর্ঘ নিঃশ্বাসে আমার কণ্ঠরোধ।

হ্যাঁ, তা আজ বন্ধ বটে! সে জন্যে আমরাও দুঃখিত। আবার সে মিছিল চল্লে আমরাও খুশি হতাম।

তা আর হবে না। অন্তত সামনে তো আর সে সম্ভাবনা দেখছি না।

মাঝে মাঝে আমার কি একটা কথা মনে হয় জানেন?—বলেই আমার চোখের ওপর চোখ রাখলেন মিসেস্ মামুদ।

কি তা?—জিগ্যেস করলাম।

দেশটা ভাগ হয়েছিলো তো হয়েছিলো। আপোষে মীমাংসা। দুঃখ থাকতো না, সেই দেশ যদি সম্পূর্ণ বিদেশ না হয়ে যেতো। পাসপোর্ট-ভিসার দৌলতে বাঙলার দুভাগ আজ দুই বিদেশ। তাই দুর্ভোগ!

সত্যি কথা। তাই। পূর্ব বাঙলার শ্যামল ছায়ায় শ্যামলী আমার সোনার গ্রাম। এই সুদূর আমেরিকার চেয়েও আমার সে গ্রাম যেন আজ অনেক দূর!—আমার কথায় মিসেস্ মামুদ স্তব্ধবাক্। আমাদের দুজনেরই চোখ ছলছল। দুজনই ভুক্তভোগী যে!

মিছিল শেষ। ট্রাফিক চলাচল শুরু আবার। একখানা ক্যাবে চেপে বিদায় মিসেস্ মামুদ। আহা, ওঁর কি কোমল মন!

প্রাক্ মধ্যাহ্ন। লাঞ্চ টাইম এখনো দূরে। আরো এক ঘণ্টা সময় হাতে। কয়েকখানা চিঠি লেখা দরকার। নিউইয়র্ক থেকে দেশে পৌছ সংবাদ দিয়ে আর লিখিনি। সে সংবাদ যদি না পৌছে থাকে! আত্মজন বন্ধু-বান্ধবদের কম চিন্তা আমার জন্যে? আজ হয়তো হোটেলে ফিরে আমিও দেশের চিঠি পাবো। এমনি দূর-দূরান্তে দেশের দু লাইন চিঠি আনন্দসিন্ধু। কেউ না কেউ নিশ্চয় লিখবে। কতো আশা! তা পাই না পাই, আমি তো লিখি।

কিন্তু কোথায় ডাকঘর ? তিনদিন ধরে এতো ঘোরাঘুরি, পোস্ট-আফিসের পাত্তা নেই। কি আশ্চর্য !

রোড আইল্যাণ্ড ও কনেটিকাটের মোড়ে দাঁড়াই। নিকটতম ডাকঘর কোথায় জিগ্যেস করি একজনকে।

ঐ যে। আপনি ডাকঘরের খুবই কাছে।—ডানদিকে অংগুলি নির্দেশ। আমায় সাহায্য করে ভদ্রলোকের মুখে সন্তোষের হাসি।

দশ সেণ্টে এক-একখানা এয়ার লেটার। এয়ার মেলের খামে লিখি তো কম্‌সে কম কুড়ি সেণ্ট। বাড়তি ওজনে আরো বেশি টিকিট। সে অনুযায়ী বেশি দাম। তিনখানা এয়ারলেটার কিনে চিঠি লিখি। ডাকঘরেই লেখার সব রকম সাজসরঞ্জাম। কোনই অসুবিধে নেই। আসার সময় কিছু ডাক-টিকিট কিনে নিই। আরো কয়খানা এয়ার লেটারও। যখন মন চাইবে তখনি লিখবো। কোথায় গিয়ে আবার ঘোরাঘুরি করবো ? আমি কি জানতাম, হোটেলে হোটেলে, দোকানে দোকানে এদেশে ডাক-টিকিট বেচাকেনার রেওয়াজ !

এবার দূতাবাসে। সেও তো কাছাকাছি। এটুকু হাঁটা চলে। আকাশ মেঘ-মেঘ। রোদ ছায়া-ছায়া। তাতেই চলা সোজা। পথও মনে আঁকা।

পুরোনো দ্বারী দ্বারে। দেখেই হাসি-হাসি। নতুন জানাজানি। ভুলিনি কেউ কাকে।

খাওয়াটা আগে সারি। ক্যাণ্টিনও জানাশুনো। আজ ভুরিভোজ। পাওয়া যে চাওয়া-মাফিক !

ক্যাণ্টিন থেকে সোজা তেতলায়। আগে দেখা করার কথা শ্রীট্যাণ্ডনের সঙ্গে। সেখানে খানিক আলাপ। আমার নামে দরকারী কিছু বই পাঠানো হয়েছে হোটেলে। সে সংবাদে খুব খুশি। শ্রীট্যাণ্ডনকে ধন্যবাদ।

তারপরেই মিস্ ক্যাম্বেলের কাছে। আমার খবর তাঁর জানা। ট্যাণ্ডনই ফোনে জানিয়েছেন তাঁকে। প্রবীণ মহিলা মিস্ ক্যাম্বেল। কৃশকায়া। কিন্তু অত্যন্ত কর্মঠ। প্রতি কথায় তাঁর হাসি। কিন্তু কথার সঙ্গে সঙ্গে কাজ! নানা কাজের মধ্যেই কথার ঝাঁপি খুলে বসলেন তিনি। সেই সব পুরোনো কথা। পাঁচ-পাঁচজন ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের পার্সন্যাল অ্যাসিস্ট্যাণ্টের অভিজ্ঞতা তাঁর। ওয়াশিংটনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতাবাস সৃষ্টির শুরু থেকে আজ

অবধি সেই একই ধরনের একটানা কাজ। এ কি বড়ো সোজা ব্যাপার! কম গৌরব!

প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত শ্রী বি আর সেনের নাম করতে মিস্ ক্যাম্বেল তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অমন সুশৃঙ্খল কাজের মানুষ খুব কম দেখেছেন তিনি। ভালো লাগলো শুনে। শ্রীমেহতার কথা উঠলো। অনেক কথা। তুষারবাবুর ব্যক্তিগত চিঠিখানা দিলাম মেহতার নামের। তাঁর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেণ্ট ঠিক করতে অনুরোধ জানালাম মিস্ ক্যাম্বেলকে।

নিশ্চয়ই করবো। তারিখ ও সময় ঠিক করে আপনাকে জানিয়ে দেবো সঙ্গে সঙ্গে।—বলেই আমার ওয়াশিংটনের ঠিকানা নোট করে রাখলেন মিস্ ক্যাম্বেল।

সেখান থেকে শ্রীচন্দের ঘরে একতলায়। দূতাবাসের অর্থভাণ্ডারের অধিকর্তা শ্রীচন্দ। অতি সজ্জন, সদালাপী। আজ মাত্র প্রাথমিক পরিচয়। তারপর বারবার আলাপ। গভীর হৃদ্যতা।

এখন ফিরে চলি আপন ঘরে। হঠাৎ রোদচাপা মেঘ ঘোর-কালো! এ মেঘদূত কোন্ দেশের? সারা শহরময় মেঘমায়া। ধূসর ছায়ায় লোক ছুট-ছুট। আমিও ছুটি ক্যাব নিয়ে। ইন্দ্রধনু আকাশ-গায়। হৃদয় হারাই তার পিছে।

তখন বিকেল বিকেল। হোটেল নিঝুম। নিঃসংগ অবকাশে ঘর ভারি। গুনগুন গান মনভোলা। কি আর করি?

শুক্রবার। সেণ্টারে আজ সকাল সকাল। সভা বসার আগেই একটু আলাপ-সালাপের গরজ। তা হলো। কয়েকজন নতুন নতুন বন্ধুর সঙ্গে গল্পসল্প। ভাষার দেওয়াল ভেংগে সবার সঙ্গে কথা কই, সে দুঃসাধ্য। তবু সবার পরিচয় লাভে সকলেরই মধ্যে একটা নিবিড় আকুলতা। সে আকুলতার গভীর আকর্ষণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও অলস আতংক মনে মনে। অন্যভাষীকে কি করে বোঝানো যায় আপন কথা, সে শংকা-সংকোচ।

তারই মধ্যে অন্তরে অন্তরে ছোঁয়া-ছুঁয়ি। বেশ ভাব জমলো চিলির এক ইঞ্জিনীয়ার পরিবারের সঙ্গে। স্যাণ্টিয়াগোর মিঃ ও মিসেস্ ইউজিনিও ডিয়াজ। সঙ্গে তাঁদের ছোট্ট ছেলে। ফুটফুটে। ডিয়াজ দম্পতির একমাত্র সন্তান। বছর ছয়-সাত বয়েস। তাকেই আদর করছিলাম সেণ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে।

ততোক্ষণে আমার প্রজাপতি মন কোলকাতায়। আমার বাড়িতে। আমার ছোট ছেলে কৌশিকের কাছে। তারও যে প্রায় একই বয়েস!

দুটি পিতৃ-হৃদয়ে জানাজানি। আলাপ জুড়লেন মিঃ ডিয়াজ। আমার পরিচয় নিলেন খুঁটে খুঁটে। পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে। কিন্তু খুবই কষ্টে। ভাষা তাঁর স্পেনিশ। ভাংগা ভাংগা ইংরেজি আয়ত্ত করেছেন কোন রকমে। তাতেই সব প্রশ্নোত্তর। তা হলেও অন্তরের একটি ভাষা তো পৃথিবীর সর্বত্র এক। সেখানে ভাষা-বিরোধ নেই। সে যে অনুভূতির ভাষা। সে ভাষাতেই তিনি বুঝেছিলেন আমার অন্তরকে।

আর এক বিদেশিনীর সঙ্গে হঠাৎ আলাপ। একখানা কার্ড আমার হাতে তুলে দিয়ে কথা-বিন্যাস। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণবাসিনী তিনি। নাম মিসেস্ হ্যাজেল ফ্রিজ। ওয়ার্লড ফ্রেণ্ডশিপ হাউজ নামে একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালিকা। ও প্রতিষ্ঠানই তাঁর দিনের চিন্তা, রাত-স্বপন। খানিকক্ষণ কথাবার্তার পরই তাঁর শহর পরিদর্শনে আমার আমন্ত্রণ। শুধু আমন্ত্রণ নয়, শেষ পর্যন্ত রীতিমতো পীড়াপীড়ি। তাঁর 'বিশ্ববন্ধু নিকেতন' দেখানোর শখ।

সারা আমেরিকা আপনি ঘুরে বেড়াবেন, আর আমাদের অস্টিন শহরে যদি না যান তা হলে খুবই দুঃখিত হবো।—এই বলে মিসেস্ ফ্রিজের মুখ বেজার।

দক্ষিণে তো আমি যাবোই। টেক্সাসের কতোগুলো জায়গায়ও যাবার ইচ্ছে। সে রাজ্যের রাজধানী অস্টিন। তা বাদ না পড়ারই কথা।—এ আশ্বাসে আশ্বস্ত প্রবীণা মহিলা।

এমনি ভাবেই আরো কয়জনের সঙ্গে কথাবার্তা। তারপর সভা। গুরুগম্ভীর আলোচনা। আমেরিকায় নাগরিক অধিকার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা। এই আজকের আলোচ্য বিষয়। দেড় ঘণ্টা ধরে একটানা বক্তৃতার একঘেয়েমি। চোখে চোখে অস্থিরতা। যাই হোক তবু রক্ষে, একটু বাদেই সভা ভংগ।

শ্রীমতী রাধালক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা। কালকের পরিচয়। কাল যা কুঁড়ি, আজ কমল। সামান্যর সানন্দ বিকাশ।

কোথায় খান আপনি?

ঠিক নেই কিছু। যখন যেখানে সুবিধে।

চলুন না শলস্ কাফেটেরিয়ায়। বেশ ভালো ব্যবস্থা। সুন্দর পরিবেশ।

তাই চলুন। কথায় কথায় পদযাত্রা। সেদিন রাধালক্ষ্মী কমলাবতী। কমলা রঙএর বেনারসী পরনে। নতুন পাদুকা। কপালে টিপ। চোখে কাজল। ভারি সুন্দর লাগছিলো তাঁকে দেখতে।

ভারতীয় শাড়ির খুব ইজ্জত আমেরিকায়। সে কদরের আরো বাড়তি এমনি সব ভারত-কন্যাদের কল্যাণে। যেমনি রুচিমাধুর্য, তেমনি শোভন শালীনতা।

কনেটিকাট অ্যাভিন্যুর ওপরেই শলস্ কাফেটেরিয়া। শুভ্র স্বচ্ছন্দ বাইরেকার রূপ। আভ্যন্তরীণ আভিজাত্য মধ্যবিত্তিক। কাফেটেরিয়া আসলে মধ্যবিত্তেরই আহারঘর। তারই মধ্যে পারিপাট্যের প্রতিযোগিতায় শলস্ সেরা।

লাইনের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যাই। দেয়ালজোড়া আয়নায় সে লাইনের প্রতিচ্ছবি। সে ছবির অনেকেই যেন জানা জানা। নতুন সব চেনা-চেনা মুখ। ঐ যে আমাদের মিসেস্ মামুদ! আজ দেখিনি তো সেণ্টারে!

সামনে একটি টেবিল। সাজানো ট্রে, কাঁটা-চামচ আর সব সাজ-সরঞ্জাম। এক-এক করে তুলে নিয়ে আরো এগুই। লম্বা-চওড়া 'গ্লাস কেসে' নানা রকমের খাবার পর পর। ওপরে ওপরে দর লেখা। দেখে-শুনে নাও প্রাণ যা চায়। মনের পাতায় যোগ বিয়োগ। হিসেব কষো।

ফল দিয়ে শুরু। বাতাবি, খরমুজার ছড়াছড়ি। খরমুজা নিই। লাল টুকটুক একফালি। একবাটি স্যুপ। গলদা চিংড়ি কি সুন্দর! রান্নাও যেন মালাইকারি। দাম চড়া। আড়াই ডলার। আজ এ থাক। ছোট চিংড়িই বা মন্দ কি? এই যে ভাত! বাঃ! কিছু মিষ্টি। তারপরে দুধ। এই তো বেশ।

এদেশে দুপুরের খাওয়া সাধারণত হাল্কা মতো। কোন একটা স্যুপ, স্যাণ্ডুইচ বা রুটি, কিছু আলু সেদ্ধ বা অন্য কোন ভেজিটেবল আর মাছ বা মাংস। ভেজিটেবলের দিকে আমেরিকানদের যেন একটু বেশি ঝোঁক। সবশেষে দুধের প্যাককরা বোতলের দিকে অনেকেরই আকর্ষণ। ফল বা ফলের রসের গ্লাসও প্রায় সব টেবিলে টেবিলে।

আমাদের হাতে একটি করে নম্বর দিলেন ওয়েট্রেস। এক টেবিলেই খেলাম আমরা। আমি আর শ্রীমতী রাধালক্ষ্মী। কথায় কথায় জানা গেলো রাধালক্ষ্মীর

অনেক কথা। অল ইণ্ডিয়া ইন্সটিট্যুট অব হাইজিন অ্যাণ্ড পাব্লিক হেলথ-এর তিনি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট প্রফেসর। এদেশে এসেছেন বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ব্যবস্থাপনায়। সপ্তাহাধিককাল আছেন রাজধানীতে। ওয়াই ডবলিউ সি এ ভবনে সাময়িক আস্তানা। এখান থেকে বিদায় আসন্ন। উচ্চতর শিক্ষা শুরু হবে তাঁর বোস্টনের পাব্লিক হেলথ্ স্কুল থেকে।

খাওয়া শেষ। দুধ ঠাণ্ডা। কাঁচা দুধ। বিনে চিনিতে তাই খাওয়াই চল্‌রীতি। সুস্বাদু।

টিকিট নিয়ে যাই কাউণ্টারে। নম্বর দিতেই বিল হাতে। দেড় ডলারের মধ্যেই বেশ খাওয়া। টিপস্-এরও কোন নেই বালাই। এও এক সুবিধে কাফেটেরিয়ায়।

আবার চলি সেণ্টারে। অনেকেই হাজির। দুখানা বাসও প্রস্তুত। আমাদের নিয়ে নগর পরিক্রমা। সকলেরই আগ্রহ ভালো করে শহর ঘুরে দেখার। ভালো সুযোগ আর কি হবে এর চেয়ে?

দেশী বিদেশী অনেক যাত্রী। আমরা চব্বিশ জন যাত্রী এক বাসে। আমাদের গাইড মিঃ রবার্ট বি ন্যাপ। ইণ্টারন্যাশন্যাল সেণ্টারের তিনি অন্যতম প্রধান। সেণ্টার লাইব্রেরির পরিচালক। সৌম্য শান্ত মিষ্টভাষী।

দুপুরের রোদ কেটে কেটে বাস চলে। নতুন নতুন পথ পরিচয়। সিক্সটিন্থ স্ট্রীট অভিজাত অঞ্চল। বনেদী ধনীদের বসবাস এ এলাকায়। রাস্তা ফুটফুটে। এ পথেই জিওগ্রাফিক্যাল ইন্সটিট্যুট। এমনি আরো সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের সেরা সেরা প্রতিষ্ঠান। সে সব পার হয়ে হাজির আমরা দূতাবাস এলাকায়। লোক-বিরল একটি শহর-কোণ। ন্যাপের বর্ণনায় নানান্ দূতাবাসের পরিচয় লাভ।

এ পাড়া নীরব নিঝুম। সুখী শৌখীন। বাগ-বাগিচায় ঘেরা ঘেরা এক-একটি দূতাবাস। পথের এধারে ওধারে রূপসজ্জার রেষারেষি। বাইরে স্বপ্নময়তার সুখ-প্রলেপ। ভেতরে কূটনীতির ছলা-কলা। সুরম্যতায় ব্রিটিশ দূতাবাস অতুলনীয়। ঐশ্বর্য-বিলাসে আজো যে তার নেই জুরি। তবুও কেমন যেন জলুষে ভাটা। স্তিমিত-তেজ এখানে ব্রিটিশ সিংহ। এ যেন নেহাত নিছক ভবনশোভা? কেমন তোয়াজে সশংক ভাব। এ তো কিছুটা হতেই হবে। এ যে আমেরিকা। আজ ব্রিটেনের মুরুব্বি-দেশ!

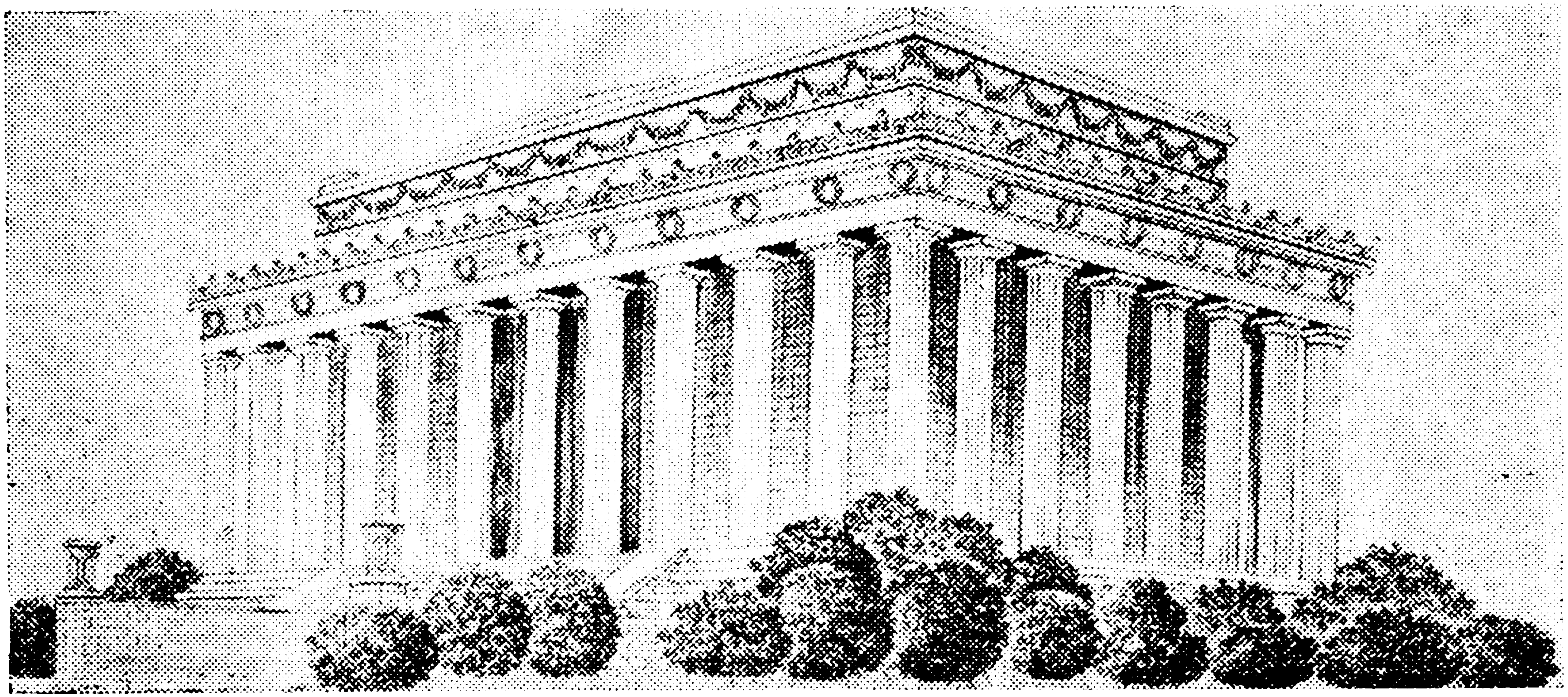

রাজধানী ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট লিংকনের স্মৃতিসৌধ

এলাম লিংকনের সমাধি-মন্দিরে। একটি অপূর্ব মর্মরগৃহ। চতুষ্কোণ শ্বেতসৌধ। হেনরী বেকন পরিকল্পিত এ মন্দির। মার্কিন কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত। ১৯২২ সালে সর্বসাধারণের জন্যে সর্বপ্রথম দ্বার উন্মোচন। অনেকটা গ্রীক ধরন। দীর্ঘ সোপানমঞ্চ। অনেক সিঁড়ি। সামনে স্তম্ভ-সারি। মোট ছত্রিশ। তখন আমেরিকায় ছত্রিশ রাজ্য। এক-একটি স্তম্ভ এক-এক রাজ্য-প্রতীক। এখন যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্য-সংখ্যা আটচল্লিশ। লিংকন-মন্দিরে আটচল্লিশটি তোরণ-মাল্য তাদের শ্রদ্ধা-চিহ্ন। কী সুন্দর!

In this temple as in the hearts of the people for whom he saved the Union the memory of Abraham Lincoln is enshrined here.—মন্দির-গায়ে এই লেখা।

হ্যাঁ, আব্রাহাম লিংকনের স্মৃতি উজ্জ্বল। চির ভাস্বর সে স্মৃতি। শুধু আমেরিকানদের হৃদয়েই নয়। বিশ্ব-মানবের মনোমন্দিরে। গণতন্ত্রের উপাসকদের বুকের পাঁজরে পাঁজরে। এই মন্দিরে, এই সমাধি-মন্দিরে তারই বহিঃপ্রকাশ।

ভারি চমৎকার লিংকনের মূর্তিটি। সুউচ্চ মঞ্চে উপবিষ্ট পূর্ণাবয়ব মর্মরমূর্তি। ওয়াশিংটন মনুমেণ্টের বরাবর করে বসানো। যেন জীবন্ত। যেন চেয়ে আছেন। সে দৃষ্টিতে কতো চিন্তা! যেন গুণগ্রাহীদের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য গ্রহণ করছেন সঙ্গে সঙ্গে। অনবদ্য ভাস্কর্য। শুধু বিরাটত্বের জন্যে নয়, এ মূর্তিতে আমেরিকার শহীদ-সভাপতির মানব-দরদ সপ্রকাশ। ভাস্কর ড্যানিয়েল চেস্টার ফ্রেঞ্চকে তাই স্মরণ করি।

পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন। আমার হাতের গোলাপটি পাদমূলে রেখে দেখছিলাম মহামানব লিংকনের মূর্তিরূপ।

মূল মন্দির-কক্ষের গায়ে গায়ে, উত্তর-দক্ষিণের দুটি হলে লিংকনের বাণী খোদাই। বিখ্যাত গেটিসবার্গ বক্তৃতার নানা অংশ। তাঁর দ্বিতীয় অভিষেক ভাষণের নানা কথা। গৃহযুদ্ধ-শেষে শহীদদের উদ্দেশ্যে লিংকনের শ্রদ্ধা-ভাষণ অবিস্মরণীয়। সে সব পড়ি। ইতিহাসের মহাসমুদ্রে অবগাহন।

কতো কথা, কতো গাথার ভিড় মনে। এই লিংকন—আমেরিকার ষোড়শ প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিংকনই একদিন বলেছিলেন: যে ব্যবস্থায় অর্ধেক মানুষ স্বাধীন আর অর্ধেক ক্রীতদাস সে ব্যবস্থা আমরা চাইনে। সে তন্ত্রের, সে নিয়মের নাম আর যাই হোক, তা গণতন্ত্র নয়।

মহামতি লিংকনই ঘোষণা করেছিলেন : Our reliance is in the love of liberty which God has planted in us. Our defence is in the spirit which prized liberty as the heritage of all men, in all lands, everywhere. Destroy this spirit and you have planted the seeds of despotism at your own doors.

আমেরিকা! হায় আমেরিকা! আজ তুমি কোথায়? কোন্ পথে? সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধোন্মাদেরা কেন আজ তোমায় ঘিরে? কেনই বা তুমি তাদের সহায়? শতাব্দীপূর্বে লিংকন-ঘোষিত সব অমর বাণী। মানব স্বাধীনতার অমৃতবাণী। তা আর কি ধ্বনিত হয় না তোমার কানে?

মনে একটা কিসের জ্বালা। হঠাৎ মিঃ স্ন্যাপের ডাক।—এবার যেতে হবে মিঃ বোস। আসুন।

ওঃ, হ্যাঁ—সমাধি-মন্দির থেকে বেরিয়ে আসি। পা দুটো যেন অবশ অবশ। মনের প্রতিক্রিয়া।

সামনে সরোবর। জল টলটল। ঐ জলে থরথর সৌধ-ছায়া। নীল যমুনায় তাজমহলের জলকেলি যেন। তার ছবিরূপ কল্পনায়।

আবার দৌড়। এবার লক্ষ্য হাওয়ার্ড ইউনিভার্সিটি। খানিক গিয়েই নিগ্রো এলাকা। মিঃ স্ন্যাপের মুখে নিগ্রো দুঃখের নানা কাহিনী। তাদের অতীত বর্তমানের নানা কথা।

লিংকনের স্মৃতি-মন্দির থেকে ফিরছি। নিগ্রোদের দাসত্ব-মুক্তির সঙ্গে জড়িত সে পুণ্য নাম। ১৮৬২ সন। ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়ায় দাসপ্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা। সামরিক বাহিনীতে যোগদানে নিগ্রোদের অধিকার লাভ। ধীরে ধীরে আরও অনেক সুযোগ-সুবিধা। সবেরই মূল প্রেরণার জোগানদার লিংকন।

মুক্তিদাতা লিংকনের কাছে অন্তরশ্রদ্ধা জানাতে আসে নিগ্রোদল। নতজানু তারা। কিন্তু মানুষের কাছে মানুষ কেন মাথা নোয়াবে? তাই মাথা উঁচু রাখার শিক্ষা দিলেন লিংকন—Do not kneel to me. Kneel to God only, and thank Him for liberty.

দাসপ্রথা তো নিষিদ্ধ। কিন্তু নিগ্রোদের দুঃখের অবসান কই? এমন কি রাজধানী ওয়াশিংটনেও নয়। বর্ণ বৈষম্যে মানুষের অবমাননা। তার সে যে

কী প্রচণ্ড দাহ! অশিক্ষা অগ্রগতির আসল অন্তরায়। সে বাধা দূরীকরণের চেষ্টা অনেক দিনের। চলতি বাসে বসে সে সব শুনি।

১৯০৭ সন। শিক্ষায় তিনজন মুক্ত নিগ্রোর অসীম শখ। তারা নিরক্ষর। কিন্তু তাদের ছেলে-মেয়েদের জন্যে চাই স্কুল। একজন শ্বেতাংগ শিক্ষকের সাহায্যে তারা সফল। রাজধানীতে নিগ্রো স্কুলের প্রতিষ্ঠা সেই প্রথম। সাতাশ বছর পর দ্বিতীয় নিগ্রো বিদ্যালয়ের পত্তন। একজন মুচির ছেলের সে কীর্তি। জন এফ কুক সেই প্রখ্যাত নাম।

মুক্ত নিগ্রোদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার। শ্বেতাংগদের দানও অবশ্য কম নয় তাতে। তখন তেমন শ্বেতাংগের সংখ্যা কম। তাঁরা সহৃদয়। মানবধর্মে বিশ্বাসী তাঁরা। কিন্তু তাঁদের কাজে অনেক বাধা। বহু বিঘ্নিত বন্ধুর পথ।

মিরটিলা মাইনারের সে কী উদ্যম! কালো বলে নিগ্রোরা অপরাধী? সে জন্যে তারা বঞ্চিত থাকবে শিক্ষার আলোক থেকে? তা হতেই পারে না। তাদের জন্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় শ্বেতাংগিনী মিরটিলার ছুটোছুটি। তাঁর চেষ্টায় সর্বত্র বাধা। শেষ পর্যন্ত শহরের বুকেই কিছু জমি ক্রয়ে তাঁর সাফল্য। কয়েকজন শ্বেতাংগ মহানুভবের দানে তৈরি হলো বিদ্যালয়-ভবন। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের জঘন্য চক্রান্তে সর্বনাশ। অগ্নি-সংযোগে সে বাড়ি বিধ্বস্ত!

কুমারী মাইনার বেপরোয়া। স্কুল-প্রাংগণে শুরু তাঁর পিস্তল শিক্ষার কুচকাওয়াজ। দুষ্কৃতিকারীরা সাবধান!

আবার সে বাড়ি উঠলো। স্কুল বসলো। সে স্কুলে শিক্ষার আলো পেয়ে লক্ষ কালো মানুষের হৃদয় আলো। সাবাস মেয়ে মিস্ মাইনার!

নিগ্রোরা বড়ো অপরাধপ্রবণ। এমনি অভিযোগের অন্ত নেই। কিন্তু তার জন্যে দায়ী তাঁরাই, যাঁরা অভিযোগ করেন। উপেক্ষারই এই প্রতিফল। অশিক্ষার প্রশ্রয়ে যতো অনাচার। শিক্ষার প্রসারে তার হ্রাস। হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তাতে বিপুল দান। আমরা সে বিদ্যা-তীর্থদর্শনে যাত্রীদল।

দূর দক্ষিণের নিগ্রোদের দুঃখ অনেক বেশি। দাসপ্রথার শুরু থেকেই তা অন্তহীন। তুলনাহীন সে নির্যাতন। তাই বলে উত্তরাঞ্চলের কালো মানুষেরই কি বড়ো কম দুর্ভোগ?

সেকালের জাঁদরেল দাস-ব্যবসায়ী জন রানডল্‌ফ। তাঁর প্রাণও একদিন কেঁদে উঠেছিলো নিগ্রোব্যথায়। এ রাজধানীরই কলংক-গাথা তাঁর কথায়।

হায় স্বাধীনতার জন্মভূমি! ওয়াশিংটন, তোমার এই রূপ! ইয়োরোপীয় স্বৈরতন্ত্রও হার মানে। ভয়-ভীতিতে মুখ লুকোয় এখানকার নৃশংসতায়। এমনি বীভৎস দাসব্যবসা এই পৃথিবীর আর কোথায়? আফ্রিকায়ও নয়। অথচ স্বাধীনতার কতো গর্ব এ রাজধানীর! মানুষের স্বাধীনতার এই নমুনা?

জন রানডলফ্-এরই এ স্বীকৃতি। এ আফশোস। অবশ্য এ অনেককাল আগের কথা। তা হলেও সে পুরোনো কলংক থেকে আজো তো পূর্ণ মুক্ত নয় ওয়াশিংটন। এমন কি সুপ্রীম কোর্টের বিখ্যাত রায়ের পরেও নয়। এ সত্যি লজ্জার। এ অগৌরবের।

অথচ এ রাজধানী পত্তনে নিগ্রোদেরও বিরাট দান। বিশেষ করে বেঞ্জামিন বেনেকারের নাম স্মরণীয়। ওয়াশিংটন ডি সির জন্ম-যুগ। নগর পরিকল্পনা কমিশনের অন্যতম সদস্য বেঞ্জামিন। রাজধানী স্রষ্টা মেজর লে ফ্যাঁর প্রধান সহযোগী। বিখ্যাত নিগ্রো গণিতবিদ্ তিনি। তাঁরই গড়া নগরভূমিতে তাঁর বংশধরদের নিগ্রহ! সে কি কম দুঃখের!

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে অবস্থারও। নিগ্রোদের দুঃখের বহু লাঘব। তবু আজ অবধি বর্ণভিত্তিক বাস-এলাকা। রাজধানীতেও তার ব্যতিক্রম নেই। উন্নত শ্বেতাংগ অঞ্চলে ধনী নিগ্রোরও জমি পাওয়া একরূপ অসম্ভব। পেলেও সেখানে বাড়ি করে বাস করতে গেলে বিপর্যয়ের আশংকা। পদে পদে প্রতিবেশীদের নির্মম বিরূপতা। শ্বেতাংগরা এ ব্যাপারে এককাট্টা।

অর্থ-কৌলীন্যের না হয় অর্থ বুঝি। কিন্তু বর্ণ-কৌলীন্যের এ কী বীভৎস বিভীষিকা! মিঃ ন্যাপের মুখে এসব শুনে মন বিহ্বল।

রাজধানীর উপেক্ষিত অঞ্চল। প্রায় উপকণ্ঠ। আমরা এখন নিগ্রো বসতির মাঝখানে। মূল নগরীর চাকচিক্য এখানে অবর্তমান। পার্থক্যটা চট করেই চোখে পড়ে।

ওয়াশিংটনের এ একটি 'স্লাম এরিয়া'।—ন্যাপের ঘোষণা মাইক মুখে।

'স্লাম' সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অন্যরূপ। কোলকাতার বস্তীর মতো এ নরক নয়। এখানে সবই পাকা দালান। রেডিও প্রায় ঘরে ঘরে। অনাহার কান্না নেই। নিয়ম-শৃঙ্খলা কিছু শিথিল। রাজপথেও শিশু-খেলা। এ অবেলায় এ আশ্চর্য। দেখিনি তা আর কোথাও। সাজ-পোশাকেও কিছু দারিদ্র্য ছাপ।

রাজধানীতে মোট জনসংখ্যা প্রায় তেইশ লক্ষ। নিগ্রো সাড়ে ত্রিশ হাজারের কিছু বেশি। এ সামান্য সংখ্যাকে পৃথক করে রাখার মনোবৃত্তি কেন?

ঘুরতে ঘুরতে এবার সিক্সথ্ স্ট্রীটে। নর্থ-ওয়েস্টই বটে, তবে ওয়াশিংটন ছয় থেকে একেবারে ওয়াশিংটন একে। তা হলেও ক্যাপিটল থেকে দূর নয় খুব। মাত্র মাইল তিনেক। হাওয়ার্ড হিলে হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। বে-সরকারী পরিচালনাধীন নিগ্রো ইউনিভার্সিটি। সরকারী না হলেও সরকারী সাহায্যপুষ্ট। মোটা সাহায্য আসে ফেডারেল গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে।

১৮৬৭ সালে হাওয়ার্ড ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠা। মেজর জেনারেল অলিভার ওটিস হাওয়ার্ড। আমেরিকার গৃহযুদ্ধকালে কেন্দ্রীয় অর্থভাণ্ডারের অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি। এ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁরই আন্দোলনের সার্থকরূপ। তাই তাঁর নামে নামাংকিত এ বিদ্যায়তন।

প্রেসিডেণ্ট সহ মোট চব্বিশজন সদস্য নিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাষ্ট্রি বোর্ড। আটজন করে এই সদস্যদের তিনটি বিভাগ। এক-এক বছর এক-একটি বিভাগের নির্বাচন তিন বছরের জন্যে। প্রেসিডেণ্টই এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান। ভাইসচ্যান্সেলার বলে কিছু নেই আমাদের দেশের মতো।

হাওয়ার্ড ইউনিভার্সিটিতে সহ-শিক্ষা। প্রধানত নিগ্রো ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে হলেও শ্বেতাংগদের শিক্ষালাভে বাধা নেই এখানে। কয়েকজন শ্বেতাংগ চোখেও পড়লো। মোট শিক্ষার্থী-সংখ্যা প্রায় চার হাজার। সে তুলনায় শ্বেতাংগ-সংখ্যা নগণ্য। ছাত্রীরা ছাত্রসংখ্যার অর্ধেকের কিছু বেশি। বিদেশী ছাত্রও বড়ো কম নয় এখানে। প্রায় তিনশোর মতো। জন চৌদ্দ-পনেরো ভারতীয় ছাত্র তার মধ্যে। আমার প্রশ্নোত্তরে গাইডের মুখে একটি আনুমানিক সংখ্যার উল্লেখ।

সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের ঘোরাঘুরি। নানা বিভাগ ঘুরে দেখে জ্ঞান সঞ্চয়।

নিগ্রোরা নাকি নোংরা! তারা উচ্ছৃঙ্খল! তাদের বিরুদ্ধে আরো কতো অভিযোগ। কিন্তু শিক্ষার আলোকে এখানে নেই তার বালাই। সর্বত্র একটা সারস্বত শুভ্রতা। ছাত্রছাত্রীদের সবিনয় ব্যবহার।

লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখি এখানে ওখানে সব নিবিষ্টমন তরুণ-তরুণী। কেউ পড়ছে, কেউ লিখছে। যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। টু শব্দটি নেই কোথাও।

খবর নিয়ে জানলাম, তিন লক্ষাধিক বই সেখানে। আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রায় অর্ধেক। অবশ্য তার মধ্যে ছয় হাজারের মতো সরকারী দলিলপত্র। তাও কি কম জরুরী? বেশ পরিবেশ।

প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় ভবন থেকে নেমে আসি। অদূরে স্কুল অব মেডিসিন বিল্ডিং। মাঝখানে ফ্রিডম্যান হাসপাতালের গ্রাউণ্ড। সেখান থেকে সবুজ ঘাসের হাতছানি। অন্তর-ছোঁয়া সে আমন্ত্রণে প্রাণ আকুল। তা প্রত্যাখ্যানের উপায় নেই। সে মাঠে দাঁড়িয়ে গ্রুপ ফটো তোলার তোড়জোড়। রোদ ঝিকমিক। আমরা দাঁড়াই দলবেঁধে। ক্লিক্, ক্লিক্, ক্লিক্। একের পর এক অনেক স্ন্যাপ। আলোকচিত্র স্মৃতির পট। বন্দী মুহূর্তদের বন্দনা।

এখান থেকে এবার কোন্ দিকে?

আবার সেই পুরোনো পথে।

ঐ তো লিংকন মেমোরিয়াল। তারই পশ্চাতে আরলিংটন ব্রীজ। এক কোটি ডলারের মনোরম সেতুপথ। আমরা সেখানে।

সেই পুল পেরোই। পটোম্যাক পারাপার। এপারে ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়া আর ওপারে ভার্জিনিয়া স্টেট। আমেরিকার আদি ইতিহাস জড়িত এই ভার্জিনিয়া স্টেট নামের সঙ্গে। ঠিক সাড়ে তিনশ বছর আগের কথা। ব্রিটেনের বিখ্যাত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভার্জিনিয়া কোম্পানী। অতলান্তিকের অপর পারে স্বর্ণসন্ধান ও উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার তাঁরা উদ্যোগী। রাজা প্রথম জর্জের হুকুম-নামা সংগ্রহ। সে হুকুমনামা নিয়ে প্রথম ব্রিটিশ অভিযাত্রী দলের অতলান্তিক অতিক্রম। দলের লোকসংখ্যা একশ পাঁচ জন। অজ্ঞাত এক নদীর তীরে তাঁদের উপস্থিতি। কি নাম দেওয়া যায় সেই নদীর? তাঁদের রাজার নামেই নাম হোক তার। তাঁদের বসতির নামও জেমস নদীর তীরে জেমস্ টাউন। ক্রমেই বেড়ে চলে তাঁদের অধিকৃত অঞ্চল। ১৬০৭ সনে নতুন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত প্রথম ব্রিটিশ উপনিবেশ। ব্রিটিশ বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান ভার্জিনিয়া কোম্পানীর নাম থেকে এ উপনিবেশের নামকরণ ভার্জিনিয়া স্টেট। আসল আমেরিকার গোড়াপত্তন এই থেকে। আমাদের দেশে তখন সম্রাট জাহাংগীরের যুগ। পৃথিবীর দীর্ঘতম সংকোচন-সেতুসমূহের অন্যতম ওয়াশিংটন-ভার্জিনিয়ার যোগসূত্র এই আর্লিংটন পুল। দৈর্ঘ্যে দু হাজার দেড়শো ফুট, প্রস্থে নব্বুই। সংকোচন সম্প্রসারণে পাঁচ মিনিট। বাস-চলতি

মনের কিনারে স্মৃতি-নজর। অনেকটা যেন পুরোনো কালের হাওড়া পুল।

মাউণ্ট ভার্ননের যাত্রী আমরা। জর্জ ওয়াশিংটনের স্মৃতিতীর্থ মাউণ্ট ভার্নন। তাঁর পল্লী-ভবন। একটানা পথ। মাউণ্ট ভার্নন সড়ক ধরে সোজাসুজি। একটি অনুপম সড়ক। পটোম্যাক নদীর পাশাপাশি। যেন দুই বন্ধু। জলপথ আর স্থলপথ। মাউণ্ট ভার্নন সড়কের বুকেই আর্লিংটন সেতুর আত্মসমর্পণ। সে পথে পড়েই আমাদের বাসের দুরন্ত গতি। বাস নয় যেন হাওয়াই জাহাজ।

হাওয়া গমগম। ক্রমেই যেন বাতাস ভারি। গা শিরশির। কী ব্যাপার? বাড়িঘর নেই, বাগান আর বাগান। পাহাড়ী বনে ধূসর ঢেউ। শান্ত ছায়া। মন্থরগতি বাস এখন।

আমরা এবার জাতীয় সমাধিক্ষেত্র আর্লিংটনের দিকে।—মাইক মুখর। সবিস্তার বর্ণনা শুনি কান পেতে।

আমেরিকার সবসেরা জাতীয় সমাধিক্ষেত্র আর্লিংটন। চার শতাধিক একর জমি জুড়ে তার বিস্তৃতি। অর্ধবৃত্তাকার। ভার্জিনিয়া পাহাড় গায়ে ঘুমপুরী। জীবনসমুদ্রে তরংগমালার শেষ রেখা। চির ঘুমন্তের শয্যালোক। এখানে তো জানি সব সমান। বাইরে তবুও সাম্য নেই। স্মৃতিমঞ্চ সংখ্যাহীন। বড়ো-ছোটর ব্যবধানে চোখপীড়া। কোথাও শুধু সবুজ ঘাসের আস্তরণ। নানা রঙের ফুল ছড়ানো তার বুকে।

পাঁচ লক্ষাধিক লোকের সমাধি আর্লিংটনে। এ অঞ্চলের প্রথম দখল ১৮৬১ সনে। কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব। হাসপাতালে মৃত একজন সাধারণতন্ত্রী বন্দীকে প্রথম সমাহিত করা হয় এখানে তিন বছর পর। সেই থেকে ক্রমে এর এই জাতীয় রূপ।

কতো সৈন্য সেনাপতির রণহুংকার স্তব্ধ এই আর্লিংটনে। কতো গুরুগম্ভীর অফিসারের নীরব বিশ্রাম। এখানে শাদা-কালো সমস্যারও অনেক সমাধান। সমাধিক্ষেত্রের পুরোনো অংশের কথাই বলি। সেখানে পাঁচ হাজারেরও বেশি কবর। তার মধ্যে চিরসুপ্ত নিগ্রো প্রায় চার হাজার। তাঁরাও যোদ্ধা। আমেরিকার মুক্তি-সংগ্রামের বীর সেনা। তাঁরা স্মরণীয়।

একটু এগিয়ে আসতেই দেখি লোকের ভিড়। আমরাও নামি বাস থেকে। সৈন্যসামন্তের আনাগোনা। কুচকাওয়াজের উদ্যোগ নাকি?

না, তা নয়। এখানে এক স্মরণ-অনুষ্ঠান। অজ্ঞাত শহীদ সৈনিকদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদনের আয়োজন। সামনেই অজ্ঞাত-শহীদবেদী। তা ঘিরে বিপুল লোকসমাবেশ। আমরাও সেখানে।

নির্বাক দর্শকদল। কেমন একটা থমথমে ভাব। গাছের পাতায় মৃদু বাতাস। সে বাতাস কেমন যেন লঘু কান্না। কান্না নয়। কিসের জন্যে কাঁদবে কে? বীরের মৃত্যু নেই। তাঁদের আত্মদান মরণ-মহিমা। তারই বন্দনায় মিহি হাওয়া।

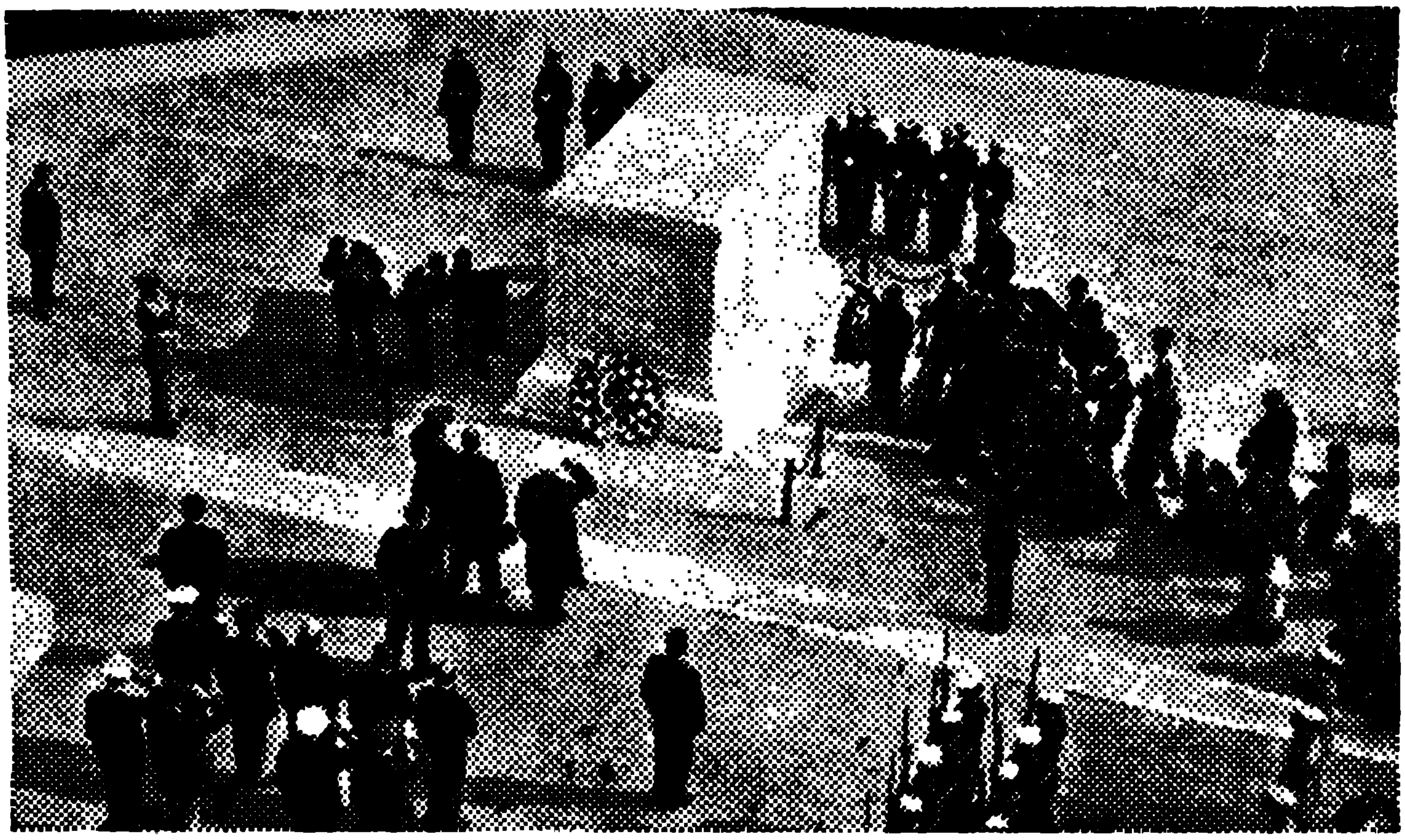

আমেরিকার সবসেরা জাতীয় সমাধিক্ষেত্র আর্লিংটন। অজ্ঞাত শহীদ-স্তম্ভে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণের একটি দৃশ্য।

হঠাৎ এক সৈন্যাধ্যক্ষের উপস্থিতি সদলবলে। দুপাশে বন্দুকধারী দুই দুই চার। নিষ্কাশিত তরবারি আরো দুজন। আরো কয়েকজন সৈনিক-পুরুষ এধার ওধার। শহীদদের উদ্দেশে স্যালুট দিয়ে দাঁড়ালেন এসে তাঁরা মাঝখানে।

ব্যাণ্ড বাজলো। আমেরিকার জাতীয় সংগীতে জাতীয় বীরদের অভিবাদন। তারপর দীর্ঘ পদক্ষেপে সেনাপতির সম্মুখে হাজির আর-এক সৈনিক। হাতে তার এক রৌপ্যপাত্র আবৃত। সে আবরণ উত্তোলন। পাত্রে সযত্ন রক্ষিত শ্রদ্ধা-পত্র। সেনাপতির কম্বুকণ্ঠে সে পত্র পাঠ। জাতির পক্ষ থেকে জাতীয়

বীরদের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। অজানা শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ। তারপর আবার স্যালুট। সেনাবাহিনী মার্চ করতে করতে বিদায়।

এ রীতি চালু ১৮৬৮ সাল থেকে। 'গ্রাণ্ড আর্মি'র তখনকার সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল জন এ লোগান। তিনিই প্রথম প্রবর্তক এই রীতির।

একটি নিখুঁত অনুষ্ঠান। কি সুশৃঙ্খল! চিত্তপটে স্পষ্ট দাগ। জ্যাকসন সার্কেল আর কানাডিয়ান স্মৃতিস্তম্ভ। এ দুটির কথাও ভোলা দায়। প্রথমটি সাধারণতন্ত্রী বাহিনীর শহীদ স্মৃতি। আর একটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহত মার্কিন সৈন্যদের স্মরণবেদী। ১৯১৪ সালে তৈরি প্রথমটি, অপরটি ১৯২০ সালে। মনে হয় আজও নতুন।

মাউণ্ট ভার্ননে একবেলা

আবার আমরা যে যার বাসে। ছুটলো বাস। মাউণ্ট ভার্নন এখান থেকে বেশ দূর। ছায়া-ছড়ানো পথ। দুপাশে গাছপালার মিছিল। পটোম্যাকে জলকল্লোল। আলো-ছায়ার খেলা আর নদীর গান। আমার শান্ত সুন্দর পল্লী বাঙলার মতোই মিষ্টি মধুর।

মাউণ্ট ভার্ননে এসে মুগ্ধ মন। এখানে আমেরিকার অন্যরূপ। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা ছুঁই-ছুঁই এ পল্লীর স্নিগ্ধ-সীমান্ত। তবুও তফাত। মাউণ্ট ভার্ননে আধুনিকতার প্রবেশ নিষেধ। জর্জ ওয়াশিংটনের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন। তাঁর পল্লী-ভবন তাই আজো অবিকৃত।

মাউণ্ট ভার্নন। এ যেন এক স্বপনপুরী। অফুরন্ত দর্শনীয়। অবর্ণনীয় দৃশ্যশোভা টুকরো টুকরো আলোচনায় এক-একটি মনের ভাবমুক্তি।

শাসনতান্ত্রিক কতো কাজে ওয়াশিংটনের ব্যস্ত থাকার কথা! সবে স্বাধীনতা লাভ। মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ী সেনাপতিই নতুন রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি। তাঁর ব্যস্ততা অকল্পনীয়। তার মধ্যেই তবু পল্লী সংগঠনের সমস্ত দিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। এখানেই ওয়াশিংটনের অসাধারণত্ব। কর্মবন্যা আমেরিকার বৈশিষ্ট্য। ওয়াশিংটনের জীবন তার প্রতীক।

সামনে সুবিস্তৃত বহিঃপ্রাংগণ। সে প্রাংগণে প্রবেশ করেই বাঁ হাতে প্রকাণ্ড ফুল বাগান। সে বাগান দেয়াল-ঘেরা। সে দেয়াল ছাপিয়ে ফুলচারাদের মাথা উঁচু। ফুল ফোটার আনন্দে সব আত্মহারা। দুলে দুলে তারা সুবাস ছড়ায় চারদিকে। ডান হাতে ঝোপঝাড়। গাছগাছড়া। ওয়াশিংটনের বোটানিক্যাল গার্ডেন। বাড়ির চতুর্দিকে খেত-খামার। নয়ন-তৃপ্তি সবুজ মেলা।

স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবী সর্বাধিনায়ক নন, ওয়াশিংটন এখানে গঠন-কর্মের পথিকৃৎ। সেই গঠনকর্মের কথাই কিছুটা বলি। মিঃ ন্যাপের মুখ থেকে শোনা কথা। মাউণ্ট ভার্ননের পরিচয়-পুস্তিকা পড়ে জানা কথা। তার কিছুটা লিখে জানাই।

'ইয়র্ক টাউনে' ব্রিটিশ বাহিনীর আত্মসমর্পণ। জেনারেল ওয়াশিংটনের জয়ধ্বনিতে মুখর সারা দেশ। যুদ্ধ-বিভীষিকার অবসান। স্বাধীনতা করায়ত্ত আমেরিকার।

আর লড়াই নয়। এবারে সংগঠন। এবারে দেশ পুনর্গঠনের পালা। কৃষির উন্নতি, পশুপালন আর উদ্যান রচনা। তার ওপর দেশের অনেক কল্যাণ নির্ভরশীল। এখন এসব কাজে লেগে যাও।—জয়োল্লাস-মত্ত সেনাদের উদ্দেশে বিজয়ী ওয়াশিংটনের আহ্বান।

ওয়াশিংটন নিজেও মেতে উঠলেন পুনর্গঠনের কাজে। ভার্জিনিয়ার মাউণ্ট ভার্ননে শুরু হলো তাঁর গবেষণা। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নানা ধরনের বীজ সংগ্রহ। হাতেকলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ আরম্ভ। সময় নষ্ট করার সময় নেই।

ওয়াশিংটন-পত্নী মিসেস্ মার্থা।

এই বিরাট সংগঠনী যজ্ঞ থেকে মিসেস্ মার্থাও পিছিয়ে রইলেন না। এগিয়ে এলেন তিনি। স্বামীর সঙ্গে হাত মেলালেন।

বিচিত্র 'অ্যাপ্রনে' সজ্জিতা মিসেস্ মার্থা। জমিদারীর নানা কাজের তত্ত্বাবধানে তাঁর আনন্দ। সুবিশাল প্রাসাদ থেকে সামান্য কুটিরে পর্যন্ত তাঁর অকুণ্ঠ গতি। মাউণ্ট ভার্ননে তাঁতঘর, ধোবীখানা, ডেয়ারী এমন কি রান্নাঘরটিতে পর্যন্ত তাঁর উঁকিঝুঁকি। সুতো তৈরি থেকে পোশাক বানানো পর্যন্ত সবই তাঁর নির্দেশ-মাফিক। কর্মশক্তিতে ওয়াশিংটনেরই যোগ্যা সহকর্মিণী তিনি।

সে আমলে আমেরিকার চাষের অবস্থা শোচনীয়। জমি বিস্তর। দামও সস্তা। কিন্তু তবুও কৃষির দৈন্যদশা। জর্জ ওয়াশিংটন নিজেই তাই বিশেষ উদ্যোগী হলেন তার প্রতিকারে। পৃথিবীর বিখ্যাত কৃষিবিদ্‌দের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন। ইংল্যাণ্ডের কৃষি বোর্ডের সভাপতি নামজাদা কৃষি-বিশেষজ্ঞ স্যার জন সিনক্লেয়ার। বিখ্যাত লেখক আর্থার ইয়ং। আর তাঁদের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ। পত্র-দূত মাধ্যমে আসে ইংল্যাণ্ডের সর্বাধুনিক চাষের পদ্ধতি আর নানা ধরনের বীজের খবর।

গবেষণায় গভীর আনন্দ ওয়াশিংটনের। ছুটে ছুটে তাই তিনি তাঁর 'বোটানিক্যাল গার্ডেন'-এ। নানা বীজ ও সার নিয়ে এখানেই তাঁর পরীক্ষা

নিরীক্ষা। তার জন্যে এক অভিনব ব্যবস্থা। মস্ত একটি বাক্স তৈরি করালেন তিনি। সে বাক্সটিতে দশ কোঠা। প্রত্যেক কোঠায় সার-মেশানো কাঁচা মাটি। তারই মধ্যে রকম রকম বীজ বুনে প্রতীক্ষা। প্রত্যেক কোঠায় তিন রকমের বীজ—গম, ওট আর বার্লি। প্রাক্ সূর্যাস্তে প্রতি কোঠায় সমানভাবে প্রত্যহ জলসিঞ্চন। তার ফলাফলের দিকে সতর্ক দৃষ্টি।

বাক্সের কোঠায় কোঠায় ফসল ফলে। ফসল হাসিতে উল্লসিত ওয়াশিংটন।

মিসেস্ মার্থারও সে কি উল্লাস! শস্য-শীষে স্নেহচুম্বন। ও যেন শুধু শস্য নয়, ওয়াশিংটন দম্পতির সব শিশু-সন্তান!

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে ওয়াশিংটনের অন্যতম সহযোগী টমাস জেফারসন। স্বাধীনতার সনদ রচয়িতা তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় প্রেসিডেণ্ট। তিনিও ভার্জিনিয়ারই অধিবাসী। চাষ-আবাদের ব্যাপারে তাঁরও শখ অত্যন্ত বেশি। শুধু শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে নয়, কৃষি উন্নয়নের বিষয় নিয়েও ওয়াশিংটন ও জেফারসনের মধ্যে চলতো পত্রালাপ। ওয়াশিংটনের অনেক চিঠিপত্রের মধ্যে তেমনি একখানা চিঠি চোখে পড়লো মাউণ্ট ভার্ননের পত্র-প্রদর্শনীতে। ১৭৯৫ সনের ৪ঠা আগস্ট তারিখে মাউণ্ট ভার্নন থেকে লেখা সে চিঠি। জেফারসনকে লেখা। নিচে তার অংশানুবাদ:

"……এ কয়দিন বাড়িতে ছিলাম না। সুতরাং যা হয়ে থাকে, কোন দিকে কেউ কোন নজরই দেয়নি। কেন না, আমার ম্যানেজার বা তদারক করবার লোকজন যাঁরা আছেন, তাঁরা সাধারণত যে ফসল ফলিয়ে থাকেন তা নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত। নতুন কিছুর চাষ যদি করতে বলা হয় তো এক-খেত 'ইণ্ডিয়ান' ফসলই বুনে বসবেন। এ ফসলের সবটাই যে হেজেমজে যেতে পারে তা জেনেও জানবেন না। অতএব আমি ঠিক করেছি, একটু ফুরসত পেলেই অন্য ফসলের চাইতে অধিক মাত্রায় এসব ফসলের চাষই করবো। মিঃ স্ট্রীক্ল্যাণ্ড আমার নিকট যে খানিকটা বীজ পাঠিয়েছেন তা দিয়েই আমি মূলোজাতীয় তরকারির চাষ শুরু করছি। আপনার মতো Lucern-র চাষ আমি তেমন সুবিধে করে উঠতে পারি নি। তবে আমি আশা ছাড়ছি নে। আর একবার চেষ্টা করে দেখবো। ত্রিপত্র ঘাসের যে চাষ করেছিলাম, তারা বেশ গজিয়ে উঠেছে। তবে এও ঠিক, খেসারতও এজন্যে আমাকে কম দিতে হয়নি। আশা করি, শীতকালীন মুগ-কলাইয়ের ভালো বীজ আপনি হয়তো

মাউণ্ট ভার্ননে জর্জ ওয়াশিংটনের পল্লীভবন

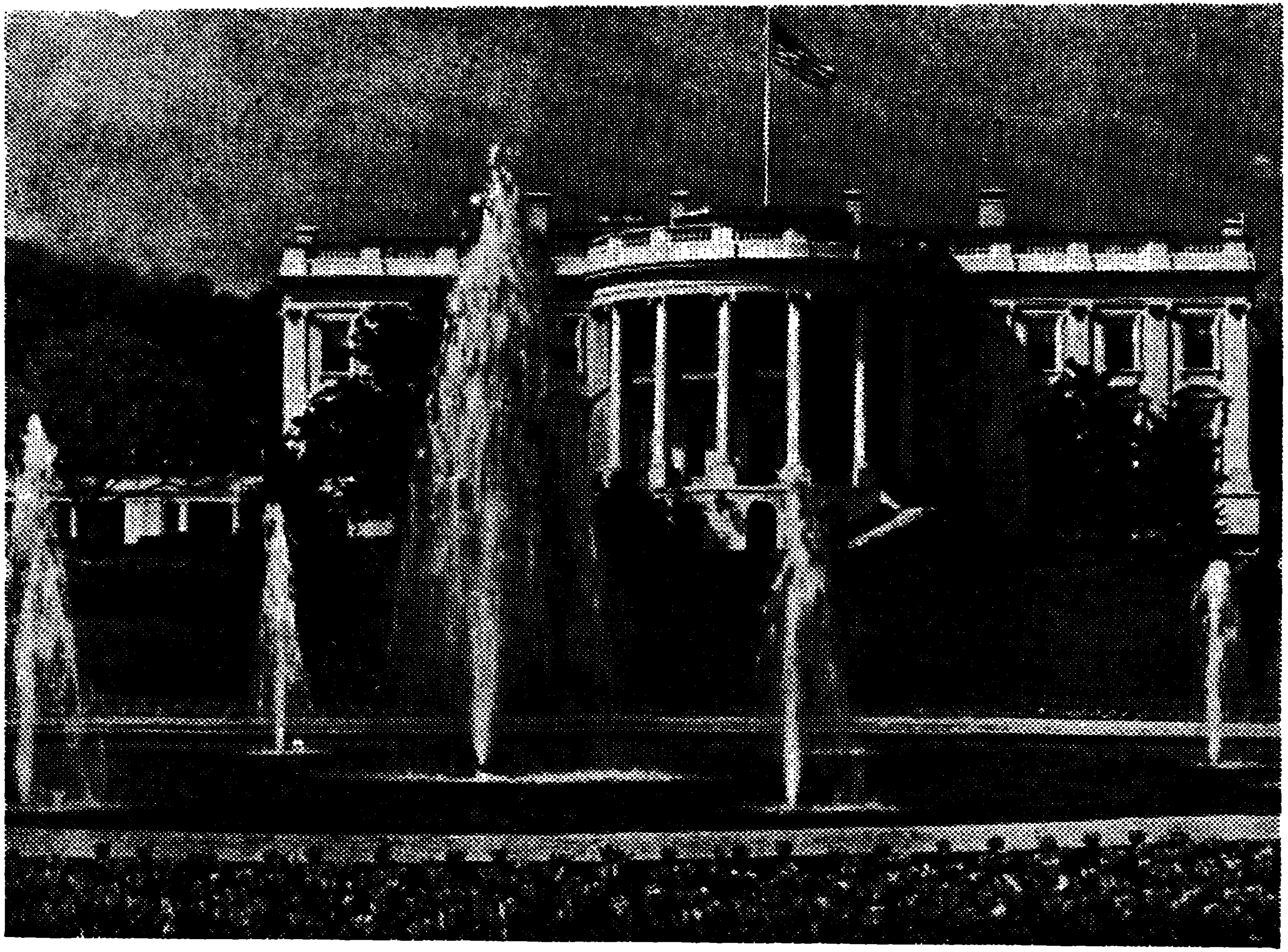

হোয়াইট হাউস : কেন্দ্রীয় মার্কিণ শাসন-বিভাগীয় মূল দপ্তর ও রাষ্ট্রপতি-ভবন

জোগাড় করতে পারবেন। বাইরে থেকে তার বীজ আমি ইতিপূর্বে আনিয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু সে বীজ তেমন সুবিধের ছিলো না। মোটেই গজিয়ে উঠতো না। যা বা দু-একটা অংকুর দেখা দিতো, আগাছায় তা নষ্ট হয়ে যেতো। আমার বিশ্বাস, আমাদের 'ফার্ম'-এ (খামারে) ঠিকমতো যদি এ শস্য ফলানো হয়, আমাদের মোটা রকম প্রাপ্তিযোগই ঘটবে। এল্‌বনি বাদামের চাষও আমি করে দেখেছিলাম। এ বাদামগুলো ইয়োরোপের মাঠের বাদামের মতোই অনেকটা আকারে। চাষ ভালোই হ্‌চ্ছিলো। কিন্তু কোথা থেকে পোকা এসে বাগানের সব বাদামগুলো ছেঁদা করে দেয় আর ভেতরে ঢুকে শাঁসটুকু খেয়ে নেয়। সুতরাং আপনার বাদাম পাঠানোর প্রস্তাবে খুব ভরসা পাচ্ছি না। বড়ো দানার গমের বেলায় অবশ্য আমি অন্য ধারণাই করেছিলাম। কিন্তু যেমনটা আশা করা গিয়েছিলো তা হলো না। আমার মনে হয়, এর জন্যে দায়ী বীজ-বপন আর লাংগল চালানোর সময়কার গলদই, অন্য কোন ত্রুটি নয়।

"সব সময় আমার মনে হয় বড়ো দানার গমকে সার হিসেবে দুরকমে ব্যবহার করা যেতে পারে ভালোভাবে। প্রথম হলো, যদি আগে থেকে বপন করে নেওয়া যায়, আর তারপর যদি ফসল পেকে ওঠবার সময় আর এক দফা সার দেওয়া যায়। দু নম্বর প্রণালী হলো দেরি করেই এ গমের চাষ করা। অপরাপর গমের চারাগুলো যখন এক ফুট উঁচু হবে, তখন যদি ত্রিপত্র গমের ঘাসের মতো তার চাষের ব্যবস্থা করা হয়, তবে সুফল আশা করা যায়। আমি অবশ্য শেষোক্ত পন্থা কখনো অবলম্বন করে দেখি নি। প্রথমোক্ত রীতি ইতিপূর্বে পরখ করেছি। কিন্তু বাকনামীয় গমের চারাগুলো তাতে এমন ঢেঙা শুক্‌নো আর নড়বড়ে হয়ে ওঠে যে, রস-কষপূর্ণ উদ্ভিদের কোন ছাপই তাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু আমার মতে সব রকমের উন্নত ধরনের শস্যের মধ্যে কঠিন রুক্ষ মাটিতে আমি যে আলুর চাষ করে থাকি তার বুঝি জুড়ি নেই। বিভিন্ন দৃষ্টান্ত থেকে আমি এ সিদ্ধান্তে এসেছি।

"কলাই বা মুগ ডাল অথবা বাদামের শীতকালীন চাষ সম্পর্কে আপনার গবেষণা প্রস্তাবের জন্যে ধন্যবাদ। সুফল কামনা করি।

"আপনাদের অঞ্চলে ক্ষুদ্র পতংগ যে ক্ষতি করেছে তাতে দুঃখিত। এ ক্ষতি অপরিসীম। বিশেষ করে এ বছর যখন গমের চাহিদা খুবই বেশি আর

দামও চড়া। তবে চাষীর পক্ষে এমনধারা বিপুল ক্ষয়-ক্ষতি চিরকালই শোচনীয়।"

এ চিঠি পড়ে চোখ রগড়াই। সত্যি সত্যি মাটির মানুষ ওয়াশিংটন। সাধারণের কাছের মানুষ। কী না করেছেন তিনি তাঁর পল্লী-ভবনে। পুরো আত্মনির্ভর করে গড়েছিলেন তিনি তাঁর মাউন্ট ভার্ননকে। গোটা আমেরিকার পথ-প্রদর্শক মাউন্ট ভার্নন যতো দেখি ততোই ভাবি। দেখার আর যেন শেষ নেই।

মাউন্ট ভার্ননের পুরোনো শস্যভাণ্ডার। একঘরে একই সঙ্গে ত্রিশজন মিলে গম পিষবার নতুন ব্যবস্থা। ঘরের বাইরে ঘোড়া দিয়ে গম মাড়ানোর রীতি সেকেলে। ওয়াশিংটন তার বিরোধী। তাতে অযথা বিরাট ঝুঁকি। বাইরের হাওয়া বাতাসে সব গম নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা। তাই পুরোপুরি বাতিল সে পুরোনো প্রথা।

কৃষি উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গেই কথা আসে উদ্যান রচনার। সেদিকেও জর্জ ওয়াশিংটনের মনোনিবেশ। তাঁর বোটানিক্যাল গার্ডেন তারই ফল। দেশজোড়া মাউন্ট ভার্ননের উদ্যান-খ্যাতি। ভালো ভালো নানা জাতের আঙুর, আপেল, কমলা, বেদানা। বাতাবী ফুলের মিষ্টি গন্ধে বাগান আমোদ। আরো কতো ফল-ফুলের বাহারি বিন্যাস!

আজো সে উদ্যানে আঙুর আপেলের ছড়াছড়ি।

ডিয়াজ দম্পতির আদুরে ছেলের জোর আব্দার। গাছ থেকে তার একটি টুকটুকে আপেল চাই-ই চাই। শিশুমনলোভা সিদুঁরে আপেল। বায়না নিবৃত্তির উপায় নেই। মায়ের নিষেধে কান্না-ধূম। পাশ কাটিয়ে হঠাৎ যায় মালী। তাকে কাছে পেয়ে সব কথা খুলেই বলি।

ও, এই কথা!—মালী হাসে।

আপেল হাতে পেয়ে খোকন খুশি। তার সঙ্গে আমার ভাব জমে যায় সেই থেকে। মাউন্ট ভার্ননে বাকি সময়টুকু প্রায় আমার সঙ্গেই তার ঘোরাঘুরি। একটি কুসুম সংগী।

পশুপালন ব্যবস্থার উন্নয়নেও অশেষ কৃতিত্ব ওয়াশিংটনের। তাদের প্রতি অবহেলায় তাঁর মনোব্যথা। তারাও প্রাণী। জীবন প্রয়োজনে তাদেরও চাই উপযুক্ত খাদ্য-বাস। ওয়াশিংটনের নির্দেশে পুরোনো রীতি-নীতি সব বাতিল।

নতুন পশুশালা প্রতিষ্ঠায় বৈজ্ঞানিক বিচার। মাউণ্ট ভার্ননে সেই থেকে গরু-ঘোড়াদের নতুন জীবন।

চতুর্দিকে কর্মী ওয়াশিংটনের এমনি সব সাফল্য-সাক্ষ্য। গঠনকর্মের পুণ্যভূমি মাউণ্ট ভার্নন। ওয়াশিংটনের কর্মযজ্ঞের মূল বেদী। এখান থেকেই একদিন সংগঠনের বাণী ছড়িয়ে পড়েছিলো সারা আমেরিকায়। আজকের আমেরিকার প্রাণ-প্রতিষ্ঠাই যে এখানে। সে প্রতিষ্ঠা-উৎসবে প্রজ্বলিত দীপশিখা আজো অনির্বাণ।

সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের দেশপ্রেমী মহিলা প্রতিষ্ঠান 'মাউণ্ট ভার্নন মহিলা সাহায্য সমিতি'। তাঁদের পরিচালনায় মাউণ্ট ভার্নন সারা আমেরিকার শিক্ষা-তীর্থ। শুধু আমেরিকার কেন, সারা পৃথিবীর।

বোটানিক্যাল গার্ডেনের পাশ দিয়ে এগিয়ে চলি। একটি বাড়ির কাছে এসে দাঁড়াই। কাঠের দোতলা বাড়ি। ঠিক দোতলা নয়, আড়াই তলা।

এই যে, এ বাড়িতেই জর্জ ওয়াশিংটনের বাল্যলীলা। এখানেই তাঁর শেষ জীবন।—আমায় লক্ষ্য করে বল্লেন মিঃ ন্যাপ।

বাড়িটি দেখে মনে হয় সদ্য তৈরি। অথচ কম্‌সে কম একশো বছরেরও বেশি পুরোনো।

বাড়ির ইতিহাস জানার মতো।

জর্জের প্রপিতামহ জন ওয়াশিংটন। জন ও তাঁর এক বন্ধু নিকোলাস স্পেন্সার পাঁচ হাজার একরের এক জমিদারি পেলেন একসঙ্গে। ষোল বছর পর ১৬৯০ সনে দু ভাগে ভাগ হলো সে জমিদারি।

জনের মৃত্যুর পর তাঁর এ জমিদারি পেলেন মিলড্রেড ওয়াশিংটন। জর্জ ওয়াশিংটনের পিসী এই মিল্‌ড্রেড। তাঁর ধর্ম-মাও। জর্জের বাবা অগাস্টিন বোনের কাছ থেকে এ জমি কিনে নেন ১৭২৬ সনে। এখানে এসে তাঁর বসবাসের ইচ্ছে। কিন্তু সে ইচ্ছে রূপ পেতে কেটে যায় প্রায় বছর দশেক। তখন এ অঞ্চলের নাম 'হান্টিং ক্রিক প্লাণ্টেশন'।

অগাস্টিন এলেন এখানে তাঁর ছোট পরিবার নিয়ে। জর্জ ওয়াশিংটনের বয়স তখন তিন বছর। তাঁর অতি প্রিয় পটোম্যাকের মতোই শিশু জর্জ তখন কল-মুখর। কয়েক বছর পর অগাস্টিন আবার এই আবাস ছাড়া সপরিবারে। এ জমিদারি তিনি লিখে দিলেন তাঁর বড়ো ছেলে লরেন্সকে।

পটোম্যাকের কাছ থেকে বিদায় নিতে জর্জ তখন একেবারে মনমরা। তিন বছর পর ১৭৪৩ সনে পিতৃবিয়োগে আরো কাতর। তখন জর্জের বয়স আট বছর। দাদা-বৌদির সঙ্গে নতুন জমিদারিতে ফিরে এসে কিছুটা স্থির। পটোম্যাককে আবার কাছে পেয়ে মন শীতল। লরেন্স নতুন নামকরণ করলেন তাঁর নতুন পল্লীভবনের। নাম দিলেন মাউণ্ট ভার্নন। অ্যাডমিরাল ভার্নন-এর নামে নাম। প্রভুভক্ত লরেন্স ওয়াশিংটন। এ্যাডমিরাল ভার্ণন-এর অধীনে কাজ করতেন তিনি। প্রভুর স্মরণে তাঁর এই পল্লীভবন।

কিন্তু দশ বছরও লরেন্স ভোগ করতে পারলেন না তাঁর নতুন বাড়ি। ১৭৫২ সনে তাঁর অকালমৃত্যু। মাউণ্ট ভার্ননের পরবর্তী বা দ্বিতীয় মালিক জর্জ ওয়াশিংটন। লরেন্সের ছোট ভাই, তাঁর সৎ ভাই।

মাউণ্ট ভার্নন বাস-ভবনের আরম্ভ যে কবে কার দ্বারা তা অজানা। তবে তার বর্তমান রূপ ও জর্জিয়ান স্থাপত্যরীতি যে জর্জ ওয়াশিংটনের পরিকল্পনা, সে নিঃসন্দেহ। এ বিষয়ে আমেরিকানরা সবাই একমত।

যুদ্ধের জন্যে বছরের পর বছর দূরে থাকতে হতো ওয়াশিংটনকে। কিন্তু মনের সীমানায় মাউণ্ট ভার্নন তাঁর চিরজীবন্ত। সেখানে তাঁর নানা পরিকল্পনা রূপায়ণে সদাব্যস্ত সুযোগ্য জ্ঞাতি-ম্যানেজার লাণ্ড ওয়াশিংটন।—একজন গাইড আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন সব কথা।

বাড়ির উত্তর মাথায় মস্ত এক হল! ভোজসভা ঘর। এ ঘরে দর্শনীয় অনেক কিছু। প্রথমেই চোখে পড়ে সুন্দর একখানি ফরাসী কার্পেট। ষোড়শ লুই-এর উপহার। এ উপহার যখন মাউণ্ট ভার্ননে এসে পৌছায় তখন ইতিহাসের ঢেউ গড়িয়ে গড়িয়ে অনেক দূর। ধুয়ে মুছে অনেক কথাই অর্থহীন। ষোড়শ লুই বা ওয়াশিংটন, তাঁদের একজনও নেই আর এই লোকে।

হলঘরের একদিকে টাংগানো জর্জ ওয়াশিংটনের দুখানি 'পোর্ট্রেট'। একখানি সেনানায়ক-বেশে। অন্যখানি প্রেসিডেন্টের সজ্জায়। ছবি দুখানির চিত্রী চার্লস উইলসন ও গিলবার্ট স্ট্য়ার্ট। তা ছাড়া রয়েছে ওয়াশিংটনের ব্যবহৃত রুপোর ব্রাকেটওলা ল্যাম্প, ঘড়ি, দীপদানি এবং কখানি তৈলচিত্র আর ল্যাণ্ডস্কেপ।

'আহার-ঘরে'র পাশেই 'ওয়েস্ট পার্লার'। ওয়াশিংটনের নিভৃত 'বিশ্রাম'। প্রাইভেট চেম্বার। এখানে লোহার ফ্রেমে মোড়া ফায়ার প্লেসের ওপর দুটি

অক্ষর—জি ডব্‌লু। জর্জ ওয়াশিংটনের সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর। তার ওপরে ঝোলানো সাজানো ওয়াশিংটনের কতোগুলো অস্ত্র-শস্ত্র। এ ছাড়াও বহু টুক্‌টাক্‌। মশারি খাটানোর হুক, আয়না, চা-সরঞ্জাম!

ষোড়শ-লুই এরও একখানা 'পোর্ট্রেট'। সাবেক নয় এখানা। বিজয়ী ওয়াশিংটনকে প্রদত্ত ষোড়শ লুই-এর একখানি প্রতিকৃতির এটি অনুলিপি। সেই ছবির দিকে চেয়ে থাকি। চেয়ে থাকি আর ভাবি। হায় রাজা লুই! ফ্রান্সের কতো দুর্গতির জন্যে দায়ী তুমি! প্যারিস থেকে পালিয়েও নিস্তার নেই। গিলোটিনে শেষে রাজার প্রাণান্ত!

এলাম সংগীত-ঘরে। বিশেষভাবে সাজানো এ-ঘর ওয়াশিংটনের নাতনি নেলী কাস্টিস্‌-এর জন্যে। ওয়াশিংটন বলতেন, 'আমি গান গাইতে জানিনে। কোন রকম বাদ্যযন্ত্রেও আমার আসক্তি নেই।' কিন্তু তাঁরই একটি বাঁশি দেখছি এই ঘরে! নেলীর কয়েকখানি গানের বই সাজানো তাঁর হার্পসিকর্ডের ওপর। নেলীর জন্যে লণ্ডন থেকে আনা এ এক শখের বাদ্যযন্ত্র। একটি সেতার ও একটি গীটার আর এক পাশে। নেলী-কন্যার যে ছবিখানি এ ঘরে তা অনেক পরের আঁকা।

এবার সেন্ট্রাল হলে। এ ঘরও বেশ প্রশস্ত। অনেক দেখার। একটি বড়ো ঘড়ি। মার্বেলের একটি সুন্দর টেবিল। একটি লণ্ঠন। কিন্তু সবচেয়ে যা মন টানে, তা ফরাসী বিপ্লবী লাফায়েতের দুটি উপহার। তার একটি শিকার শিঙা, অন্যটি বাস্তিল দুর্গের প্রকাণ্ড চাবি। এ চাবি দেখে অভূতপূর্ব শিহরণ দেহ-মনে। এ যে ফরাসী বিপ্লবের প্রতীক-চিহ্ন!

সেন্ট্রাল হলেই একটি কাঁচের আলমারিতে ওয়াশিংটনের ব্যবহৃত চারখানি তরবারি। এখনও চকচক ঝকঝক। ওয়াশিংটনের এক ভাইপোর নামে এ তলোয়ার কখানা উইল করা। সে উইলে ওয়াশিংটনের কড়া নির্দেশ।— আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা বা দেশের স্বার্থেই এই তরবারি কোষমুক্ত করা চলবে। অন্য কোন প্রয়োজনে নয়।

সেন্ট্রাল হলের দক্ষিণে পারিবারিক ভোজন-ঘর। অতিথিবৎসল গৃহকর্তা। গৃহকর্ত্রী আরো দরাজ। অভ্যাগতদের জন্যে খানাঘর খোলা সব সময়। ডায়েরীর এক পাতায় লিখেছেন জর্জ ওয়াশিংটন নিজ হাতে: Mrs. Washington and myself will do what I believe has not

been done within the last twenty years by us,—that is sit down to dinner by ourselves.

লরেন্স ওয়াশিংটনেরও একখানা তৈলচিত্র এ ঘরে। একখানি জীবন্ত ছবি।

মিসেস্ ওয়াশিংটনের বসার ঘরটিও চমৎকার। দৃষ্টি উড়িয়ে দাও খোলা জানালায়। বিধাতা এখানে রম্য-রচনায় অকৃপণ। সামনে নৃত্য-পটীয়সী পটোম্যাক। আকাশ-প্রান্তরে, বন-পাহাড়ে মধু মিলন। এখানে দাঁড়ালে হৃদয় ছুটছুট চারদিকে। যতোটা বেশি সম্ভব শ্রীমতী ওয়াশিংটন সময় কাটাতেন এই ঘরে। কন্যা মার্থা কাস্টিস্‌কে লেখাপড়া শেখাতেন এখানে বসে। নাতনি নেলীকেও।

এর পরেই জর্জ ওয়াশিংটনের লাইব্রেরি। এখানে বসে বসে ওয়াশিংটনের কতো কাজ। কয়েকটি খামার চালনা। অজস্র চিঠিপত্র লেখা। দৈনন্দিন ডায়েরী রচনা। অবসর সময়ে বই পড়া। এমনি কতো কি!

ওয়াশিংটনের অনেক উইল। তাঁর অনেক কিছুই এঁকে ওঁকে তাঁকে দান। কাউকে দিয়েছেন বইপত্র। কাউকে লাইব্রেরির চেয়ার-টেবিল। অনেক চেষ্টায় সে সবের কিছু কিছু উদ্ধার। আবার ঠিক ঠিক স্থানে সে সব সংরক্ষণ। জাতীয় কর্তব্য পালনে জাতির আগ্রহের পরিচয়।

গিবনের অনুরক্ত পাঠক ছিলেন ওয়াশিংটন। তাঁর পড়া গিবনের এক সেট বই এ-ঘরে। আরো এ বই সে বই। দুখানি মানচিত্র। এদিকে দেখছি একটি থার্মোমিটার, একটি ব্যারোমিটার। লাইব্রেরিতে এদের আমদানী! আশ্চর্য হবার নেই কিছু। চাষ আবাদের কাজে, তার গবেষণায় আবহাওয়া সংবাদ অপরিহার্য! এ যন্ত্র দুটি ওয়াশিংটনের সে কাজের সংগী।

দোতলায় ওয়াশিংটনের শয়ন-কক্ষ। সে ঘর আজো তেমনি সাজানো। জাতির জনকের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ সে ঘরে। একখানি অতি সুন্দর কাঁথায় মোড়ানো তাঁর শয্যা। সুনিপুণ হাতের সুকোমল কাজ সে কাঁথায়। শ্রীমতী মার্থার মনের নানা রঙের সুতোয় বুনোনো সে কাজ। প্রিয়তমের শয্যায় প্রাণপ্রিয়ার হাতের ছোঁয়া। মনের ছোঁয়ার মতোই বুঝি তা চিরন্তন। সে ঘরে দাঁড়িয়ে মনে হলো মাউণ্ট ভার্ননের বাতাস যেন অশ্রুসিক্ত। সবার চোখই যেন জল-টলমল।

পতি-বিয়োগ-বিধুরা শ্রীমতী ওয়াশিংটন। ঠিক একটু ওপরে আর একখানি ঘর বেছে নিলেন তিনি নিজের জন্যে! ওয়াশিংটনের সমাধি সে ঘরের জানালা বরাবর। কতোদিন আর কতো রাত কেটেছে শ্রীমতী ওয়াশিংটনের স্বামীর মন্দিরের দিকে চেয়ে চেয়ে। আহা কতো দুঃখের ঢেউ আছাড়ি-পিছাড়ি তাঁর জীবন-সমুদ্রের তটসীমায়! মার্থাহীন মার্থা-শয্যাও তেমনি আজো বিছানো গোছানো। এ ঘরের বাতাসেও স্মৃতির উত্তাপ।

আরো দুখানা ঘর ঘুরিয়ে দেখালেন গাইড। তার একখানা শ্রীমতী নেলী কাস্টিস্-এর। আর একখানা ওয়াশিংটন-বন্ধু লাফায়েতের।

মাঝে মাঝে মাউণ্ট ভার্ননে আসতেন জেনারেল লাফায়েৎ। একনাগাড়ে থাকতেন এখানে কয়েকদিন ধরে। তাই তাঁর জন্যে এবাড়িতে নির্দিষ্ট ঘর। ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম নায়ক লাফায়েৎ। এখানে তাঁর শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে মনটা কেমন যেন নড়ে ওঠে। কবি হুইটম্যানের জীবনের ছোট্ট এক টুকরো কাহিনীতে হঠাৎ আমার মন মুখর. লাফায়েৎকে নিয়েই সে গল্প। তাই বলি।

পাঁচ বছরের ছেলে। ঠাকুর্দার হাত ধরে দাঁড়িয়ে সে ব্রুকলিনের রাস্তায়। রাস্তা সরগরম। কার যেন অভ্যর্থনার প্রস্তুতি।

দাদু, রাস্তায় ওরা কি করছে?

ও, তাও জানো না বুঝি! জেনারেল লাফায়েৎ আসবেন যে এখানে। ওরা তাই রাস্তাঘাট সাজাচ্ছে।

লাফায়েৎ? সে আবার কে দাদু?

আরে সেই যে সেই। ফরাসী মুলুকে সেই যে খুব জোর লড়াই হয়েছিলো না, যার গল্প বলছিলাম একদিন! সেই লড়াইয়ের পাণ্ডাই তো ছিলেন জেনারেল লাফায়েৎ। আর বুঝলি, আমাদের যে লড়াই হয়ে গেলো ইংরেজদের সঙ্গে, সেই যুদ্ধে আমাদেরও বন্ধু ছিলেন এই লাফায়েৎ। প্রাণের দোস্ত রে ভায়া, একেবারে প্রাণের দোস্ত!

ফরাসী বিপ্লব! আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ! পৃথিবীর ভাবরাজ্যে ওলট-পালট। সে আগুনের এমনি আঁচ।

দাদুর অমন সুন্দর গল্পবাচনেও পাঁচ বছরের ছোট্ট ছেলে তার হয়তো কিছুই টের পেলো না। তবে একটু বুঝলো, যাঁর অভ্যর্থনার জন্যে সারা

ব্রুকলিনে উৎসব-ঝড়, ঘরের মানুষ পথের মানুষ একাকার, তিনি নিশ্চয়ই মস্ত বড়ো কেউ একজন।

আমি—আমিও তা হলে তাঁকে দেখবো দাদু! বলো, দেখতে পাবো তো!—ছোট ছেলের আব্দার দাদুর কাছে।

আরে হ্যাঁ হ্যাঁ। পাবি, পাবি। 'ফল্টন ফেরি' থেকে নেবে আসবেন তিনি। সেখান থেকে 'অ্যাপ্রেন্টিস লাইব্রেরি'র ভিৎ পুত্‌তে যাবেন। তখন যে তোরা স্কুলের ছেলে-মেয়েরাই লাইন করে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানাবি। তোদের মাঝখান দিয়েই তাঁর যাবার কথা। সেই ব্যবস্থা।

ও, তাই বুঝি? তবে তো ভারি মজা।—দাদুর উত্তরে নাতির মুখে হাসির ফোয়ারা।

সেদিন ৪ঠা জুন। ব্রুকলিনে আসছেন জেনারেল লাফায়েৎ। তাই সাত তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে পড়ে ছোট্ট ছেলে। সাজগোজে তার আরো তাড়া। তারপর একেবারে রাজপথে।

কিন্তু ওমা! রাস্তায় যে লোক গিজগিজ। ভিড় ভেঙে কি করে পৌছনো মস্ত মানুষ লাফায়েতের কাছে? অসম্ভব।

ছেলেটি থমকে দাঁড়ায়। ভাবে। হতাশায় কেঁদে ফেলে।

দূরে জয়ধ্বনি। তারই ঢেউ গড়িয়ে গড়িয়ে অনেক দূরের এই পাঁচ বছরের ছেলেটির কানে।

নেমেছেন। জেনারেল্ ফেরি থেকে নেমেছেন।—হাজার কণ্ঠের কলগুঞ্জন। রুমাল উড়িয়ে লাফায়েৎকে লাখো জনের অভিনন্দন।

ছেলেটি তাকায়। উন্মুক্ত দৃষ্টি। সে হল্‌দে কোচওলা জেনারেলের গাড়িটিও তার চোখে পড়ে। কিন্তু লাফায়েৎ কোথায়?

আমি দেখবো, জেনারেল লাফায়েৎকে একটিবার শুধু দেখবো।—এই বলেই পাশের এক পথচারিকে জড়িয়ে ধরে ছেলেটি। দু চোখ গড়িয়ে তার অশ্রুধারা।

বালকের আন্তরিকতায় মুগ্ধ ভদ্রলোক। কাঁধে তুলে নিলেন তিনি ছেলেটিকে। এ কাঁধ থেকে সে কাঁধ। সে কাঁধ থেকে এ কাঁধ এমনি করে ছেলেটিকে নিয়ে এগিয়ে এলেন তিনি অনেকখানি।

হ্যাঁ, ঐ ঐ তো জেনারেল লাফায়েৎ!—আনন্দে করতালি। ছেলেটি

আত্মহারা। তার সাধ পূর্ণ এতোক্ষণে। সে কি সৌভাগ্যবান! এই ছেলেটিই হুইটম্যান। আমেরিকার চারণ-কবি মুক্তি-পাগল ওয়াল্ট হুইটম্যান।

লাফায়েতের শয্যাঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই মনের পর্দায় এই কাহিনীর ছায়াছবি। তা ভাবতে ভাবতেই পায়ে পায়ে দোতলা থেকে একতলায়। পিছন দিকের মাঠে গিয়ে নামি। সে মাঠ গড়িয়ে নেমে গেছে পটোম্যাকের দিকে। প্রাচীর-ঘেরা সে সবুজ মাঠ। দুদিকে অনেক দালান কোঠা। সে সবও ঘুরে দেখি।

প্রবেশমুখে ডানদিকে অনেকগুলো একতলা ঘর। ওয়াশিংটনের আমলে শ্বেতাংগ রক্ষী ও ভৃত্যদের আস্তানা। এখন অফিস। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আবাস। ডানদিকে পাকশালা। সেখানে রান্নার সেকেলে সব সাজ-সরঞ্জাম। সেসব দেখে আজকের অবস্থার তুলনায় বিস্ময় অসীম।

একধারে একটা গ্যারেজের মতো ঘর। তার মধ্যে তখনকার দিনের 'স্টেট কোচ'। ওয়াংশিংটন বাইরে বেরোতেন এ গাড়ি চড়ে। দেখে মনে হয় যেন সদ্য তৈরি। স্মৃতি রক্ষার এমনি সযত্ন প্রয়াস।

তখনো রোদ। পাইন-এল্‌ম গাছের ছায়ায় পথ চলি। ছায়াশীতল সমাধিক্ষেত্র। সেখানে আমরা সব জমায়েৎ।

জর্জ ওয়াশিংটনের উদ্যোগে তৈরি এই পারিবারিক সমাধিক্ষেত্র। বড়ো ভাই লরেন্সকে সমাধিস্থ করেছিলেন তিনি এখানে। তারপর এখানে তাঁর নিজের, স্ত্রী মার্থার ও ভাইপো বুশরডের শেষশয্যা রচিত হয় পর পর।

এ সমাধি-ভবন পাকা করার নির্দেশ ছিলো ওয়াশিংটনের উইলে। কিন্তু তা হয়নি ১৮৩১ সনের আগে। আগের বছরের একটি ঘটনার ফলে সে নির্দেশের ত্বরিত-রূপায়ণ। সে কাহিনী শুনে শিউরে উঠি।

মাউণ্ট ভার্নন দেখা-শোনার ভার তখন জন অগাস্টিন ওয়াশিংটনের ওপর। গুরুতর অপরাধে এক মাতাল কর্মচারীকে বরখাস্ত করতে বাধ্য হন তিনি। এক অদ্ভুত কাণ্ড বাধিয়ে বসে সেই বিক্ষুব্ধ কর্মচারী।

গভীর রাত্রি। সমাধি-ক্ষেত্রে চুপি চুপি প্রবেশ। মাটি খুঁড়ে একটি মাথার খুলি তুলে নিয়ে পলায়ন চেষ্টা। কিন্তু হাতে-নাতে ধরা পড়ে গিয়ে বেইজ্জতির চূড়ান্ত। ওয়াশিংটনের মাথার খুলি অপহরণ করে প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবৃত্তি জেগেছিলো মাতালের। ভুল করে তুলে নিয়েছিলো সে

ওয়াশিংটনের ভাইপোর মাথার খুলি। সে যাই হোক, সে ঘটনার পরেই এখানে সুরক্ষিত সমাধি-মন্দির।

সেই সমাধি-ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম জর্জ ওয়াশিংটনের জীবনের কথা। সেই মহাপ্রাণ ওয়াশিংটনের কথা, যিনি একটা নতুন জাতির স্রষ্টা হয়েও জাতির কাছ থেকে নিজের জন্যে কিছু প্রত্যাশা করেননি কোনদিন।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সাফল্যের পর একদল অনুরক্তের কাছ থেকে এসেছিলো এক অদ্ভুত প্রস্তাব। ওয়াশিংটনকে রাজপদে অভিষিক্ত করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। তীব্র তিরস্কারে তাঁরা হয়েছিলেন বহিষ্কৃত। তৃতীয়বার প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণের অনুরোধও ওয়াশিংটনের সে কি উষ্মা!

এসব বিরল দৃষ্টান্ত। আমাদের চারদিকে ক্ষমতা-লোভীদের দ্বন্দ্ব কেবল।

পদ-লোভীদের আত্মস্বার্থের কাড়াকাড়ি। আপন আপন অসামান্যতা প্রমাণে অতি সামান্যদের হুড়োহুড়ি। এসব ভেবে কী আর লাভ। দুর্ভাগ্যের ভোগ আমাদের ভুগতে হবে আরো অনেক।

কংগ্রেসে প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটনের বিদায়-ভাষণের কথা স্মরণীয়। তাঁর সে ভাষণ মার্কিন পররাষ্ট্র-নীতির ভিত্তিমূল। সে নীতির প্রথম কথা—

Observe good faith and justice towards all nations; cultivate peace and harmony with all.

মার্কিন জাতির প্রাণপুরুষ ওয়াশিংটন। তাঁর পুণ্য সমাধিক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আমার মনে একটি জিজ্ঞাসা :

মহৎপ্রাণ ওয়াশিংটনের সেদিনের সেই নির্দেশের প্রতি যথার্থই কি শ্রদ্ধাশীল আজকের আমেরিকা?

আপনার একটি ফটো তুলতে পারি?—চমকে উঠি এক মহিলার হঠাৎ প্রশ্নে। ক্যামেরা হাতে তাঁর পাশে তাঁর নাবালিকা মেয়ে। তারই শখ ফটো তোলার।

তাতে আর আপত্তির কি আছে? তবে খুশি হবো ফটোর একটি কপি পেলে।—উত্তর দিলাম।

সঙ্গে সঙ্গেই আমার হোটেলের ঠিকানা লিখে নিলেন ভদ্রমহিলা। 'নিশ্চয় পাঠাবো' বলে নিশ্চয়তা দিলেন। খানিকক্ষণ কথা হলো। একথা সেকথা।

ডাঃ রায়কে জানেন?—একটি আকস্মিক জিজ্ঞাসায় আমি অবাক।

ডাঃ রায় ! কার কথা বলছেন আপনি ?—আমার তরফ থেকে পাণ্টা প্রশ্ন।

কোলকাতার ডাঃ রায়। তিনি কয়েক বছর আগে এদেশে এসেছিলেন চিকিৎসার জন্যে। আমি তাঁর নার্স ছিলাম !—ভদ্রমহিলা উত্তর দিলেন।

ফটো তোলা হলো। অল্প আলোকে আলোকচিত্র। ফ্লাশ ফটো। তার কপি আমার হোটেলে পাঠালেও তা পাইনি আমি।

ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্যে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন। মাউণ্ট ভার্ননকে নমস্কার !

বড়ো শ্রদ্ধার পবিত্রস্থান মাউণ্ট ভার্নন। পটোম্যাক নদীতে বহু মার্কিন জাহাজের যাতায়াত। প্রতিটি জাহাজের পতাকা অর্ধনমিত করা হয় এখানে। ঘণ্টা ঢং ঢং। নাবিকরা সব দাঁড়ান সার বেঁধে। এভাবে বার বার জাতির জনককে শ্রদ্ধা-স্মরণ।

মাউণ্ট ভার্নন থেকে ফিরছি। পায়ে হেঁটে যাই অনেকখানি। ফুল-বাগানের পশ্চিম দিকে স্কুলবাড়ি। এ স্কুলে পড়তেন ওয়াশিংটনের নাতি-নাতনি। অদূরে মিউজিয়ম। দেশ-বিদেশ থেকে ওয়াশিংটনকে দেওয়া আরো নানা উপহার সংরক্ষিত এখানে।

দুটি ভারতীয় তরুণের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। তাঁরা শিক্ষার্থী। একজন উত্তর প্রদেশের, আর একজন অন্ধ্রের। শ্রী ডি কে গোয়েল আর শাস্ত্রীজী। তাঁদের সঙ্গে আকস্মিক আলাপে অন্তরে তরংগদোলা। কিন্তু তাঁরা অন্য বাসের যাত্রী। তাঁদের সঙ্গে আবার দেখা হবে সেণ্টারে।

You look so fine ! I have fallen in love with your shoes. Those are so nice !

বলে কি মেম সাহেব ? শেষ পর্যন্ত জুতোর সঙ্গেই প্রেম ! তবু রক্ষে। ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা বাঙালীর পায়ে নাগরা জুতো। মার্কিন মুলুকে সে জুতোর এতো কদর ! একটু দেমাক হলো বৈকি !

প্রায় একই পথে ফিরছি। বাস রাজধানীমুখো। একটি স্থন্দর পল্লী-হাট দেখে আরো এগুই। এবার ওয়াশিংটনে। এখন রোদ নরম। অদূরে গম্বুজ যেন ? মসজিদ মনে হয়। সত্যি সে মনে হওয়া। সহসা বাস থামে। নিরালা পরিবেশ। সবাই নেমে পড়ি। শুচিশুভ্র ধর্মঘর। অপূর্ব কারুকলা। বিভিন্ন মুস্লিম রাষ্ট্রের দান সার্থক। আমেরিকার রাজধানীতে মুসলমানদের জন্যে প্রার্থনা-ভবন। মুস্লিম সংখ্যা তো বড়ো কম নয় এদেশে। রাজধানীতে

আসা-যাওয়া করতেই হয় তাঁদের অনেককে। সংখ্যায় তাঁরা প্রায় বিশ হাজার। বৌদ্ধ জনসংখ্যা আরো বেশি। তাঁরা প্রায় তেষট্টি হাজার।

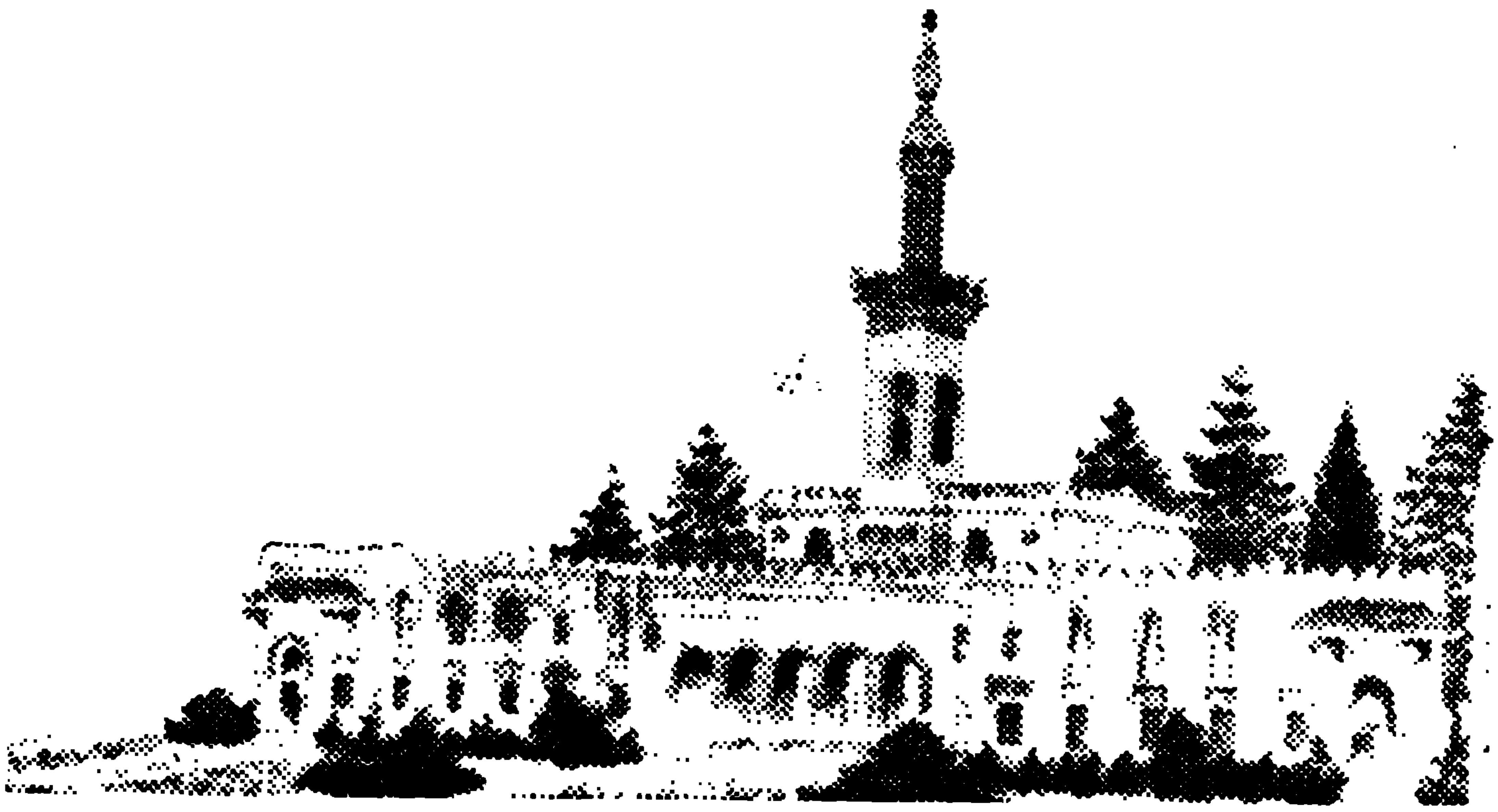

ওয়াশিংটন মহানগরীর মসজিদ ও ইস্লামিক ইন্সটিট্যুট

আবার চলি। এখান থেকে বাসে উঠেই মনে পড়লো সেই বুদ্ধবাণী : 'মন আগে ধর্ম পিছে, ধর্মের জনম হলো মনে।' ঠিক কথা। মনই আসল ধর্ম-মন্দির। আমাদের সব মন ধর্মময় হোক।

আমরা যখন সেণ্টারে ফিরে এলাম তখন প্রায় সন্ধ্যে সন্ধ্যে। আকাশে দু-একটি তারার অস্পষ্ট উঁকিঝুঁকি। ফ্যাকাশে খণ্ডচাঁদ একদিকে।

শনি-রবিবারের ওয়াশিংটন

শুক্রবার সন্ধ্যা। নগর পরিক্রমার কর্মসূচী শেষে ইণ্টারন্যাশনাল সেণ্টারে এসে সবাই মিলি। বিদায়-পর্বে সামান্য কথা আর হাসি হাসি করমর্দন।

সারাদিন ধরে ঘোরাঘুরি। তবু ক্লান্তি নেই। মন সবল। কতো যে জানাজানি একদিনে। দেহ-বিস্মরণ সেই সুখে। কিন্তু তবু প্রশ্ন, জানাই বা হলো আর কতোটুকু। অজ্ঞাত জ্ঞানের নেই সীমা।

গুড ইভনিং মিঃ বোস।—বিদায়প্রার্থী মিঃ ক্যাম্পো। পুরো নাম রোমান গোঞ্জাপেজ দেল ক্যাম্পো। একজন স্পেনীয় তরুণ। নগর পর্যটনে বাসে আমার পার্শ্বযাত্রী। সে সূত্রে অনেক আলাপ। আমার সফরসূচী জেনেছেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। প্যারি যাবো শুনে স্পেন ঘুরে আসার জন্যে আমন্ত্রণ।

স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদের অধিবাসী মিঃ ক্যাম্পো। বোধ হয় আইনজীবী। অত্যন্ত সূক্ষ্মবুদ্ধি যুবক। চলার পথে তাঁকে কাছে পেয়ে আমার লাভ।

বিচিত্র দেশ স্পেন। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেও বিশ্ববার্তায় সে উপেক্ষিত। প্রায় বিচ্ছিন্ন যেন পৃথিবীর মন থেকে। খবরের কাগজে এদেশের খবর ছিটেফোঁটা। একটু বিশেষ করে তাঁর দেশের কথা তাই জানার আগ্রহ। ক্যাম্পোর সঙ্গে পরিচয়ে সেই সুযোগ।

তবে কথাবার্তায় বড়োই চাপা মিঃ ক্যাম্পো। ঠিক চাপা নয়, খুব সতর্ক। সব প্রশ্নেরই সংক্ষিপ্ত উত্তর। নিজের দেশের সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর কথায় কিছু প্রকাশ না পায় সেদিকে সতর্কতা।

সুকঠোর শাসন জেনারেল ফ্রাঙ্কোর। কড়া মিলিটারি ডিক্টেটরশিপ। ষোল-সতেরো বছর ধরে সে শাসন চালু। তারপরেও ফ্রাঙ্কো নাকি জনপ্রিয়! স্পেনে এমন একজন ডিক্টেটরের প্রয়োজন ছিলো, এই ক্যাম্পোর মোদ্দা কথা।

এতোই যদি জনপ্রিয় তাহলে আর এই মিলিটারি শাসন কেন? একটা সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন না কেন জেনারেল ফ্রাঙ্কো?

ফ্যালেঞ্জিস্ট পার্টি ছাড়া আর কোন পার্টিই নেই আমাদের দেশে। অন্তত দুটো রাজনৈতিক দলের তো প্রয়োজন নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। তবে তেমন অবস্থা এলে তখন নির্বাচন হবেই। কিন্তু সেদিন যে কবে আসবে তা বলা মুশকিল।—মিঃ ক্যাম্পোর মুখে তাঁর দেশের অবস্থা বিশ্লেষণ।

অমিতবিক্রম একনায়ক ফ্রাঙ্কো। কিন্তু তাই বলে সমালোচনায় অধৈর্য নন। ছোটখাটো সমালোচনা বরং গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না তিনি। কথায় কথায় ফাঁসি নির্বাসনেরও রেওয়াজ নেই ফ্রাঙ্কো-স্পেনে। অবশ্য সরকার-বিরোধী ধ্বংসমূলক কোনরূপ প্রচার যাতে না চলতে পারে সেদিকে গভর্নমেণ্ট খুব হুঁশিয়ার। পার্টি, সৈন্যবাহিনী আর চার্চ সবই তো ফ্রাঙ্কোর বজ্রমুষ্টির মধ্যে। সবদিক থেকেই তিনি একরূপ নির্ভাবনা। গভীর তাঁর আত্মবিশ্বাস। অপর কেউ স্পেনের শাসন পরিচালনায় সক্ষম হতে পারে, এ আস্থা তাঁর নেই আদৌ। সাধারণের মধ্যেও সে ধারণা ক্রমশ প্রবল।—পথে পথে কথায় কথায় ক্যাম্পোর মুখ থেকে এসব নানা তথ্য প্রকাশ। রাজতন্ত্রের দিকে ফ্রাঙ্কোর বিশেষ ঝোঁক, সে আভাসও মেলে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তায়।

সাধারণ মানুষের অবস্থা কেমন স্পেনে?—এ প্রশ্নও করেছিলাম।

তা মোটামুটি ভালোই। শ্রমিকদের কথাই ধরুন। মন্ত্রিসভায় শ্রম দপ্তরের গুরুত্ব খুব আমাদের দেশে। শ্রমিক আইনের খুব কড়াকড়ি। সরকারী অনুমতি ছাড়া মালিক চাকরি মারতে পারে না কোন শ্রমিকের। আর সে অনুমোদন পাওয়াও বেশ কঠিন। সরকারী নিয়মেই শ্রমিকদের সর্বনিম্ন বেতন বাঁধা।—এ উত্তরে আমাকে সন্তুষ্ট করেছিলেন মিঃ ক্যাম্পো।

সে ক্যাম্পো বিদায় নিলেন।

নমস্তে।—শাস্ত্রীজীকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীগোয়েল একবার কাছে এলেন যাবার আগে।

জানেন তো, আসছে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সেণ্টারে আমাদের শেষ সভা। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি আলোচনা বৈঠক বসবে তখন।

না, জানি না তো কিছু।—গোয়েলের জিজ্ঞাসায় আমার সহজ স্বীকৃতি।

সে সভায় ভারত, পাকিস্তান, গ্রীস আর মিশরের পক্ষ থেকে বক্তৃতার ব্যবস্থা। মিস্ রাধালক্ষ্মী বলবেন ভারতের হয়ে আর পাকিস্তানের পক্ষে

বলবেন মিসেস্ মামুদ। আপনি নিশ্চয়ই উপস্থিত থাকবেন কিন্তু সে সভায়।

নিশ্চয়ই থাকবো।—শাস্ত্রীজীর আহ্বানে আনন্দ-সম্মতি।

তাঁরা বিদায়। একে একে আমরাও সবাই যে যার ঘরমুখো।

হোটেলে ফিরেই মেইলের খবর জিজ্ঞাসা। দেশের চিঠির জন্যে মন চঞ্চল। বাড়িতে অসুখবিসুখ। কে কেমন আছে, তার জন্যে চিন্তা প্রবল।

হ্যাঁ চিঠি আছে কিন্তু এ চিঠি ে এখানকার। একখানি নিমন্ত্রণপত্র। আমাদের দূতাবাসের পাব্লিক রিলেশনস্ অফিসার ও মিসেস্ কে বি ট্যাণ্ডনের আমন্ত্রণ। তাঁদের গারফিল্ড স্ট্রীটের বাড়িতে ককটেল পার্টি। সাতাশে আগস্ট সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটা থেকে সাড়ে আটটায় আমন্ত্রিত সমাবেশ।

প্রথম সাক্ষাতের দিনই এ পার্টির আয়োজনের কথা বলেছিলেন শ্রীট্যাণ্ডন। দূতাবাসের আরো অনেকের সঙ্গে সেখানে দেখা হবে, তাও জানিয়েছিলেন। এ পত্র তারই স্মরণিকা।

আজ যেন একটু বেশি গরম। ভালো করে নেয়ে-ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে নি। তারপর আবার বেরুই। আর বেড়ানো নয়। শুধু খাবার তাগিদ। কাছেই খাওয়া সেরে প্রত্যাগমন।

হাতের কাছে একখানা সংকলন-গ্রন্থ।

উইলিয়মস্-এর একগুচ্ছ কবিতা তাতে। সদ্য কেনা। শুয়ে শুয়ে আজ তাই পড়ি। কবিতা পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ায় ভারি আরাম। ঘুমের এ ভারি ভালো ওষুধ। উইলিয়ম কার্লোস উইলিয়মস্ আবার ডাক্তার-কবি। শুধু কবি নন, কথা-সাহিত্যিকও। নানা পদবী-পুরস্কারে সম্মানিত। অনেকের মতে তিনি আধুনিক আমেরিকার অন্যতম সেরা কবি।

কাটা-কাটা টুকরো টুকরো দু-চারটি কথায় এক-একটি কবিতা। কোন কোনটি অদ্ভুত মিষ্টি। সে মিষ্টতায় মোহাচ্ছন্ন। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি নেই খেয়াল। বই খোলা ঠিক তেমনি বুকে। বেড লাইট জ্বলছে তো জ্বলছেই।

হঠাৎ জেগে উঠে চমৎকার! আলো নেভাই। তখন ভোর।

একটি কবিতার সামান্য কটি কথা পড়তে পড়তে আমার চোখে নীল ছায়া। সুরভি-শীতল কেমন একটা আবেশে হঠাৎ ঘুম। জেগে উে তাই ঐ কবিতাটিই আবার পড়ি।—

THIS IS JUST TO SAY :

I have eaten
the plums
that were in
the ice box

and which
you were probably
saving for breakfast

Forgive me
they were delicious
so sweet
and so cold.

এ সত্যি একটি ঘুমপাড়ানি কবিতা।

শনিবারের সকাল বেলা। আজ আর কোন তাড়াহুড়ো নেই। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাই। লোকবিরল পথ। অন্যদিন এতোক্ষণে ছুটোছুটি। আটটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। একা ঘরে আর কীই বা করি। নিচেই যাই। চা-পর্ব সেরে নিয়ে কাগজ দেখবো, সে মতলব।

আমাদের হোটেলের সামনের কফি-ঘর বন্ধ। ছুটির দিনে এমনি বন্ধই থাকে ছোটখাটো সব কাফে-রেস্তোরাঁ। শনি-রবিবার সাধারণত বড়ো বড়ো রেস্তোরাঁয়ই খানাপিনা। কিন্তু এখন আবার চা-তৃষ্ণা মেটাতে যাই কোথায় ?

ন্যাশনাল হোটেলের কথা মনে পড়ে। হোটেল ছোট হলেও সেখানে তার সঙ্গে রেস্তোরাঁ। ঢাকার কজন বন্ধু সেখানে। তাঁদের সঙ্গেও দেখা হবে। সেখানেই যাই।

অনুমান ঠিক। ন্যাশনাল হোটেলের রেস্তোরাঁ খোলা। কিন্তু খদ্দের কোথায় ? আমি একা। কিছু খাবার আর এক কাপ কফি নিয়ে গল্প জুড়ে দিই ওয়েট্রেসের সঙ্গে।

আজ এমনি অবস্থা কেন ? লোকজন নেই মোটেই !

শহরই যে খালি বলতে গেলে। হোটেলে যে কজন আছেন তাঁদের প্রাতরাশও আগেই শেষ।—ওয়েট্রেসের উত্তরে আমার জ্ঞানোদয়।

শহরের লোক বুঝি সব বাইরে চলে যান তুদিনের ছুটি পেয়ে ?

অনেকটা তাই। আসল কথা কি জানেন, রাজধানীতে অধিকাংশই চাকুরে লোক। তাঁদের বেশির ভাগেরই বাড়ি আশপাশের বিভিন্ন রাজ্যে। তারা কেউ মেরিল্যাণ্ডের, কেউ ভার্জিনিয়ার। আবার অনেকে পেনসিলভেনিয়া বা দেলাওয়ারের। শুক্রবার থেকে বাড়িতেই সাধারণত তাঁদের রাত্রিবাস। মুক্তমনে আমোদস্ফূর্তি। তারপর আবার সোমবার থেকে যেমনি তেমনি।

ওয়াশিংটনে স্থায়ী বাসিন্দে তাহলে নেই বেশি ?

খুবই কম। ছুটির দিনে তাঁদেরও ছুটোছুটি। শহর থেকে দূরে পালিয়ে পরিত্রাণ। সপরিবারে পিকনিকের আনন্দভোগ। পটোম্যাকের তীরে তীরে গাড়ির ভিড়। কিংবা 'ড্রাইভ ইন' রেস্তোরাঁয় যেয়ে মুখ বদল। অনেকে চলে যান ওয়াশিংটন ছেড়ে সেই নিউইয়র্কে। পূর্বোপকূলের সেরা আমোদপুরী নিউইয়র্ক। পশ্চিম উপকূলের হলিউডের সঙ্গে তার ব্রডওয়ের পাল্লা। নাচ-গান-হল্লায় সেখানে দিন কাটে। মাত্র পাঁচ ঘণ্টার পথ ট্রেনে। প্লেনে এক ঘণ্টা !—ওয়েট্রেসের বর্ণনায় সব পরিষ্কার।

কফির দাম মিটিয়ে দিয়ে পাকিস্তানী বন্ধুদের খোঁজ করি। একজনের সন্ধান পেয়ে চলে যাই চারতলায়। আমায় দেখে বন্ধু অবাক। আমার আকস্মিক উপস্থিতিতে তাঁর পড়ায় ব্যাঘাত। 'শ্রেষ্ঠ গল্প' সিরিজের একখানা বইয়ে নিবিষ্ট ছিলেন তিনি। বাংলা বই পড়ায় তাঁর খুব ঝোঁক। কিন্তু এর পর আর পড়া হয় ?

ফোনের ডাকে ঢাকার আরো তিনজন ছেলে ঐ ঘরে জড়ো। ন্যাশনাল হোটেলেরই বাসিন্দে তাঁরা। অনেকক্ষণ ধরে আমাদের দেশের অনেক গল্প। উঠে আসার আগে হঠাৎ প্রশ্ন :

আজ সন্ধ্যায় যাচ্ছেন তো সেণ্টারে ?

কেন, ছুটির দিনে আজ আবার কি সেখানে ?—না জানার ভান করে আমার দিক থেকে পালটা জিজ্ঞাসা।

বারে জানেন না, আজ যে আপনাদের সান্ধ্যনৃত্যে পরিতোষণের ব্যবস্থা!

দেখলাম বন্ধু আমার রীতিমতো নৃত্যামোদী। সে চিন্তার আনন্দে মশগুল।

বল্লাম, যেতেই হবে একবার। মিসেস্ জুডিথ রাসেলের বিশেষ অনুরোধ।

কি, একেবারে নাচের পার্টনার নিয়ে যাবার অনুরোধ নাকি?

না, তা আর হবে কেন? সে কথা তো প্রোগ্রামেই রয়েছে। তবে নাচটাচ-এ যোগ দেওয়া আমার দ্বারা চলবে না শুনে অন্তত খানিকক্ষণ উপস্থিত থেকে তা দেখার অনুরোধ করেছেন তিনি।

নিশ্চয়ই যাচ্ছেন তাহলে?

যাবো।—বলেই বিদায় নমস্কার।

ন্যাশনাল হোটেলেই মধ্যাহ্ন আহার। কোথায় আবার খুঁজে বেড়াবো বড়ো রেস্তোরাঁ। সবে নতুন। ধীরে-সুস্থেই চলা ভালো।

নির্দিষ্ট কাজ নেই। একরকম শুয়ে গড়িয়েই দিন কাটে। আর বই পড়া। সন্ধ্যে সাতটায় সেণ্টারে নাচ। তার আগে অন্তত ঘণ্টা দুই আড়াই ঘুরে বেড়ানোর সময় হাতে।

বাঙালী পোশাকেই সাড়ে চারটে নাগাদ বেরিয়ে পড়ি। ঘুরে বেড়াই লক্ষ্যহীন। তবু লক্ষ্য চারদিকে। অনির্দিষ্ট গতি আমার খুব পছন্দ। নির্দিষ্টতার বাঁধাবাঁধিতে নেই বিস্তার-সুখ। ইচ্ছার পাখা মেলে উড়তে পারে না মন যেমন খুশি। তাতে অনেক সময়ই বড়ো অস্বস্তি।

ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছি অনেকদূর। নাইনটিস্থ স্ট্রীট থেকে একেবারে টেস্থ স্ট্রীটে। তাও আবার এলোমেলো চলতে চলতে। নানা দৃশ্য দেখতে দেখতে। এরই মধ্যে সময় অনেক পার অতর্কিতে। ছটা যে প্রায় বাজে এখন। আর সময় নেই ঘুরে বেড়ানোর।

এ বাড়িটি কিসের?—মনের কৌতূহল মেটাতে এক বৃদ্ধ পথচারীকে ছোট্ট প্রশ্ন।

একটু পায়চারি করেছিলেন ভদ্রলোক একা একা। ছুটির দিনে বুড়োবুড়িরাই আসলে রাজধানীবাসী। সকাল-সন্ধ্যে এমনি তাঁদের একটু ঘোরাফেরা। তারপর টেলিভিশনের সামনে বসে বুড়োবুড়িতে আর নয়তো সমবয়সীরা মিলে এড সুলিভ্যান আর স্টিভ অ্যালেনের বিশেষ অনুষ্ঠান নিয়ে গবেষণা। এই তো জীবন!

এ বাড়ির কথা জিগ্যেস করছেন? এ এক ঐতিহাসিক বাড়ি। এখন একে বলা হয় লিংকন মিউজিয়ম। আগের নাম ওল্ড ফোর্ডস্ থিয়েটার। জানেন তো আততায়ীর গুলিতে মৃত্যু ঘটেছিলো লিংকনের। এ বাড়িতেই সে ঘটনা ঘটেছিলো।—বলতে বলতে একটু থামলেন বৃদ্ধ। পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখ দুটো মুছে নিলেন। তাঁর কথা শুনে আমার গায়ে কাঁটা।

আর ঐ যে দেখছেন ঠিক উল্টোদিকের ছোট্ট বাড়িটা, ও বাড়িতে লিংকনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ। গুলির আঘাতে আহত প্রেসিডেণ্টকে এ বাড়ি থেকে নেওয়া হয়েছিলো ও বাড়িতে। সেখানেই তাঁর শেষ নিদ্রা!—এটুকু বলতেই আবার চোখ ছল্‌ছল্ বৃদ্ধের। রুদ্ধবাক।

ভদ্রলোকের অবস্থা দেখে আমারও মনে কান্নারোল। ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিতে চাই তাড়াতাড়ি। কিন্তু তখনো যে শেষ হয় নি তাঁর বলার কথা। সেটুকু বলে তবে ছাড়াছাড়ি।

সরকারী পরিচালনাধীন লিংকন মিউজিয়ম। শহীদ সভাপতির অসংখ্য জিনিসের প্রদর্শনী এখানে। নিশ্চয় করে একদিন এসে দেখে যাবেন।—বৃদ্ধের এ অনুরোধ রাখা সম্ভব হয় নি, এজন্যে আজও দুঃখ।

একটু এগিয়ে গিয়ে ক্যাবের অপেক্ষা। এখান থেকে ইণ্টারন্যাশনাল সেণ্টারের পথ জানা নেই। ক্যাব না নিয়ে তাই উপায়ও নেই।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম লিংকনের মৃত্যুর কথা। একজন মানুষের মৃত্যুতে এতো কান্না। সে কান্নার আজো শেষ নেই। বৃদ্ধ ভদ্রলোকের চোখ তাই আজো জল ছল্‌ছল্। আমাদের মহাত্মার মহামরণকে স্মরণ করিয়ে দেয় এই লিংকন স্মৃতি। এঁরা সত্যাশ্রয়ী। এঁদের জন্যে কান্নার কি শেষ আছে?

ক্যাবে বসেও সেই ভাবনা। ১৮৬০ সনে প্রেসিডেণ্ট পদে লিংকনের প্রথম নির্বাচন। দাসপ্রথা-বিরোধী লিংকন। দক্ষিণাঞ্চল তাই তাঁর বিরুদ্ধবাদী। কয়েক মাসের মধ্যেই বিচ্ছিন্নতার দাবিতে 'কনফেডারেটেড স্টেটস্ অব আমেরিকা' প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীনতা ঘোষণা। সঙ্গে সঙ্গে শুরু গৃহযুদ্ধ। উত্তরের তেইশটি রাজ্যের সঙ্গে দক্ষিণের এগারটি রাজ্যের আত্মঘাতী সংগ্রাম। প্রথম প্রথম মনে হলো দুর্ধর্ষ দক্ষিণী সৈন্যবাহিনী অপরাজেয়। শেষ

পর্যন্ত ১৮৬৫ সনের এপ্রিল মাসে আত্মসমর্পণে বাধ্য হলেন প্রবল পরাক্রান্ত দক্ষিণী অধিনায়ক রবার্ট লী।

ইতিমধ্যে কিছুদিন আগেই লিংকন দ্বিতীয়বার অভিষিক্ত হয়েছেন প্রেসিডেণ্ট পদে। সে অভিষেক ভাষণে তিনি বলেছেন—"With malice toward none ; with charity for all, with firmness in the right ; as God gives us to see the right, let us strive on to finish the work we are in ; to bind up the nation's wounds ; to care for him who shall have borne the battle, and for his widow and his orphan ·······to do all which may achieve and cherish a just and lasting peace among ourselves and with all nations."

এ ভাষণের তিন সপ্তাহ না যেতেই লীর আত্মসমর্পণ। তার দুদিন পরেই লিংকনের শেষ প্রকাশ্য বক্তৃতা। নিজেকে বিজয়ী বলে ঘোষণায় অসম্মতি। পরম উদারতায় পরাজিতকে আপন বলে গ্রহণ। গৃহযুদ্ধের অবসানে ১৩ই এপ্রিল ওয়াশিংটনে আলোক উৎসব। তার পরদিন রাত্রিতে দীপনির্বাণ!

সেণ্টারে এসে দেখি আসর সরগরম। জোড়ায় জোড়ায় নাচ শুরু। গান ঝম্ ঝম্। রেকর্ড বাজনার তালে তালে বল-নৃত্য।

প্রকাণ্ড হলঘর জুড়ে বাতাস ঝড়। প্রচণ্ড জোরে সাত ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে ঘুরছে যেন সপ্তরাগ। সেই আনন্দ-ঘোড়া প্রায় বল্‌গাহীন। ছুটছে তো ছুটছেই। থেমেই আবার মুহূর্ত পরেই তা-থৈ, থৈ। কী প্রাচুর্য এদের প্রাণশক্তির!

একের পর এক চলছে নাচ। বহু নাচিয়ে মেয়ের আমদানী। এক-একবার তাদের এক-এক জুড়ি। নানা দেশের লোকের সঙ্গে নাচের আসরে আলাপ-সালাপ। মন্দ কি!

আমি দর্শক। আমার মতো অরসিকও সেখানে জনকয়েক। কুশন-সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে দৃশ্য ভোগ। একজন চীনে আর একজন জাপানী আমার দুপাশে। নাচের মহড়ায় আমার মতোই তারা নামতে নারাজ। গল্পেসল্পে আমাদের বেশ সময় কাটে।

বাঃ, আমার পাকিস্তানী বন্ধুও তো বেশ নাচেন! সেই ন্যাশনাল হোটেলের বন্ধুর দিকে হঠাৎ চোখ। তরুণীর বাহুলতায় আবদ্ধ বলে হয়তো তাঁর একটু বাধোবাধো। অনভ্যস্ত পদক্ষেপে তালবিভ্রাট। তা হোক, তবুও লাগছে বেশ।

আর একজন পাকিস্তানী রীতিমতো পাকা নাচিয়ে। ফরিদপুরের গাঁয়ের খাঁ সাহেব। অথচ কেমন মার্কিনী কেতা দুরস্ত। এদেশে আছেন তিনি অনেক দিন। বয়স্ক লোক। মাথায় টাক। তা হলেও তাঁর মন তরুণ। আজই সেণ্টারে এসে প্রথম পরিচয়। তাঁর নাচ সত্যি দেখার মতো। নাচের ব্যাকরণ তাঁর মুখস্থ যেন। পায়ে পায়ে তাল। দেহ-মনে।

অনেক তো দেখা হলো, এবার যাই। পাশের ঘরে পানীয়ের ঢালাও ব্যবস্থা। অভাজনদের জন্যে সফ্‌ট্ ড্রিংক। এক গ্লাস খেয়ে ছাড়াছাড়ি নেই। লেমন শেষ করে গ্রেপ জুস্। মিসেস্ জুডিথ রাসেল নিজে হাতে তুলে দিলেন গ্লাস। তা আর না নিয়ে উপায় কি?

ভারত সফরে এসেছিলেন মিসেস্ রাসেল। ঘুরে গেছেন এশিয়ার নানান্ দেশ। বহু জিনিস নিয়ে এসেছেন তিনি সে সব দেশ থেকে। তার এক প্রদর্শনী বসবে কিছুদিন পর। আগে থেকেই সেখানে যাবার আমন্ত্রণ। কিন্তু তার আগেই যে আমি ওয়াশিংটন ছাড়া। তাই দেখা হয় নি আর সে প্রদর্শনী।

নাচের আসর ছেড়ে আসতে অনেক রাত। একা একা হোটেলে ফিরতে বুক দুর্ দুর্। নাচ-গান-পানের হল্লা চলেছে আরো কতো রাত, নেই জানা। ঘরে ফিরেও নিস্তার নেই, কি মুশকিল। ঘুমের দেশেও সে যেন কি নৃত্য-ধুম! নাকি বাইরে ঝড়?

নতুন পৃথিবীর স্বাগত সম্ভাষণ

রবিবারটাও কাটে ঘুরে-বেড়িয়ে।

সন্ধ্যায় একটি আশ্চর্য মেয়ের সঙ্গে আলাপ। এ আশ্চর্য বলার বিশেষ কারণ পরে প্রকাশ্য। কারণ তা পরের ঘটনা। প্রথম আলাপের কথাই প্রথমে বলি।

হোটেল প্রেসিডেন্সিয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে আছি ফুটপাথে। হঠাৎ একটি তরুণীর আবির্ভাব সেখানে। আমার প্রায় পাশাপাশি এসেই দাঁড়ান তিনি। একটু পরেই হঠাৎ প্রশ্ন:

আপনাকে দেখেছি যেন কোথায়?

হয়তো হবে। কিন্তু আমার তো কিছু মনে পড়ছে না।

ওয়াশিংটন ইণ্টারন্যাশনাল সেণ্টারে যান আপনি?

হ্যাঁ যাই। এরই মধ্যে গিয়েছি দিন তিনেক।

তা হলে সেখানেই দেখেছি আপনাকে।—প্রথম সাক্ষাতের সূত্র আবিষ্কারে মন সন্তোষ। শান্ত মেয়েটি যেন হঠাৎ মুখর। ভাংগা ভাংগা ইংরেজিতে অনেক প্রশ্ন। এ হোটেলেই থাকি শুনে আরো খুশি। গল্পে গল্পে পরিচয় জানাজানি।

তরুণী ডাক্তার। ফরাসী মেয়ে। মার্কিনী যে নন তা দেখেই মালুম। ফরাসী ফ্যাশানের নাম দুনিয়া-জোড়া। কিন্তু সাজে পোশাকে এ মেয়ে যে একেবারেই সাদাসিধে। এই সহজ সরলতার মধ্যেই তাঁর সৌন্দর্যের বিকাশ।

ভারি গরম! —ঠাণ্ডা দেশের মানুষ। আগস্টের ওয়াশিংটনে আমাদের চেয়ে বেশি কষ্ট হবারই কথা ফরাসী তরুণীর।

বল্লাম, চলুন আইসক্রিম খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হওয়া যাক। এই বলে পেনসিলভেনিয়া অ্যাভিন্যুর মোড়ের দিকে এগুই। যেখানে সেই বৃদ্ধার বিখ্যাত পানীয় প্রতিষ্ঠান। এ কয়দিনে আমি সে দোকানে অতি পরিচিত। রবিবারেও সে দোকান বন্ধ নয়।

আইসক্রিম থেকে কিন্তু ফ্রুট জুসই আমার বেশি পছন্দ। ডাক্তার তরুণীর মুখে হাসি-মধুর স্বচ্ছন্দ কথা।

দুগ্লাস রস পানে আমাদের তৃষ্ণা দূর।

আপনি এখন যাবেন কোথায়?

কিছুই ঠিক নেই। আমি লক্ষ্যহীন। আপনি?

আমার এক বন্ধুর অপেক্ষা করছি আমি। হয়তো এসে পড়েছেন এরই মধ্যে। আমায় কোথায় নিয়ে যাবেন। —উত্তর দেন ডাক্তার।

সেখান থেকেই আমরা দুজন দুদিকে।

ড্রাগ স্টোরে সস্তায় খাওয়া সারি। হোটেলে ফিরে আসি অন্য দিনের চেয়ে একটু সকাল সকাল। টেলিভিশনের সামনে বেশ লোক জমায়েত। সুয়েজ খালের ব্যাপার নিয়ে তখন খুব উত্তেজনা। লণ্ডনে পশ্চিমী কর্তাদের মধ্যে সলাপরামর্শ। প্রেসিডেণ্ট নাসের তাঁর নিজের দেশ নিজেদের মতো করে গোছাবেন তাতে ইংগ-ফরাসীর গায়ের জ্বালা। সুয়েজ খাল জাতীয়করণ নাকি হিটলারী ঔদ্ধত্যের নব রূপায়ণ। কাজেই শায়েস্তা করতেই হবে নাসেরকে। তারই ফন্দিফিকির আবিষ্কারের চেষ্টা। আন্তর্জাতিক মীমাংসা সম্মেলনের অন্তরালে লণ্ডন চক্রান্ত।

সে সব খবরের জন্যে মন উন্মুখ। সবার যেমন, আমারও তেমনি। লবীতে টেলিভিশনের সামনে আমিও তাই একজন তেমনি দর্শক। কিন্তু রূপবাণীতে সংবাদ শেষ হতেই বিজ্ঞাপনের যন্ত্রণা। প্রথমে ধরা কঠিন। সুন্দর একটি গল্প দিয়ে আরম্ভ। শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো, তন্বী তরুণীর মুখ-লাবণ্য অটুট রাখার জন্যে অপরিহার্য কোন বিশেষ জাতীয় টয়লেটের প্রচার ছাড়া ও আর কিছুই নয়। নতুন সিগ্রেটের সবাক সচিত্র মহিমা কীর্তন আর কতোক্ষণ। স্বাদে গন্ধে তার অতুলনীয়তার কথা শুনেও তুলনাহীন বিরক্তি। সিগ্রেট কীর্তন শেষ। বিজ্ঞাপনী প্রচার তবু যেন অফুরন্ত! ইনসোমনিয়ার প্রবল প্রাবল্য আমেরিকায়। সে রোগমুক্তির জন্যে নতুন পেটেণ্ট ঔষধের আবিষ্কার। একটি পিল খেলেই দিব্যি ঘুম। একটু ঘুমের জন্যে নিত্য পিল সেবন। এও কি কম বিড়ম্বনা! ইনসোমনিয়াই বা হবে না কেন? সর্বক্ষণ যে উত্তেজনা!

ঘুমের ছবি দেখেই ঘুমু ঘুমু। টেলিভিশনও সময় সময় ভারি বিরক্তিকর!

তার চেয়ে ওপরে গিয়ে ঘুমের শান্তি ভোগ অনেক ভালো। তাই যাই। শান্ত ঘুমে রাত কাটে।

সোমবার। দুদিন ছুটির আনন্দের পর কর্মস্রোত। আমারও কাজ যেন অন্তহীন। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি প্রায় একটানা। একের পর এক।

ওয়াশিংটন ইণ্টারন্যাশনাল সেণ্টার। দিনের প্রোগ্রাম শুরু এখান থেকে। আজ আলোচ্য 'আমেরিকার ধর্মবোধ ও ধর্মীয় স্বাধীনতা।'

সেণ্টারে এসেই নতুন পরিচিতদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ। আরো নতুন নতুন পরিচয়। এমনিভাবেই বেড়ে চলে পরিচয়-পরিধি।

আজ এতো লোক হবে সভায়, তা আশাতীত। এ যুগের মানুষের মন সাধারণত ধর্মবিমুখ এই ধারণা। আজকের সভায় লোকসমাগম সে ধারণার বিরুদ্ধ সাক্ষ্য।

একটিমাত্র আসন খালি। তা আবার একেবারে সামনের সারিতে। মিসেস্ মামুদের পাশে। সেখানেই গিয়ে বসে পড়ি।

এই যে মিঃ বোস! দেখেছেন আজকের নিউইয়র্ক টাইমস্?

না তো, কেন, কি ব্যাপার বলুন তো।—মিসেস্ মামুদের আচমকা প্রশ্নে আমি সচকিত।

শনিবারে, জানেন না বুঝি, আপনাদের নিয়ে যে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ফেঁদে বসেছে টাইমস্। আপনাকে আর ডাঃ সেনকে স্বাগত জানিয়েছে। অভিনন্দিত করেছে। লিখেছে—বলে সম্পাদকীয় সারমর্ম শুনিয়ে দিলেন আমায় মিসেস্ মামুদ।

তার পরেই সভায় বক্তৃতা আরম্ভ। খ্রীষ্টভক্তদের তিনটি শ্রেণীর তিনজন আর ইহুদীদের পক্ষ থেকে একজন বক্তা। চারজনই অধ্যাপক। তাঁদের মুখে নিজ নিজ ধর্মীয় মতবাদ ব্যাখ্যা আর আমেরিকায় ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বরূপ বিশ্লেষণ। সে সব বক্তৃতায় একটি বিষয় পরিষ্কার। আমেরিকায় গীর্জাগামী মানুষের সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি। বিভিন্ন ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সদস্য-সংখ্যা এখন আমেরিকায় প্রায় সাড়ে দশকোটি। গত বছর থেকে এবারের সংখ্যা ত্রিশ লক্ষাধিক। এ সভার আলোচনা থেকে এমনি নানা তথ্য লাভ। কিন্তু এ কি সত্যি সত্যি ধর্মবোধ প্রসারের পরিচয়?

বাক-স্বাধীনতার মতোই ধর্মীয় স্বাধীনতায় পূর্ণ আস্থা মার্কিন জনসাধারণের। ধর্মীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার বহিঃপ্রকাশ সচরাচর দেখা যায় না আমেরিকায়। অধ্যাপক চারজনের বক্তৃতা তাই পারস্পরিক আঘাত-প্রত্যাঘাতের প্রয়াসমুক্ত।

বেলা এগারোটায় এ সভা শেষ। তার আগে একটি ঘোষণায় নতুন অভিজ্ঞতা লাভের সম্ভাবনায় আনন্দ। মধ্যবিত্ত মার্কিন পারিবারিক জীবনের স্বরূপ কি? তা জানার সুযোগ আসন্ন। তেমনি একটি পরিবারের সঙ্গেই সান্ধ্য আহারে মিলিত হবার আমন্ত্রণ। রেস্তোরাঁ-কাফেটেরিয়ায় সান্ধ্য ভোজ নয়। তাঁদের পল্লীভবনে।

ঘোষণা মতো গেটে এসেই পাই সে আমন্ত্রণলিপি। সে পত্রের মধ্যেই পথ পরিচয়। যেতে হবে পাশের রাজ্য মেরিল্যাণ্ডে। আসছে শনিবার, পয়লা সেপ্টেম্বর। মিঃ ও মিসেস্ নিউটন ব্লেইকস্লির বাড়িতে। নিমন্ত্রিত আমি শুধু একা নই। আর একজনেরও সেই সঙ্গে আমন্ত্রণ। তিনি মিস্ কেলো। মিস্ কেলো ফিলিপাইনবাসিনী।

সেণ্টার থেকে গভর্নমেণ্টাল এ্যাফেয়ার্স ইন্সটিট্যুট। সাড়ে এগারটায় সেখানে যাবার কথা। সময় বেশি নেই। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি।

অ্যাপয়েণ্টমেণ্টের সময় নড়চড় হওয়া লজ্জার ব্যাপার। এ পর্যন্ত হয়নি তা। আমরা এ ব্যাপারে কড়াকড়িতে অনভ্যস্ত। সময়ের মূল্যবোধ সম্বন্ধে আমরা এখনো উদাসীন। কর্মব্যস্ততা নেই, তাই আমাদের সময় নষ্ট হেলায়-ফেলায়। এতো কাজ কোথায় যে, আমার দেশের সব মানুষ হবে কর্মব্যস্ত, হবে সময়-সচেতন?

এ দেশে প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। তার সহজ কারণ। এখানে উল্টো ছবি। কাজ খুঁজে হয়রান হতে হয় না এদেশের মানুষকে। কর্মীর প্রত্যাশায়ই কাজের প্রতীক্ষা। কতো রকমের কাজে এঁরা ব্যস্ত। তাই সময়ের মূল্যবোধে এদের সঙ্গে আমাদের এতো তফাত। আমার দেশের অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ তফাত একদিন ঘুচবে এই আশা।

প্রায় ঠিক সময়েই গাড়ি এসে পৌছয় ইন্সটিট্যুটে। দু তিন মিনিট লেট। তাতেই যেন লজ্জা লজ্জা।

ঘরে ঢুকতেই সেই সুন্দরীর সাক্ষাৎ। সেই রিসেপশনিস্ট তরুণী। যার পুতুল-ছবির পরিচয়ে আমি পরিতুষ্ট।

দেরির জন্যে আমার তরফ থেকে দুঃখ প্রকাশ।

না, না, ওজন্যে কিছু নয়। আপনি বসুন। এই মাত্র মিঃ লিণ্ডে খোঁজ করছিলেন আপনার। আমি জানাচ্ছি তাঁকে।—সঙ্গে সঙ্গেই ফোন তুলে খবর দিলেন রিসেপশনিস্ট।

হ্যালো, উই মিট এগেন। প্লিজ ক্যম ইন।—ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সাদর সম্ভাষণ। আন্তরিকতায় উজ্জ্বল মিঃ লিণ্ডের সে আহ্বান।

আপনাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। এক কাপ চা কি কফি খেয়ে নিন না।

আপত্তি নেই। চা-ই আসুক তা হলে।

চা-এর কথাই বল্লাম। আমেরিকায় চা-এর সুনাম নেই। তবু সেদিনের স্মৃতি স্মরণ। সত্যি, আশ্চর্য রকম ভালো লেগেছিলো এখানকার প্রথম দিনের চা!

চা এলো। আমার প্রোগ্রামের খসড়া তৈরি। তা নিয়ে আলোচনা চা খেতে খেতে। আমার ইচ্ছায় কর্মসূচীতে সামান্য অদলবদল। পুরোটা একবার পড়ে শোনালেন মিঃ লিণ্ডে।

কিন্তু শুধু প্রোগ্রাম খাড়া করলেই তো হবে না। সব জায়গায়ই চাই একজন করে স্পন্সর। তাঁর ওপর থাকবে আমার স্থানীয় ব্যবস্থাপনার সমস্ত ভার। তাঁদের সঙ্গে এখন যোগাযোগ করতে হবে মিঃ লিণ্ডেকে। তারপরে পাওয়া যাবে পাকা প্রোগ্রাম। তার জন্যে আরো কদিন সময় প্রয়োজন।

এর পরে প্রসংগান্তরে। মিঃ নিডহ্যামের কথা পাড়লেন মিঃ লিণ্ডে।

মিঃ নিডহ্যামকে মনে পড়ে আপনার?

কে তিনি?

বারে, তিনি যে আপনাকে বিলক্ষণ চেনেন বল্লেন। কোলকাতায় ইউ এস ইনফরমেশন সার্ভিস-এর ডিরেক্টর ছিলেন তিনি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। দু একবার দেখা হয়েছিলো তাঁর সঙ্গে। কিন্তু সে অনেক দিন আগের কথা। সে প্রায় বছর তিন হবে বোধ হয়।—এতোকাল পরেও সাধারণ আলাপ-পরিচয়ের কথা স্মরণে রাখা, আশ্চর্য ব্যাপার। এক বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই আর এক বিস্ময়।

মিঃ নিডহ্যামের কথা তুল্লেন কেন হঠাৎ?—জানতে চাইলাম।

কিছুক্ষণ আগে তিনি ফোন করছিলেন আপনার খবর পাবার জন্যে। আপনার হোটেলেও ফোন করেছিলেন।

তিনি জানলেন কি করে আমার এদেশে আসার কথা?

আজকের 'নিউইয়র্ক টাইমস্' দেখে। দেখেন নি আপনি 'টাইমস্' কি লিখেছে আপনাদের সম্বন্ধে?

দেখিনি, তবে শুনেছি।

সেই সম্পাদকীয় পড়েই আপনার খবর পেয়ে আপনাকে খোঁজাখুঁজি। কাল বিকেলে নিডহ্যামের বাড়িতে আপনার চা-এর নিমন্ত্রণ। তা গ্রহণ করতে পারলে খুবই খুশি হবেন মিঃ নিডহ্যাম।—এই বলেই নিডহ্যামের নাম-ঠিকানা লেখা একখানা কার্ড দিলেন মিঃ লিণ্ডে।

নিডহ্যামের আমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ। কাল বিকেলে এনগেজমেণ্ট আর নেই কোনো। অসুবিধেও তাই নেই কিছু। আর এ আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করা যায় কখনো? যিনি আমার স্মৃতির অতলে, তাঁর কাছ থেকে এ আহ্বান। কি করে ফেরাই।

বরং কেমন একটা শ্রদ্ধার ভাব আমার অন্তর জুড়ে। এমন হতে পারে, এ আমি ভাবতেই পারিনি যে! মিঃ লিণ্ডেকে সে কথা জানাই।

কথা বলবেন মিঃ নিডহ্যামের সঙ্গে?

নিশ্চয়ই। খুব আনন্দের সঙ্গে।

আমার কথায় ফোনে যোগাযোগ করে দিলেন মিঃ লিণ্ডে।

হ্যালো মিঃ বোস, চিনতে পারছেন আমায়?

এখন পারছি। কিন্তু আপনি কি করে এতোদিন পরেও মনে রাখলেন আমায়, তাই ভাবছি।

বেশ, সে সব কথা নিয়ে কাল আলোচনা হবে। কোলকাতার গল্প করবো। আসছেন তো কাল বিকেলে আমার বাড়িতে?

নিশ্চয় আসবো। কোলকাতার গল্প করার সুযোগ ছাড়া যায় কখনো এই দূর দেশে এসে?

আচ্ছা, বেশ। আপনার জন্যেই আমি অপেক্ষা করবো। গুডবাই।—আমার সম্মতি পেয়ে আনন্দ-মন মিঃ নিডহ্যাম। কোলকাতার কথায়, বাঙলা দেশের কল্পনায় তিনি উচ্ছ্বসিত।

আমরা ফোনে কথা বলছিলাম। মিঃ লিণ্ডে কি যেন এক মনে লিখছিলেন তখন। আমাদের কথা শেষ হতেই তাঁর কলম স্থির।

এখানেই শেষ নয়। কাল আপনার আরো ভালো প্রোগ্রাম আছে!

কি আবার?—মিঃ লিণ্ডেরই কথার পিঠে আমার জিজ্ঞাসা।

মিঃ ডালেসের সঙ্গে দেখা হলে আশা করি খুশি হবেন আপনি।

নিশ্চয়ই। নিঃসন্দেহে।

কাল সকাল সাড়ে দশটায় প্রেস কনফারেন্স ডেকেছেন পররাষ্ট্র সচিব। সেখানে আপনাদের কয়েকজন বৈদেশিক সাংবাদিকের বিশেষ আমন্ত্রণ।

কোথায় বসবে সেই সাংবাদিক সম্মেলন?

স্টেট ডিপার্টমেণ্ট ভবনের মেন কনফারেন্স রুমে। দোতলায়।—বলেই খস্ খস্ করে একখানা কার্ডে সব কিছু লিখে দিলেন মিঃ লিণ্ডে।

গভর্নমেণ্টাল এ্যাফেয়ার্স-এর কাজ শেষ। এবার গতি শলস্ কাফেটেরিয়ার দিকে। সে খুব দূর নয় এখান থেকে। হেঁটেই যাই।

সম্পাদকীয় সম্ভাষণ

স্যার, প্লিজ গিভ মি এ লাঞ্চ। আদারওয়াইজ আই ব্রেক।—হঠাৎ কানের কাছে কার সকাতর অনুরোধ। চমকে উঠে পিছন তাকাই।

অভাবনীয়। এমন অভাবী মানুষ অফুরন্তের দেশ আমেরিকায়? তায় আবার শ্বেতাংগ! বিস্ময়ের সঙ্গে কেমন যেন করুণাবোধ।

অর্ধ ডলার পেয়েই প্রার্থী খুশি। অল্প কথায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। তারপর হাসি-হাসি বিদায়।

কিন্তু এই লোকটির দৃষ্টিতে কেমন যেন একটা অস্বচ্ছতা। এ কি শুধু তার দারিদ্র্যের সাক্ষ্য, না আর কিছু? একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন আমার মনের পাতার এক কোণে।

কাফেটেরিয়ার কাছে আসতেই এক ঝলক হাসির বাতাস। সে বাতাসে উড়ে যাই আর কি! প্রাণখোলা প্রাণমাতানো হাসি।

খবরের কাগজ নিন। আজ খুব ভালো খবর।—এ বলেই যেন হাসিতে ফেটে পড়ে লোকটি। তার কাটা হাতটি তুলে তুলে তার সেই হাসিকে আরো জোরদার করার চেষ্টা।

কিন্তু কেন এই হাসি? হয়তো আমার পোশাক দেখে। তার কাছে বাঙালীর পোশাক যে সত্যি সত্যি অভিনব।

লোকটির হাত কাটা গেছে দ্বিতীয় যুদ্ধে। ফ্যাসিবিরোধী লড়াইয়ে অংশ গ্রহণের পুরস্কার। পংগু মানুষ। কিন্তু সাহায্যপ্রার্থী নয় কারুর কাছে। কাগজ বিক্রি করে আত্মপোষণ। আত্মসম্মান বোধের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যতোক্ষণ সম্ভব ততোক্ষণ প্রার্থনার হাত বাড়িয়ে কারুর কাছে মাথা নোয়ানো যে অপরাধ—ঈশ্বরের অবমাননা!

হ্যাঁ, আজকের একখানা নিউইয়র্ক টাইমস্ চাই আমার। নেয়া যাক এখান থেকেই। হাত কাটা প্রাক্তন সৈনিকের মুখে আবার একগাল হাসি। কাগজখানা ব্যাগে পুরে একটানা যাই খানাঘরে।

কাফেটেরিয়ায় লোক গিজ গিজ। আসন মেলে একখানা অনেক খুঁজে-পেতে। আমার সামনের আসনে সে রাতের এক নৃত্যসুন্দরী। শনিবারের সান্ধ্য আসর চোখে জ্বল জ্বল তাঁকে দেখে। তাঁর পাশেই তাঁর সেদিনের নাচের পার্টনার। দুজনেই চিনে ফেল্লেন আমায়। ফোর্ক নাইফ রেখে একে একে হাত মেলালেন। সে রাতের পরিচয়ের স্বীকৃতি। কিন্তু আমার সঙ্গে কথা বলার সময় নেই ওদের। নিজেদেরই যে ওদের অনেক কথা। সে কথা সব কুসুম-কোমল। নৃত্য-ছন্দের রঙে রাঙা। দুটি হৃদয়ে আগুন শিখা। ওদের খাওয়া-দাওয়া আগেই শেষ। হাসি মুখে বিদায় যাত্রা যাবার আগে। পরিচয় স্বীকৃতির পুনরাবৃত্তি।

বিকেলটা আজ মোটামুটি ফ্রি। আমাদের দূতাবাসে যাবার কথা মন থেকে দূর। কি আর দরকার। সন্ধ্যায় শ্রী ট্যাণ্ডনের বাড়িতেই তো হবে সবার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ। তার চেয়ে বরং হোটেলে গিয়ে খানিক গড়িয়ে নি।

তাই যাই। ঘরে ঢুকেই নিউইয়র্ক টাইমস্‌টা পড়ার লোভ। আমাদের নিয়ে আবার কি এমন লেখা হলো তাই দেখি।

হ্যাঁ, এই তো তৃতীয় সম্পাদকীয়। Visiting Editors শিরোনামা। অল্প কথায় দেশ জানাজানি, ভাব বিনিময় নিয়ে সুন্দর লেখা। সম্পাদক লিখেছেন :

In the operation of the State Department's program for International Exchange of Persons we are to have the pleasure of entertaining two distinguished editors from India. They are Mr. Dakshina Ranjan Bose., of Jugantar of Calcutta, and Dr, Sachin Sen, of the Indian Nation of Patna. They will be here for several months to talk with their American "opposite numbers", to meet Americans and American audiences, and to see our press in operation.

This is an excellent illustration of what this exchange program them can do. It can bring us distinguished visitors. It can give an opportunity of seeing the things in this country in which they are most interested. They will undoubtedly help us better to understand their country and some of its position

and viewpoints. We think it likely that they will go back to India with a better understanding of the United States and of American attitudes.

It is a pleasure, therefore, to make them welcome. We are glad that the program makes this sort of visits possible and we expect them to be profitable.

ঠিকই বলেছেন মিসেস্ মামুদ। এ নিশ্চয়ই উভয় অভিনন্দন। নিউইয়র্ক টাইমস্‌কে ধন্যবাদ!

আর এও সত্যি কথা, এ সফরে উভয়ত লাভ। আমাদের অনেক ভুল ধারণা দূর আমেরিকা সম্বন্ধে। ভারত বিষয়েও অনেক অজ্ঞতা আমেরিকায়! তা দূর করার প্রয়াস আমাদের তরফ থেকে।

অন্য দিনের মতোই বেরিয়ে পড়ি একটু আগে আগে। তবে সূর্য দৃষ্টিতে আর তাপ নেই তেমন। আমাদের দূতাবাসে গিয়ে এখন আর পাবো না কাউকে। সাড়ে চারটে তো বাজে বাজে।

তা হোক। একটু হেঁটে বেড়িয়ে শেষে ক্যাব নেবো। কোথায় কে জানে আবার গারফিল্ড স্ট্রীট? সেখানেই যে আজ সান্ধ্য মজলিস। শ্রী ট্যাণ্ডনের ককটেল পার্টি।

কোথায়ই বা আর ঘুরে বেড়াই? একটা গাড়ি কাছে পেয়ে উঠে বসি। বোটানিক গার্ডেনস্ দেখার মতো। ক্যাপিটল হিলের পাদশোভা। কী প্রশান্ত উন্মুক্ত উদ্যান! সারা পৃথিবী থেকে সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য গাছের অপূর্ব সমাবেশ।। এ উদ্যানের ঝরনা ধারায় অন্তর-স্নান। ফরাসী শিল্পী বার্থোল্‌ডির এ এক কল্পলোক। নিউইয়র্কের স্ট্যাচু অব লিবার্টি তাঁরই পরিকল্পনার মূর্তিরূপ। উদ্যানের প্রবেশপথে গ্র্যাণ্ট মেমোরিয়াল মনুমেণ্ট। সেও এক সৌন্দর্য-স্তম্ভ। অপরূপ।

বোটানিক গার্ডেনস্ থেকে গারফিল্ড স্ট্রীট। শহর প্রান্তে শ্রী ট্যাণ্ডনের সুন্দর বাড়ি। শান্ত নিরালা পুরীতে ককটেল সমারোহ। এখানে আসতে আমার একটু দেরি। অনেকের সঙ্গে আলাপ-সালাপ। রাত সাড়ে আটটা অবধি পান-ভোজন আর গল্পস্বল্প। তারপর ফিরতি পথে শ্রী ট্যাণ্ডনের দ্বিতীয় সহকারীর গাড়ি-সংগী। কথার জাল বুনি গাড়িতে বসে বসে। অতীত

বর্তমান নিয়ে দুজনে অনেক কথা। ভবিষ্যৎ নিয়েও স্পেকুলেশন! ভদ্রলোক ভারি চৌকস। আগে ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। এক দিক থেকে দূতাবাসের চাকরিতে বেশ আরাম। ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ দেশে দেশে।

হোটেলে ফিরতে ফিরতে আজ রাত দশটা।

চিঠিপত্র আছে কিছু আমার? —রিসেপশনিস্ট ঘুরে দাঁড়ান আমার প্রশ্ন শুনে।

হ্যাঁ, আছে একখানা। —আমার নম্বরের চিঠির খোপে হাত দিতেই একখানি দীর্ঘ খাম। গভর্ণমেণ্টাল এফেয়ার্স ইন্সটিট্যুটের আর্জেণ্ট চিহ্নিত জরুরী চিঠি!

আজই তো দুপুর বেলায় এতো কথা-বার্তা। এরই মধ্যে কি আবার এমন জরুরী ব্যাপার? ক্ষীণ বিস্ময়।

ঘরে গিয়েই সে চিঠি খুলি।

হায় ভগবান, এই ব্যাপার! নিউইয়র্ক টাইমস্-এর সম্পাদকীয়ের একটি কাটিং। তার বুক জুড়ে মিঃ লিণ্ডের ছোট্ট নোট—

Could not think of a better start in the U. S.!

আজ একটু আলসেমিতে আপত্তি নেই। বেলা সাড়ে দশটায় তো ডালেসের প্রেস-কন্ফারেন্স। বিছানা ছেড়ে তাই উঠতে কুঁড়েমি। শুয়ে শুয়েই বুকশেলফ্ থেকে একখানা বই তুলে নি। লুই ফিশারের বিখ্যাত বই 'গান্ধী'।

বইখানির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এক জায়গায় এসে চোখ থামে। ফিশারের এ কথার সঙ্গে আমার মনের কি সুন্দর মিল। তিনি লিখেছেন—

To Churchill power was poetry. He was a Byronic Napoleon. He passionately hated the foreign tyrannies which threatened England and directed against them all the moral fervor his genius could generate, but had no sympathy for Gandhi's moral struggle against British domination. He would have died to keep England free but detested those who wanted India free. To him, Indians were the pedestal of a throne.

ঠিক কথা। ক্ষমতা-মত্ততাই চার্চিলের জীবন-কাব্য। নিঃসন্দেহে তিনি দেশপ্রেমিক। কিন্তু অন্ধ তাঁর দেশপ্রেম। নীতি-হীন। অন্যের দেশপ্রেমকে

স্বীকারে যিনি কুণ্ঠিত তাঁর দেশপ্রেমও পৃথিবীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধালাভে অক্ষম। হয়েছেও তাই।

খণ্ডিত হলেও আমার ভারত আজ স্বাধীন। এশিয়া-আফ্রিকা অগ্নিগর্ভ। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের তবুও সাধের অন্ত নেই! এখনো এক একটি দেশকে সিংহাসনের সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহারের আপ্রাণ প্রয়াস। আর তাদেরই সঙ্গে আদর্শবাদী আমেরিকার সহযোগিতা! কি ভুল! কি ভুল!

অথচ এখনো কতো নীতি-কথা আমেরিকার মুখে। তারা নাকি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী! ঔপনিবেশিকতায় তাদের নাকি বিতৃষ্ণা! ভালো কথা। কিন্তু কথায়-কাজে কোথায় আজ তার সংগতি?

ইতিহাসের কথা এসে পড়ে। সাত-সাতটি সাম্রাজ্য খতম বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। নিষ্পিষ্ট গণ-আত্মা আপন শক্তিতে বিজয়ী জার-শাসিত রাশিয়ায়। এ ছাড়া আর ছটির ক্ষেত্রে আমেরিকার দান অপরিসীম। ইম্পিরিয়াল জার্মানী, নাৎসী জার্মানী, ফ্যাসিস্ত ইতালী, অষ্ট্রিয়া, তুরস্ক আর জাপান—আমেরিকার প্রচণ্ড আঘাতে এসব সাম্রাজ্যশক্তি খান্ খান্।

কিন্তু তবু আমেরিকার প্রতি আজকের পৃথিবী নয় কেন ততো শ্রদ্ধাশীল? কারণ স্পষ্ট। পূর্বেকার ঘোষিত আদর্শের সঙ্গে আজকের আমেরিকা ছিন্নযোগ।

এসবই ভাবছিলাম। হঠাৎ ফোন।

হ্যালো, হুস্পিকিং প্লিজ?

গুড মর্ণিং মিঃ বোস। ওয়ান মিঃ চৌধুরী ওয়ান্টস্ ইউ। প্লিজ স্পিক হিয়ার।

আমি অরুণ বলছি, দক্ষিণাদা! আপনি এখানে আছেন জানতে পেয়ে ঘুম থেকে উঠে চায়ের কাপ শেষ করেই সোজা চলে এলাম। এখান থেকেই অফিসে যাবো।

বেশ বেশ, ওপরে চলে এসো। আমি তো তোমার ফোন পেয়ে সবে বিছানা ছাড়লাম। এসো, গল্পে গল্পে তৈরি হয়ে নি।

আসছি।—তারপর মিনিট তিনেকের মধ্যেই অরুণ আমার ঘরে। হোটেল প্রেসিডেন্সিয়ালের ছ তলায় ৬০৭ নম্বর রুমে।

নাম শুনে গেছি অরুণের কোলকাতায়। কোলকাতা ইউসিস্-এর একজন প্রাক্তন কর্মী। সাক্ষাৎ পরিচয় এই প্রথম। কিন্তু প্রথম পরিচয়েই সে কতো আপন আপন।

আপনি বাঙালী পোশাকেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন বুঝি ?

হ্যাঁ, কেন বলো তো। আমাদের দেশ এখন স্বাধীন। আহার-বিহারে পোশাক-পরিচ্ছদে জাতীয়ভাবাপন্ন থাকাই স্বাধীন দেশের নাগরিকের সত্যকার পরিচয়। তুমি কি বলো ?—অরুণের প্রশ্নের উত্তরে আমার জিজ্ঞাসা।

সে কথা ঠিক। কিন্তু এদেশে এমনটি তো দেখা যায় না সচরাচর। আমেরিকার রাজধানীতে বাঙালী পোশাকে কদিন ধরে আপনাকে ঘোরাফেরা করতে দেখে এখনকার ভারতীয় মহলে বেশ একটু আলোচনা চলেছে।

বেশ তো, তাতে আর ক্ষতি কি ?

না, না, ক্ষতি আবার কিসের। যাক্ সে সব। বলুন আপনি আমাদের অফিস দেখতে যাচ্ছেন কবে ? যদি এখন ফ্রি থাকেন তো আজই চলুন না আমার সঙ্গে।

তোমাদের অফিস মানে 'ভয়েস অব আমেরিকা'য় ? আজ আর হয় না ভাই। একটু পরেই একটা এনগেজমেণ্ট।

কোথায় ?

মিঃ ডালেসের প্রেস কন্‌ফারেন্স। স্টেট ডিপার্টমেণ্ট বিল্ডিং-এ। মেন কন্‌ফারেন্স রুমে।

সে তো বিরাট ব্যাপার। তা হলে আজ আর হয় না। আর একদিন এসে নিয়ে যাবো বরং। কি বলেন ?—এই বলে উঠে পড়ে অরুণ।

বারে, উঠছো যে! আর আলাপ-পরিচয় যখন হয়ে গেলো রোজই একবার করে খোঁজখবর করবে। সুযোগ পেলেই তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরুবো।

সে তো ভালো কথা। আপনি বল্লে, নিশ্চয়ই আপনাকে নিয়ে বেড়াতে যাবো। আচ্ছা, এবার যাই তা হলে। অফিসের বড্ড তাড়া।

অরুণ চলে যায়। আমি আবার যেমনি একা তেমনি।

শূন্য ঘরে হাঁপিয়ে উঠে নিঃসংগ মন। নিষ্কৃতি চায় নিঃসংগতা থেকে। মাঝে মাঝে এমনি হয়। জনারণ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে আনন্দের প্রত্যাশা। আবার একা হবারও লোভ জাগে সময় সময়। মনের মতিগতি সত্যি দুর্বোধ্য !

একটি সাংবাদিক সম্মেলনে

নটার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ি। ব্রেকফাষ্ট সেরে ফিরে আসি হোটেল লাউঞ্জে। নতুন এক ভারতীয় মহিলার সঙ্গে দেখা হঠাৎ। দিল্লীর এক প্রখ্যাত সমাজ-সেবিকা তিনি। শ্রীযুক্তা পুষ্প মেহতা তাঁর নাম। সমাজসেবার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে এদেশে আগমন। তাঁরও আমার মতোই তিন মাসের সফর-সূচী। আমাদের রাষ্ট্রদূতের আত্মীয়া তিনি। একথা জানা গেলো তাঁর কথায়।

এবার যাওয়া যাক্। দশটা বাজে বাজে। নাইনটিন্থ স্ট্রীট ধরে দক্ষিণে সোজাসুজি। আগমন আগে আগে। তাই ভালো। কোথায় সভা-ঘর নেই জানা। খোঁজাখুজিও তাই চাই কিছু। কে জানে আবার কি আছে বিধি-বিধান! আগে আসায় এসব যা কিছুর সু-সমাধান।

তবে ভাবনার কিছুই নেই মোটে। দোতলায় উঠেই বাঁ দিকে কন্‌ফারেন্স রুম। সে দিকে যাবার পথে ত্বধারে নানা লিখিত ঘোষণা। পররাষ্ট্র বিষয়ে সচিত্র বিচিত্র নানা খবর। একটির দিকে দৃষ্টি স্থির। লোকবিনিময় ব্যবস্থায় এদেশ থেকে বিদেশে আর বিদেশ থেকে এদেশে কতো লোকের আসা যাওয়া। তারই গড় হিসেবের বিরাট অংক চোখ ধাঁধাঁয়।

আর একটু বিশদ খোঁজ নিতে গিয়ে আরো অবাক। এ পর্যন্ত প্রায় বিরাশী হাজার বিদেশীর আমেরিকা পরিদর্শন লোকবিনিময় ব্যবস্থার শুরু থেকে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৫৬-র মধ্যে। চল্‌তি বছরেই রেকর্ড সংখ্যা। বছর শেষে সে সংখ্যা দাঁড়াবে সাড়ে দশ হাজার। পৃথিবীর সাতাত্তরটি দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের লোক এরা। আর এদেশ থেকেও এ ব্যবস্থায় চল্‌তি বছরে মোট বিদেশযাত্রীর সংখ্যা হবে চার হাজার ছশো। এর মধ্যে পররাষ্ট্র বিভাগীয় নেতৃ-বিনিময় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত লোকসংখ্যাও বড়ো কম নয়। মোট চার হাজারের ওপর বিদেশ থেকে এদেশে। আর প্রায় ত্ব হাজার আমেরিকান বিদেশযাত্রী এখান থেকে।

এই বিপুল সংখ্যার সমুদ্রে হাবুডুবু। ভাবছিলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। কন্‌ফারেন্স হলের ভেতর তখনো চল্‌ছে সাজানো গোছানো। মাইক ফিটিং এবং আরো কতো কি?

আপনি মিঃ বোস?—হঠাৎ আমার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে' এক ভদ্রলোকের আকস্মিক জিজ্ঞাসা।

হ্যাঁ, আমিই বোস। কেন বলুন তো?—জানতে চাই।

আমি স্টেট ডিপার্টমেণ্ট থেকে এসেছি আপনাকে রিসিভ করতে, আপনার কোন অসুবিধে না হয় দেখতে।

ধন্যবাদ।

এরপর ভদ্রলোক আমায় নিয়ে গেলেন হল ঘরে। প্রকাণ্ড হল। সামনের কয়েক রো'র মধ্যেই বসিয়ে দিলেন। পাশাপাশি বসে আমাদের মধ্যে কথাবার্তা খানিকক্ষণ।

বাঃ, ভারি মজা তো! ইনিও যে দেখছি কোলকাতা-বিশেষজ্ঞ! কোলকাতার অনেক কথাই তাঁর জানা। ইউ-এস-ইন্‌ফরমেশন সার্ভিসে আমাদের দেশে ছিলেন তিনি বছর দুই। কোলকাতায়ও কাটিয়েছেন কিছু দিন। পুরনো বন্ধুদের কুশলবার্তা জানতে তাই তাঁর আগ্রহ। ভদ্রলোকের নাম মিঃ স্টুয়ার্ট পি লিলিকো। কোলকাতা ইউসিস-এ ইনি ছিলেন মিঃ স্মিথের স্থলবর্তী। ইংরেজি 'আমেরিকান রিপোর্টারে'র সম্পাদকও বোধ হয় ছিলেন তিনি কিছুদিনের জন্যে।

মেন কন্‌ফারেন্স রুম। দুপ্রস্থে সারি সারি আসন। মাঝখান দিয়ে পথ। পথের ধারেই একটি আসনে আমি বসে। আমার পাশে পর পর দুজন আমেরিকান সাংবাদিক। তারপরে কজন অন্যদেশী।

দেখতে দেখতে হল ভর্তি লোক। আর দেরি নেই। ক্যামেরাম্যানদের হুড়োহুড়ি।

আমাকে লক্ষ্য করে এতগুলো স্ন্যাপ? আমি কি এমন হোমড়া চোমড়া? আমার পোশাকের জন্যেই হয়তো এ কৌতূহল! আর নয় তো ভারতীয় বলে। ভারত সম্পর্কে আমেরিকার বিশেষ শ্রদ্ধা। রাজধানীতে অল্প কদিন থেকেই আমার এ উপলব্ধি। তা না হলে যেঁচে যেঁচে এতো লোকের এসে আমার সঙ্গে কথা বলার কি কারণ?

কিন্তু তা হলে কি হবে, আমাকে নিয়ে এতোটা বাড়াবাড়ি অন্তত একটি লোকের অসহ্য। একটি কণ্ঠে তাই উচ্চরব প্রতিবাদ।

Why do you take so much interest in him? Is it because he wears peculiar dress?—একজন ক্যামেরাম্যানকে সামনে পেয়ে আমার সামনের আসন থেকে বলে উঠলেন এক ভদ্রলোক।

টাই কোট প্যান্ট পরা ফিটফাট সাহেব! কিন্তু মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে ঠিক যেন ভারতীয়। তাই তাঁর কথায় আরো বেশি স্তম্ভিত। সে ভেবেই উত্তর দিতে যাবো, অমনি জবাব দিয়ে ফেল্লেন কে আর একজন। বোধহয় তিনি একজন আমেরিকান।। বল্লেন—

How do you call it peculiar? It is his national dress and he should certainly feel proud of it.

মুখের মতোই জবাব। জানি না, আমার সমালোচকের কানে পৌছেছিলো কিনা এ কথা। তবে এর পরে তিনি নিশ্চুপ একেবারে।

আন্দাজ আমার বর্তমান বিচারে অমূলক। সমালোচক ভদ্রলোক প্রাক্তন ভারতীয় হলেও এখন পাকিস্তানী। বিদ্বেষই যে রাষ্ট্রের ভিত্তি, সে দেশের মানুষদের সবার পক্ষে বিদ্বেষমুক্ত হওয়া সহজ নয়। এই পাক্ সম্পাদক তার প্রমাণ। ভারত-বিদ্বেষ তাঁর সাংবাদিকতার মূল পুঁজি, টের পেলাম। থাকুন তিনি তাই নিয়ে।

হ্যাঁ, এঁরই কথা বোধ হয় বলেছিলেন একদিন মিঃ কুক। তাই হবে। পাকিস্তানের কি একখানা ইংরেজী কাগজের একজন সম্পাদক এসেছেন, সে খবর জানিয়েছিলেন আমায় কথায় কথায়। খুব সম্ভব ইনিই তিনি।

ঠিক সাড়ে দশটা। সভামঞ্চে মিঃ জন ফষ্টার ডালেস কাঁটায় কাঁটায়। সারা হল ঘর জুড়ে থম্‌থম্ ভাব। বরফ-নীরব। গুরু-গাম্ভীর্যে সমস্যার সঙ্গে সভার সংগতি। একটি মাত্র কণ্ঠে কম্বু নিনাদ—

সন্তোষজনক মীমাংসা প্রস্তাব গ্রহণে নাসের সম্মত বলেই বিশ্বাস। আর আঠারো রাষ্ট্রের পরিকল্পনাটিও যথার্থই সন্তোষজনক।—মিঃ ডালেসের ছোট্ট বিবৃতির এই মূলকথা।

এর পরই ওঠে প্রশ্ন-ঝড়। এক এক করে প্রশ্ন এদিক থেকে সেদিক থেকে। পরপর তার সবগুলোর উত্তর ডালেসের তরফ থেকে। সময়

সময় চাপা চাপা ক্ষীণ হাসি তাঁর উত্তর-সঙ্গী। এ হাসি ক্রুর-কুটিল না আন্তরিক ?

ডালেস সম্পর্কে দুনিয়াব্যাপী বিরূপ ধারণা। তাঁর নিজের দেশেও তাঁর সম্বন্ধে লক্ষ্য করেছি অনেক বিরূপতা। তাঁর পররাষ্ট্রনীতিতে অনেক ভুল। সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বদ্ধমূল। কিন্তু তাই বলে তাঁর আন্তরিকতায় অবিশ্বাস বোধহয় অনর্থক।

ব্যক্তিগত সাক্ষাতে অনেক সুফল। অনেক ক্ষেত্রে অনেক মত বদল। পরোক্ষ পরিচয়ে যার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ প্রতিকূল ধারণা, প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে সে ধারণার কিছু পরিবর্তন।

সুয়েজ খালের সমস্যা সমাধানে মিঃ ডালেসের প্রয়াস। শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় আমেরিকার আন্তরিকতায় সারা দুনিয়ার গভীর সন্দেহ। ডালেসের কথা-বার্তায় সে সন্দেহের অনেকখানি ঘোর কাটে।

সুয়েজের সঙ্গে আমরা মূলত সম্পর্কহীন। কিন্তু তার সঙ্গে প্রায় কুড়িটি রাষ্ট্রের স্বার্থযোগ। সে যোগ সুগভীর। কাজেই শান্তিপূর্ণ সম্মানজনক মীমাংসা তার চাই-ই চাই।—দৃঢ়তা ফুটে ওঠে মিঃ ডালেসের স্পষ্ট কথায়। কিন্তু সোভিয়েট বিদ্বেষের তীব্রতাও প্রকাশ তার সঙ্গে সঙ্গে। সেই তো বিপদ।

লণ্ডনে অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ রাষ্ট্র সম্মেলন থেকে সদ্য আগত মিঃ ডালেস। সে সম্মেলনেরই একটি ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি রেগে লাল।

সোভিয়েট প্রতিনিধি মিঃ শেপিলফ। তাঁকে এককভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছিলেন ডালেস মার্কিন মীমাংসা-প্রস্তাব। আর ঠিক সেই সময়ই কিনা বাইরে সোভিয়েটের পক্ষ থেকে সে শান্তি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রচার!

এ প্রসংগ বর্ণনায় মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে ওঠেন মিঃ ডালেস। রাগে-ক্ষোভে তাঁর অন্তরে বুঝি অগ্নিজালা! সুয়েজ খাল সমস্যায় সংশ্লিষ্ট উভয় পক্ষই শান্তিকামী। শুধু তাঁরাই নন, লণ্ডন সম্মেলনে উপস্থিত আর সব রাষ্ট্রই সুয়েজখাল সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্যে উদ্‌গ্রীব। কেবল সোভিয়েট সে শান্তি পথের অন্তরায়। ডালেসের তাই বক্তব্য। এ ঘটনা উল্লেখের তাই কারণ।

কিন্তু বড়োদের এই পারস্পরিক বিদ্বেষ দূর হবে কবে? ছোট-খাটো সব আন্তর্জাতিক বিরোধের প্রেরণা তারা। ঈগল-ভল্লুক শান্ত হলেই বিশ্বশান্তি। তাদের মৈত্রীতেই বিশ্বমৈত্রী। আমার মন জুড়ে কেবল সে কথারই ঘুরপাক।

ডালেসের সাংবাদিক সম্মেলন শেষ। ঠিক এক ঘণ্টার আলোচনা।

বেরিয়ে আসতেই মিঃ লিলিকোর সঙ্গে আবার দেখা।

আর একদিন বসে আপনার সঙ্গে নিরিবিলি আলাপ করা যাবে। কি বলেন ?

বেশ তো, স্বচ্ছন্দে।—এই বলে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিয়ে এলাম লিলিকোর কাছ থেকে।

একটু এগুতেই এক বর্মী দম্পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ। এ ভদ্রলোকও একজন সাংবাদিক। নেতৃবিনিময় ব্যবস্থায় এদেশে আমাদেরই মতো একজন। তবে অনেক বেশি সুযোগসন্ধানী। বিদেশ যাত্রায় স্ত্রী সংগিনী। মার্কিণ সরকারের আমন্ত্রণের পুরোমাত্রায় সুযোগ গ্রহণ। দু একটি মাত্র কথা তাঁদের সঙ্গে। তাঁদেরও বাস হোটেল প্রেসিডেন্সিয়ালে।

তা হলে তো নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে।—এই বলে ছাড়াছাড়ি।

মিঃ কুকের সঙ্গে দেখা করে যাবো নাকি ? তাঁর বিশেষ অনুরোধের কথা মনে পড়ে। সুযোগ হলেই তাঁর খোঁজ করার অনুরোধ। না, থাক আজ। ওয়াশিংটন ছাড়ার আগে বরং আর একদিন দেখা করা যাবে।

বাঙলার পরিবেশে

বেলা প্রায় বারোটা। ছায়ায় ছায়ায় পথ পেরুই। নাইনটিন্থ স্ট্রীট ধরে সোজাসুজি পথ। মাঝামাঝি এসে একটু ভাবি।

খাওয়াটা সেরেই ফেলি। এই তো কাফেটেরিয়া। নামেও বাহার। গালভরা নাম। ইণ্টারন্যাশান্যাল কাফেটেরিয়া।

আন্তর্জাতিকতা বোধের প্রথম পরিচয়। ভেতরে ঢুকতেই চোখের সামনে নানা দেশের পতাকা সম্মেলন। ভারত-পতাকা সেখানে সমুজ্জ্বল।

শলস্‌-এর তুলনায় ইণ্টারন্যাশান্যালের পরিবেশ অনেক শান্ত। ভিড় কম। ব্যবস্থাও মোটেই খারাপ নয়। বরং তদারকের মাত্রা যেন এখানেই বেশি। সে কাজ মেয়েদেরই অনেকটা একচেটিয়া। রান্নাঘর খানাঘরে তাই শোভন। ওদের পরিবেষণায় বেশি পরিতৃপ্তি, তা মিথ্যে নয়।

নতুন কিছু খাবার সখ। সে সখ মেটাতে গিয়ে হতাশ। আর সব চল্‌তি খাবারের সঙ্গে নিই মাছের হালুয়ার মতো একটি জিনিস। এক বাটি। একটু খেয়েই সব বাতিল। সে বাবদ ষাট সেণ্ট খরচ মিছেমিছি। খাবার নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার এই বিপদ।

হোটেলে ফিরে লম্বা ঘুম। সূর্যক্লান্তির ফল। বিকেলে নিড্‌হামের বাড়ি যাবার প্রস্তুতি। তৈরি হয়ে লাউঞ্জে নেমে এসে খানিক বসি। সান্ধ্য কাগজে দিনের খবর পড়ি। কিন্তু আমাদের দেশের খবরের বড়ো অভাব। সে তৃষ্ণা মেটানো বড়ো কঠিন।

দিন পরিক্রমার শেষাংকে সূর্য-সারথি। গাছের মাথায় মাথায় তাঁর বিদায়ের সোনালি ছায়া। আমিও ডুপণ্ট সার্কেল পেরিয়ে এসে কনেটিকাট এভিন্যুর পাহাড়ীভূমি অতিক্রান্ত।

এই তো ড্রেসডেন বিল্ডিং। মোড়ের মাথায় বিরাট বাড়ি। অর্ধচন্দ্রাকারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অক্ষরে সাজানো বাড়ির নাম। এ বাড়িরই ছাব্বিশ নম্বর এপার্টমেণ্টে থাকেন নিড্‌হাম দম্পতি। এপার্টমেণ্ট মানে আমাদের দেশের ফ্ল্যাট।

রিসেপশনিস্টকে বলতেই এলিভেটরের দিকে পথনির্দেশ। যথাসময়েই উপস্থিতি। দরজায় নক করতেই সাদর আপ্যায়ন। সম্মুখে স্মিতহাস্য নিড্‌হাম। সহজ সারল্যে অতুলনীয় সে হাসি। হ্যাঁ, পরিচিত মুখই বটে। আগে যেন ঠিক মনে পড়ছিলো না। এতো ভুল ? কি লজ্জার কথা !

এপার্টমেন্টে ঢুকেই থমকে দাঁড়াই। খানিক এগিয়ে তবে ঘর। তার আগেই দু পাশের দেয়ালে যামিনী রায়। শুধু যামিনীদা নন, বাঙলার আরো কজন কৃতী শিল্পী। ঠিক শিল্পীরা নন, তাঁদের শিল্প। শিল্পের মধ্যেই তো শিল্পীর আত্মরূপ, তাঁর যথার্থ প্রকাশ।

ঠিকই বলেছিলেন একবার যামিনীদা, আমার ফটো তুলে কি হবে, আমার ছবিই আমার ফটো। 'ওখানেই আমার ঠিক ঠিকানা।'

অনেক বছর আগের কথা। আমরা তখন আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে প্রতিবেশী। পাশাপাশি বাড়িতে বাস। এতোকাল পরে এই সুদূরে সে কথার প্রতিধ্বনি।

হলঘরে গিয়ে আরো বিস্ময়। ছবিময় চতুর্দিক। অধিকাংশই যামিনী রায়ের। তা ছাড়া গোপাল ঘোষের, সুনীলমাধব সেনগুপ্তের, আরো কয়েকজনের।

কী অদ্ভুত বেড়াল এঁকেছেন যামিনী রায় ! তাঁর সেই প্রিয় বেড়ালটিই এখানে বুঝি ! আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে তাঁর স্টুডিওতে দেখতাম সে বেড়ালটি সব সময় ঘুর্ ঘুর্। বন্ধুবর সুনীলমাধবের আঁকা মাথায়-কলসী দুটি জয়পুরী মেয়ে। আর গোপাল ঘোষের অপূর্ব দার্জিলিং দৃশ্য এখনো চোখে জ্বল্‌জ্বল্।

শুধু ছবি নয়, বাঁকুড়ার প্রকাণ্ড এক কাঠের ঘোড়া ঘরের এক কোণে। একটা হাতী, আরো কি কি পুতুল। শান্তিনিকেতনের শিল্পসম্ভারের কিছু কিছু। দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি মূর্তি আর বাসনপত্তর। মার্কিণ রাজধানী ওয়াশিংটনে রীতিমতো একটি সুন্দর ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম ! মনে হলো আমি বাঙলা দেশে !

মিসেস্ নিডহাম কোথায় ?—এতোক্ষণে ও তাঁর সাড়া না পেয়ে জিগ্যেস করলাম।

সেকথা আর বলার নয়। আমার বাবা-মা দুই-ই অসুস্থ। তাঁরা নিউইয়র্কে। বাবা বেশি পীড়িত। তিনি হাসপাতালে। তাঁদের পরিচর্যার

জন্যে আমার স্ত্রীও নিউইয়র্কে। আমিও যাই মাঝে মাঝে। তখন তিনি আসেন এখানে। আমাদের একজনকে থাকতেই হয় বাবা-মার কাছে।—ভক্তিস্নিগ্ধ উত্তর। ভারি ভালো লাগলো শুনতে। ইয়োরোপ-আমেরিকায় বুড়ো বাপ-মার জন্যে ছেলেমেয়েদের দরদ নেই, শ্বশুর-শাশুড়ী উপেক্ষিত, এ ধারণা সবক্ষেত্রে সত্যি নয়। নিড্হাম দম্পতি তার প্রমাণ।

কতো বয়েস তাঁর বাবার, এ প্রশ্ন জিগ্যেস করতেই মিঃ নিডহাম চুপ খানিক। ক্ষণিক পরেই আবার সরব।

জানেন মিঃ বোস, বাবার বয়েসের কথা উঠতেই চট্ করে আমার মনে পড়ে গেলো আমাদের জীবন-নীতির সঙ্গে ভারতীয় জীবন-দর্শনের তফাতের কথা। আমার বাবার বয়েস সত্তরের ওপর। মা'র বয়েস তার কাছাকাছি। কিন্তু আমাদের তো আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই! বয়েসের কথা তো আমরা কোনদিন ভাবি না।—বলেই আবার একটু থামেন মিঃ নিডহাম। তারপর আবার শুরু।

এ ব্যাপারে আপনাদের ব্যবস্থা কিন্তু ভারি সুন্দর। পঞ্চাশে পা দিয়েই মনকে ঈশ্বরমুখী করবার উদ্যোগ। আমার সত্যি ভালো লাগে এ আইডিয়া।

ভালো তো বটে। কিন্তু আজকের দিনে কোথায় আর সে আইডিয়া। পশ্চিমী সভ্যতার চাপে আজ তা কেবল পুঁথিপৃষ্ঠায়।—মনে মনে ভাবি।

কথায় কথায় গীতায় বর্ণিত স্থিরপ্রাজ্ঞের প্রসংগ তোলেন নিডহাম। জিগ্যেস করলেন সেই সংস্কৃত শ্লোকটি মনে আছে কিনা আমার। ভাগ্যি মনে ছিলো, তাই বল্লাম :

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥

এ শ্লোকের ব্যাখায় আর একটি শ্লোকের উল্লেখ। যেখানে সমুদ্রের সঙ্গে স্থিতধী মানুষের তুলনা। অসংখ্য নদ-নদীকে বুকে ধরেও সমুদ্র অচঞ্চল। তেমনি বিষয়ের মধ্যে থেকেও স্থিরপ্রাজ্ঞ মানুষ অবিচল।

আপূর্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥

শ্লোক শুনে মিঃ নিডহ্যাম উচ্ছ্বসিত। বাঙ্‌লার সঙ্গে ভারতের সঙ্গে যে তাঁর প্রাণের যোগ!

হঠাৎ এক ভদ্রমহিলার আবির্ভাব। নিডহ্যামের মাধ্যমে আমাদের পরিচয়। পূর্ব এশিয়া সম্বন্ধে মহিলার প্রচুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। কোলকাতায়ও ছিলেন তিনি কিছুকাল।

সান্ধ্য পান-বৈঠকে তিনজন মিলে নানারকমের গল্প-সল্প। সে গল্প ফুরোয় না যেন। কিন্তু শেষ তো চাই-ই।

বিদায় পর্বে নয়া আমন্ত্রণ।

মিঃ বোস, শনিবার এখানে আপনাকে ডিনারে চাই। সেদিন মিসেস্ নিডহ্যাম ও আমার মিলিত অভ্যর্থনা আপনার জন্যে। আসবেন কিন্তু।

নিশ্চয়ই আসবো। যে আনন্দ পেলাম আপনাদের সঙ্গে কথা বলে, আসবো বৈকি! ধন্যবাদ।

রাজপথে নেমে আকাশে চোখ। আমি একা। এ দিকটা নিরিবিলি। স্বচ্ছ নীলাকাশে রূপালী চাঁদ। সেই চাঁদের স্নিগ্ধ আলো আকাশজুড়ে সবখানে। এ চাঁদ যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সদিচ্ছা-প্রতীক। এই পৃথিবীর সব মানুষের মনের আকাশও এমনি সদিচ্ছার শুভ্র আলোয় যাক্ ছেয়ে।

ভাবছি আর চল্‌ছি। মিষ্টি বাতাসে গা ভাসিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা আলোয় পথ চল্‌ছি। ডুপণ্ট সার্কেলের কাছে এসে হঠাৎ চমক।

আর একটা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট তো এখনো বাকি! ভুলেই গিয়েছিলাম একেবারে। অবশ্য তেমন জরুরী কিছু নয়। তবে একজন ভারত-কন্যা কিছু বলবেন, তা শুনবো না? সে সভায় যোগদানে শ্রী গোয়েল ও শাস্ত্রীজীর বিশেষ অনুরোধ। অন্তত প্রশ্নোত্তরে শ্রীমতী রাধালক্ষ্মীকে কোন অসুবিধায় না পড়তে হয় তার জন্যে।

সেণ্টারে এলাম। দূর নয় খুব ডুপণ্ট থেকে। এই তো সভা সবে শুরু। এ যেন একটি ছোট্ট ইউ এন ও'র কাউন্সিল সভা। পৃথিবীর নানা প্রান্তের সাতাশটি দেশের প্রতিনিধি সমাবেশ। বোর্ডে বিভিন্ন দেশের নাম ও প্রতিনিধি সংখ্যার উল্লেখ। তার পশ্চাতে সুন্দর করে সাজানো নানা জাতির রাষ্ট্র-পতাকা।

শ্রীমতী রাধালক্ষ্মীরই প্রথম বক্তৃতা। বিশ্ব-রাজনীতিতে স্বাধীন ভারত। এই তাঁর বক্তৃতার বিষয়। সংক্ষিপ্ত হলেও সুন্দর ভাষণ। সমবেত সকলের প্রশংসা লাভ। তারপরে প্রশ্নোত্তর। ভারতে জাতিভেদ সমস্যা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় দেশের অগ্রগতি, এমনি কয়েকটি বিষয়ে প্রশ্ন। আমাদের এক এক জনের মুখে তার এক বা একাধিক উত্তর।

দ্বিতীয় বক্তৃতা মিসেস্ মামুদের। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা। জনাব জিন্নার মহিমা কীর্তন সে প্রসংগে। জীবনের নানা ক্ষেত্রে পাকিস্তানে গণ-চেতনার উন্মেষের উল্লেখ। বেশ ভালো একটি ভাষণ দিলেন মিসেস্ মামুদ। ভালো লাগলো শুনতে। কাশ্মীর নিয়ে প্রশ্ন উঠলে এড়িয়ে গেলেন তা সুকৌশলে। রাষ্ট্রসংঘেরই তা আলোচ্য থাক। বেশ কথা।

এবার মিশর। মিশরের কথা শোনার জন্যে সবারই মধ্যে গভীর আগ্রহ। লিখিত ভাষণ পড়ে শোনালেন মিশর প্রতিনিধি। তিনি ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর ভাষণে উত্তেজনার সুর। মিশরবাসীর দুঃখ-দুর্দশা মোচনে আসোয়ান বাঁধ অপরিহার্য। সে পরিকল্পনা সার্থক করতেই হবে। তাঁর ভাষণে তার ওপরেই বিশেষ জোর।

দরকার হলে কি মিশর আত্মবিক্রয় করবে রাশিয়ার কাছে আসোয়ান বাঁধের জন্যে ?—ভাষণ শেষে শ্রোতাদের মধ্যে থেকে প্রথম প্রশ্ন।

আসোয়ান বাঁধের জন্যেই সুয়েজ খাল জাতীয়করণ। আর তার বিরোধিতা প্রতিরোধের জন্যে মিশরের পক্ষ থেকে সমস্ত পৃথিবীর সহযোগিতা প্রার্থনা। কোন দেশের কাছে আত্ম-সমর্পণের প্রশ্ন ওঠে না এতে। অন্য যে কোন দেশের মতোই রাশিয়ার সাহায্যও প্রার্থিত। আর প্রতিশ্রুত সাহায্য দানে আমেরিকার অস্বীকৃতির ফলেই এ অবস্থা, এ কথাটা মনে রাখা দরকার।—শ্রোতাদের মধ্যে থেকেই এই অবাঞ্ছনীয় প্রশ্নের জবাব দিলেন আর একজন মিশরীয় প্রতিনিধি। জাতীয় মর্যাদার প্রশ্নে জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ উত্তর।

কিন্তু একই দিনে সুয়েজ খাল জাতীয়করণ সম্পর্কে দু রকম কথা ? সকাল বেলা আজই মিঃ ডালেস যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। আমেরিকার প্রতিশ্রুত সাহায্য প্রত্যাহার কারণ নয় সুয়েজখাল জাতীয়করণের। আসলে নাসেরের এ পরিকল্পনা দু বছরের পুরনো। প্রেসিডেন্ট নাসের নিজেই নাকি কবে স্বীকার করেছেন সে কথা। যাক্‌গে, ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি আর

লাভ? ভাবনা বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে। গোলমাল একটা বেঁধে না গেলেই বাঁচোয়া। ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরে যাই, সেই চিন্তা।

গ্রীসের কৃষি-শিল্প ও দেশের বর্তমান অবস্থা নিয়ে বল্লেন গ্রীক প্রতিনিধি। সেখানেও সাইপ্রাস নিয়ে সমস্যা। সর্বত্রই কেবল সমস্যা আর অশান্তি। অথচ শান্তি শান্তি করে পৃথিবীময় আমাদের কতো মাতামাতি! অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করে শান্তির জন্যে হাহাকার!

এর পর ছবি দেখার পালা। মিশরের অগ্রগতির ছায়াচিত্র। অতীত ও বর্তমান গ্রীক সভ্যতার রংগীন রূপছায়া। দুই-ই নির্বাক চিত্র। কিন্তু তবু মুখর। হাজার হাজার বছরের ইতিহাস-পুরুষ মনের মুকুরে। কতো অল্প সময়ের মধ্যে কতো বাণীরূপের তরংগ উত্তাল।

ছায়াচিত্র প্রদর্শনের পর রেকর্ড গান। নানাদেশের গানে গানে মুগ্ধমন। ভারতীয় সংগীতের প্রত্যাশা। কিন্তু শেষ অবধি আশাহত। আমি দেশ থেকে নিয়ে এসেছি দু খানি রেকর্ড। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের গান। তার একখানাও যদি নিয়ে আসতাম এখানে! কিন্তু আমি কি জানি, এখানে আবার গানের ব্যবস্থা? তাই আফশোষ।

অনুষ্ঠান শেষ প্রায় মাঝরাতে। বাকি রাতটুকু ঘুমের দেশে। সকালে উঠেই নতুন চিন্তা। আজ কি নিয়ে শুরু, কোথায় শেষ।

একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা

খুনখারাপি, আত্মহত্যা, ছেলেমেয়ে চুরি। এ নিয়ে এ দেশের খবরের কাগজে বড়ো বাড়াবাড়ি। অবশ্য সব কাগজে নয়। অনেক কাগজে।

সকালবেলা লাউঞ্জে বসে কাগজ খুলি। প্রথম পাতায়ই চাঞ্চল্যকর এক প্রকাণ্ড খবর। আত্মহত্যার সচিত্র সংবাদ।

প্রায়ই এমনি খবর বড়ো বড়ো শিরোনামায় প্রকাশ। সময় সময় একেবারে পৃষ্ঠা জুড়ে ব্যানার হেডলাইন! আমাদের দেশে এমনি ধারা অকল্পনীয়। দু দেশের দূরত্ব অনেক। ঠিক কথা। চিন্তায় কর্মে অনেক তফাত। তবু সাংবাদিকতায় এতোটা পার্থক্য অভাবনীয়। অথচ আমাদের দু দেশেরই কিন্তু সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি ইংরেজের কাছে।

এ কয়দিনের চমকপ্রদ ঘটনার দু একটি বলি।

প্রথম ঘটনা। শুধু ঘটনা নয় দুর্ঘটনা। ব্যাপারটি ঘটেছিলো সানফ্রান্সিস্কোয়। চব্বিশতলা বাড়ির সর্বোচ্চ তল থেকে লাফ দিয়ে পড়েছে এক মোটর ড্রাইভার। লোকটি মধ্যবয়স্ক। আত্মহত্যার কারণ অজানা। এ রকম অসংখ্য ঘটনার মধ্যে এ একটি রেকর্ড। চব্বিশতলা থেকে লাফ! চমক শুধু এখানে নয়। অন্যত্রও। ভ্রাম্যমান এক ফটোগ্রাফার ড্রাইভারের লাফ দেয়ার মুহূর্তেই ক্যামেরায় ধরেছে সেই দৃশ্য। আশ্চর্য তৎপরতা! কি করে সম্ভব? বিস্ময়ে বিমূঢ় আমি। তবে কি সাজানো ব্যাপার?

আরেক ঘটনা। এও সানফ্রান্সিস্কোয়। এও শুধু মাত্র একটি ঘটনা নয়। ছোট্ট একটি প্রেমের গল্প যেন। মর্মান্তিক। খবরের কাগজের খবর। তবু গল্প করেই বলি।

গুণে সে ন্যূনা নয়। রূপেও অতুলনীয়া। বাইশ বছরের মিস্ এলিজাবেথ এণ্ডারসন। ডাকনাম ফ্লোরা। ক্যালিফোনিয়া ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট সে। ভালো তাকে বেসেছে অনেকে, সে কিন্তু একজনকে। একটি ধনীর ছেলেকে। নাম তার মিঃ স্ট্যানলি গর্ডন। বয়েস আঠাশ। এ বয়সেই একজন পাকা পাইলট। সেও রূপে সুন্দর, গুণে অনন্য।

অনেক আব্দার প্রেমিকের। অজস্র দাবী প্রেমিকার। তাদের বিয়ের ঠিক্‌ঠিক্। বিয়ে হবে। রাগে অনুরাগে দিন যায়। একদিন মেয়েটি বল্‌লে—একটা এরোপ্লেন কেনো। দু জনে বিশাল আকাশের নির্জনতায় দু জনকে নতুন করে আবিষ্কার করবো।

ছেলে রাজী। কেনা হলো এরোপ্লেন। তারপর বিস্তীর্ণ অবকাশ হাতে নিয়ে একদিন আকাশে উধাও।

প্লেন ছুট্‌ছে। আনন্দ আর আনন্দ ' কিন্তু আধঘণ্টা যেতেই হঠাৎ কথা শেষ। কেন কে জানে। হঠাৎ কি যেন হলো মেয়ের মনে। অকস্মাৎ এক লাফ্ উড়ন্ত প্লেন থেকে। গায়ের সোয়েটারের প্রান্ত টেনে ধরে বাঁচানোর চেষ্টা প্রিয় বান্ধবীকে। বাঁচাতে পারেনি ছেলেটি। মাধ্যাকর্ষণের অনিবার্য পরিণাম। নিজের হাতে বোনা শাদা সোয়েটারের অংশবিশেষ প্রিয়তমের হাতে রেখেই মেয়েটি শূন্য থেকে পড়ে' মরলো। হতভাগিনী !

দুটোই আত্মহত্যা। দুঃখের থেকে চমক। কান্না থেকে বিস্ময় ! বৈচিত্র্যমুগ্ধ জাত। মরণেও রোমাঞ্চ আবিষ্কার। কেবল রেকর্ড করার বাতিক !

গতি ভালো। বাড়াবাড়ি নয়। উন্মাদনা প্রশংসনীয়। উন্মাদ হওয়া নয়। এ জাতটা ছুট্‌ছে তো ছুট্‌ছেই। কিন্তু কোন্ মায়া-মরীচিকার পিছে ? এ প্রশ্ন আমার মনে। উত্তর খুঁজেছি, পাইনি। এরা থামতে পারবে তো ? জানে তো কোথায় থামতে হবে ?

আজ ২৯শে আগষ্ট। বুধবার। সূর্য বাড়ছে। গভর্ণমেণ্টাল এফেয়ার্স ইন্সটিট্যুটেই প্রথম কাজ। মিঃ লিণ্ডে অপেক্ষা করছেন আমার জন্যে।

জর্জিয়ার কলম্বাস শহরের রবার্ট ব্রাউনকে চেনেন ?—মিঃ লিণ্ডের অফিসে যেতেই তাঁর প্রথম প্রশ্ন।

মনে করার বিফল চেষ্টা। ইতস্তত স্মৃতি-চারণা।

কলম্বাস শহরের একটি দৈনিক কাগজের সম্পাদক মিঃ ব্রাউন। তিনি চিঠি লিখেছেন। জানতে চেয়েছেন, অক্টোবরের প্রথম দিকে সেখানে যাওয়া সম্ভব কি না। আমি রাজী কি না কয়েকটি বক্তৃতা দিতে। আমি ভাবছি।

প্রসংগক্রমে আরো জানালেন মিঃ লিণ্ডে, মিঃ ব্রাউন কিছুদিন আগে কোলকাতায় গিয়েছিলেন। সেখানে শুনেছেন আমার কথা। তাই উৎসাহী।

মনে পড়লো মিঃ ব্রাউনকে। দেখা হয়নি কোলকাতায়। কিন্তু মিলিত হবার কথা ছিলো আমাদের একটা পার্টিতে। হঠাৎ অসুস্থতায় সেখানে আমার অনিবার্য অনুপস্থিতি।

মিঃ ব্রাউনের প্রস্তাবে আমার সম্মতি। শুনে খুশি মিঃ লিণ্ডে।

কার্যসূচী সেভাবেই তৈরি করার অনুরোধ আমার তরফ থেকে।

কথায় কথায় উঠলো ন্যাশনাল প্রেস ক্লাব অফ ওয়াশিংটন দেখার কথা। সঙ্গে সঙ্গেই চিঠি লিখে দিলেন লিণ্ডে মিঃ মেলভিন বার্জহিম্‌কে। প্রেস ক্লাবের কর্তাব্যক্তি বোধহয় বার্জহিম।

সে ব্যবস্থা সম্পূর্ণ। পরদিন সকালেরই সেই কর্মসূচী।

হঠাৎ একটা গোলমালের কথা মনে পড়ায় মন তোলপাড়। আসছে শনিবার যে মেরিল্যাণ্ডে ডিনারের আমন্ত্রণ! এদিকে মিঃ নিডহ্যামের নিমন্ত্রণও আবার ঠিক সেদিন। সে নিমন্ত্রণ গ্রহণে কি মুস্কিল!

নিডহ্যামকে একটা ফোন করা যাক। তাই করলাম। জানালাম খুলে সব কথা। ওপার থেকে সাড়া।

বেশ তো। শনিবার না হয়তো শুক্রবার সন্ধ্যায়ই মেলা যাবে। মিসেস্‌ নিডহ্যামকে জানিয়ে দেবো যাতে একদিন আগেই এসে যান তিনি।—বিনীত প্রস্তাব।

বল্লাম, সেই ভালো।

সামনের হলঘর থেকে হঠাৎ ফোন। রিসেপশনিস্ট কি বলছেন যেন। এক কথায় জবাব মিঃ লিণ্ডের। তারপর আমায় জিজ্ঞাসা—

পাকিস্তানী একজন সম্পাদক এসেছেন। আপনার আপত্তি না থাকে তো তাঁকে ডেকে পাঠাই।

এ সময়ে আসার কথা ছিলো নাকি আগে থেকেই? না, এটা সাজানো ব্যাপার? —মুহূর্ত চিন্তা। তারপরেই আমার উত্তর।

না, আপত্তির কি থাকতে পারে এতে?

ভাবছিলাম, আপনাদের মধ্যে তো অনেক বিষয়েই মতভেদ। কাজেই ·····।

না, না, তার জন্যে কি আছে? মতভেদ সত্বেও আমরা প্রতিবেশী। কয়েক বছর আগেও তো একই ছিলাম আমরা। দুজন আমেরিকানের মধ্যেও

তো থাকে মতবিরোধ। তার জন্যে আলাপ-আলোচনায় আনন্দ উপভোগে একত্রে অংশ গ্রহণে বাধা কোথায়? তাছাড়া কোন বিরোধই কি আর চিরস্থায়ী?

মিঃ লিণ্ডের চোখ-মুখে খুশির ছায়া। আমার যুক্তির সত্যতা মেনে নিয়ে বহির্গমন। পাক্-সম্পাদককে নিয়ে ক্ষণপরেই পুনঃ প্রবেশ।

আমাদের দুজন সাংবাদিকে চোখাচোখি।

আরে ইনি যে সেই তিনি! ডালেসের সাংবাদিক সম্মেলনে আমার সমালোচক।

মিঃ লিণ্ডের মাধ্যমে পরিচয়।—ইনি পাকিস্তানের দৈনিক 'স্টার' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ আজিজ বেগ। আর ইনি……

দুজনে পাশাপাশি বসি আমরা। দুদেশের সাংবাদিকতা নিয়ে সামান্য কথাবার্তা। 'ডন' পত্রিকার প্রাক্তন সহকারী সম্পাদক মিঃ বেগ।

পাকিস্তানের স্তম্ভ-পত্রিকা 'ডন'। তার নামোচ্চারণে স্মরণচিত্রে জনাব আলতাফ হোসেন। তিনি আমাদের পুরোনো বন্ধু। অবিভক্ত বাঙলার সরকারী প্রচার অধিকর্তা। 'ডন'-এর সৃষ্টি থেকেই তার সম্পাদক। ভারত-বিদ্বেষ প্রচারে মুক্তহস্ত। তাঁর কাছে যাঁর সাংবাদিকতা শিক্ষা, তিনিই বা আর কম যাবেন কেন? মনে মনে ভাবি। হাসি।

যা ভেবেছি তাই। মিঃ বেগ তুলে বসলেন কাশ্মীর প্রসংগ।

কাশ্মীরের গোলযোগ মীমাংসায় নেহরুর সেন্টিমেন্টই প্রধান অন্তরায়। কি বলেন আপনি?

কখনই নয়।—আমার প্রতিবাদ। আমার তরফ থেকে কয়েকটি শান্ত যুক্তি। বোঝাতে চাইলাম মিঃ বেগকে। কিন্তু বুঝতে চাইলে তো! আমেরিকার সঙ্গে সামরিক চুক্তিতে কোমরে যে এখন জবর জোর। মিঃ বেগের কণ্ঠস্বরে তারই রেশ। তবু আমি বলে যাই আমার কথা।

অন্যায় আক্রমণকারীর কবল থেকে সাহায্যপ্রার্থী দুর্বল আক্রান্তকে রক্ষা করা সেন্টিমেন্টের ব্যাপার নয়। তা মানবিক কর্তব্য। সে কর্তব্য পালন করেছেন ভারত সরকার। তারপর অনেক কাল গত। এখন আর কাশ্মীর সমস্যার কোন অস্তিত্বই স্বীকার করি না আমরা।

তাই বুঝি?—একটি রহস্যাচ্ছন্ন প্রশ্ন মিঃ বেগের।

তা ছাড়া কি। একবার নয়, বারবার ভারতের সঙ্গে সংযুক্তি ঘোষণা করেছে কাশ্মীর। কাশ্মীর ভারতেরই একটি রাজ্য। তাই কাশ্মীরের উন্নয়নে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে আসছে ভারত সরকার। সে তো আর হতে পারে না অকারণ বিলাস। কাশ্মীরের নাগরিক ভারতের নাগরিক। ভারতের সাধারণ মানুষের জন্যে ভারত সরকারের যে ভাবনা কাশ্মীরের জনগণের জন্যেও তেমনি। তবে হ্যাঁ, কাশ্মীরের ব্যাপারে সত্যি যদি কোন সমস্যা থেকে থাকে, তা পাকিস্থান অধিকৃত 'আজাদ কাশ্মীর' নিয়ে। কিন্তু কাশ্মীর সম্পর্কে আর কোন আলোচনা এখানে অবাঞ্ছনীয়!

আমার কাজ শেষ। আমি চলি। এখন পাক্ সম্পাদকের সঙ্গে মিঃ লিণ্ডের আলোচনা। বেগ সাহেবের কর্মসূচী রচনার ভারও মিঃ লিণ্ডেরই ওপর।

এখান থেকে আমাদের দূতাবাসে। দেশের খবর না পেয়ে মন যেন মরুভূমি। একটা দগ্ধ হওয়ার হাহাকার দিনরাত। হোক সাতপচা পুরোনো খবর। তবু আমার দেশের কাগজগুলো দেখে কতো শান্তি! তাদের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ছড়ানো আমার দেশের মমতা। সে মমতা কুড়োতে কুড়োতে বিভোর মন।

এদিকে যে খাবার সময় অতিক্রান্ত হবার উপক্রম। হঠাৎ খেয়াল। সে দায় সেরে যাই শ্রী চন্দের ঘরে। তাঁর অনুরোধেই আজ আসা। দেশের কথা জানবার তাঁর আগ্রহ। তা নিয়ে কতো আলাপ। হিসেব-নিকেশ নিয়ে শ্রী চন্দের সে কী ব্যস্ততা! আলাপের আনন্দে অনেকখানি তাই বঞ্চনা। বিদায় নিয়ে তাঁকে দিতে চাই নিষ্কৃতি। কিন্তু কষ্টেই তাঁকে পেতে হয় তাতে মনের সায়। বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি। সে হবে, কথা দিয়ে তবে ছাড়াছাড়ি।

বড়ো ভালো লাগলো শ্রী চন্দকে। বিদেশে বাঙালী বড়ো আপন।

দূতাবাস থেকে যখন বেরিয়ে আসি তখন বৈকালী মন। ক্লান্ত সূর্য তাঁর বিদায়-রথে। পার্কে গিয়ে বসি। লাফায়েৎ স্কোয়ারের খুব নাম। সেখানেই যাই।

আহা কি মনোরম! এ উদ্যান মনোলোভা। প্রকৃতি হাসি হাসি। গাছেরা গলাগলি। ঐ তো হোয়াইট হাউস। দক্ষিণে বসে দেখি। ছবিতে কতো দেখা!

ক্ষমতা-পীঠ হোয়াইট হাউস। এই প্রশান্ত পরিবেশে দৃষ্টি যেন আহত সেখানে গিয়ে। ফিরে আসে। প্রকৃতির সবুজ সমুদ্রে সে দৃষ্টির মুক্তিস্নান। তাই তো লিখেছিলেন আমেরিকার মহিলা কবি এমিলি ডিকিনসন :

This my letter to the world

That never wrote to me,—

The simple news that Nature told,

With tender majesty.

কতো কথার জট মাথায়। আমি একা। আরো একা হওয়া যদি সম্ভব হতো!

আমাদের ইডেন গার্ডেনের কথা মনে পড়ে। মন কেঁদে ওঠে সে উদ্যানের কথা ভেবে। আমরা কি অপদার্থ! প্রাণকে উপড়ে ফেলে পচা শবের প্রদর্শনী। এ আমাদের দেশেই সম্ভব।

লাফায়েৎ স্কোয়ারের সঙ্গে ইডেন গার্ডেনের বেশ মিল। দুটি উদ্যানেরই পাশাপাশি শাসন-শক্তির দুই প্রতীক। হোয়াইট হাউস আর রাজভবন।

একটু ঘুরে দেখি। পেনসিলভেনিয়া এভিন্যুর ওপরে এই স্কোয়ার। এল্‌ম্ গাছের সঙ্গে সঙ্গে আরো নানা দেশের নানা রকমের গাছ। বিলিতি চিরসবুজ ইউ, চীনা পাওলোনিয়া, দক্ষিণী ম্যাগনোলিয়া, আরো কতো কি।

চলতে চলতে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে হঠাৎ আলাপ। সে আলাপে অনেক সঞ্চয়। আমায় সাহায্য করে তাঁরও যেন প্রচুর আনন্দ।

হোয়াইট হাউস ছাড়াও এ স্কোয়ারের এদিকে ওদিকে আরো অনেক বিখ্যাত ভবন। ব্লেয়ার হাউস, সেণ্ট জন চার্চ, ডিকেটর হাউস এমনি সব নামিক বাড়ি।

হোয়াইট হাউসের উল্টোদিকে পেনসিলভেনিয়া এভিন্যুর ওপর কোনাকোনি দাঁড়িয়ে ব্লেয়ার হাউস। চারতলা প্রাসাদ-ভবন। প্রায় সার্ধ শতাব্দীর ইতিহাস-সাক্ষী। প্রথম মার্কিণ সামরিক সার্জেন জেনারেল ডাঃ জোসেফ লাভেলের তৈরি এ বাড়ি। ঠিক বারো বছর পর এ বাড়ি তাঁর হাতছাড়া। ১৮৩৬ সন থেকে বাড়ির অধিকর্তা একজন সংবাদপত্র মালিক। কে তিনি? মিঃ ফ্রান্সিস প্রেস্টন ব্লেয়ার। সেই থেকে ব্লেয়ার হাউস নামে এ প্রাসাদের পরিচয়। শতাব্দীরও অধিককাল ব্লেয়ার পরিবারের মালিকানা

অব্যাহত। মাত্র চৌদ্দ বছর ধরে মার্কিণ সরকারের ক্রীত সম্পত্তি। অতিথি অভ্যাগতের ভিড়ে হোয়াইট হাউসে স্থান অকুলান। কাছাকাছি একটা বনেদি বাড়ি চাই ফেডারেল গভর্ণমেণ্টের। যেমনি চাওয়া প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তেমনি পাওয়া। ব্লেয়ার হাউস বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত ঘোষণা কয়েক দিনের মধ্যে। আর তক্ষুনি ক্রয়। প্রেসিডেণ্টের অতিথি ভবন। সেই থেকে অর্থাৎ ১৯৪২ থেকে ব্লেয়ার হাউসের এই আসল পরিচয়। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নেহরুও যে ছিলেন এ বাড়িতে। সে একটি স্মরণীয় বছর। ১৯৪৯। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর সেবারই আমেরিকায় প্রথম পদার্পণ। সেই থেকেই ব্লেয়ার হাউস নামের সঙ্গে আমাদের বিশেষ পরিচয়। অবশ্য প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানও তখন এ প্রাসাদেরই অধিবাসী। প্রায় বছর তিনেক কাটাতে হয়েছে তাঁকে এ বাড়িতে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত। তখন হোয়াইট হাউসের সংস্কার কাল। স্যার উইন্সটন চার্চিল, রাজকুমারী এলিজাবেথ (এখন ইংল্যাণ্ডের রানী), ফরাসী প্রেসিডেণ্ট ভিন্সেণ্ট অরিয়ল প্রভৃতি বিশ্বখ্যাতদের বাসধন্য এই ব্লেয়ার হাউস। এখন রাষ্ট্রীয় অতিথি অভ্যাগত রাষ্ট্র প্রধানদেরই জন্যে প্রধানত নির্দিষ্ট এ বাসভবন। এ বাড়ির জন্যে নিযুক্ত কর্মচারীদল ফেডারেল সরকারের বাধা চাকুরে।

ত্রিপোলিটান যুদ্ধের বীর নায়ক ষ্টিফেন ডিকেটর। সে নামের সঙ্গে যুক্ত ডিকেটর হাউস। এ বাড়ি এক কালে রাজধানীর সেরা প্রমোদ-ভবন। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের শ্রেষ্ঠ সাথী লাফায়েৎ। তাঁর বিপুল অভ্যর্থনায় ধন্য এ বাড়ি। ১৮২৫ সনের স্মরণীয় সে অনুষ্ঠান।

এ উদ্যানেরও কতো ইতিহাস! রাজধানীর উদ্দাম হৈ-হুল্লোড়ের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র একদার। প্রেসিডেণ্ট পদে এণ্ড্রু জ্যাকসনের নির্বাচন ১৮২৯ সনে। তিনি আমেরিকার সপ্তম প্রেসিডেণ্ট। তাঁর নির্বাচনে হোয়াইট হাউসে আনন্দ-বান। লাফায়েৎ স্কোয়ারে বালতি বালতি মদ বিতরণের আয়োজন করে তবে প্রাসাদ রক্ষা। গৃহযুদ্ধের আমলে সামরিক কার্যকলাপে এ স্কোয়ার সদা মুখর। একালে এ আবার এক শিল্পপীঠ। খোলা আকাশের নিচে এখানে বসে শিল্পমেলা। জাতীয় শিল্প-প্রতিভার বহু বিচিত্র সমাবেশ। চারুকলাকে উৎসাহ-দানে টাইমস্ হেরাল্ড পত্রিকার উদ্যম। বছরে চারদিনব্যাপী অনুষ্ঠান।

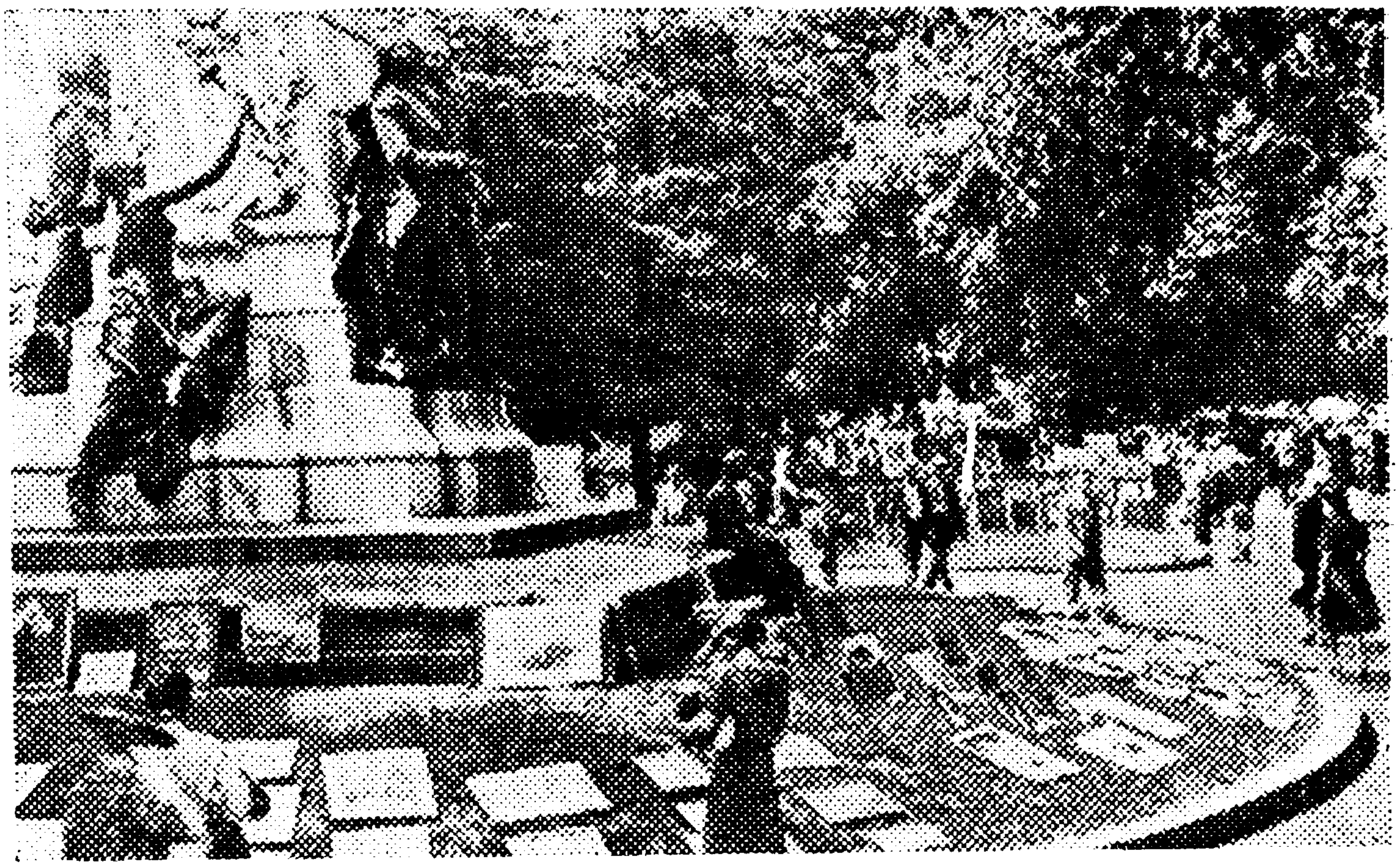

রাজধানী ওয়াশিংটনস্থ লাফায়েৎ স্কোয়ারে লাফায়েতের ব্রোঞ্জমূর্তির পাদদেশে শিল্পমেলা

এমনি সব তথ্য লাভ ভদ্রলোকের কাছ থেকে। ঘুরতে ঘুরতে উপস্থিত উদ্যান কেন্দ্রে। সামনে অশ্বারূঢ় এক বিরাট মূর্তি। ১৮১২ সনের যুদ্ধবিজয়ী জ্যাকসন। তাঁরই সংগৃহীত কামানের ব্রোঞ্জ থেকে তৈরি তাঁর আপন মূর্তি। সম্মুখে তারই একটি প্রতীক কামান। আমেরিকায় অশ্বারূঢ় মূর্তি নাকি এই প্রথম। ১৮৫৩ সনে তার প্রতিষ্ঠা। স্বভাবশিল্পী ক্লার্ক মিল্‌স-এর তৈরি এ অপূর্ব শিল্পকলা।

উদ্যানের এক এক কোণায় এক একটি স্ট্যাচু। জর্জ ওয়াশিংটনের চারজন বিপ্লবসঙ্গী। দক্ষিণ-পশ্চিমে স্বয়ং লাফায়েতের প্রকাণ্ড ব্রোঞ্জ মূর্তি। বিপ্লবের আহ্বানে উন্মাদিনী এক নারী। অর্ধবিবসনা। ফরাসী বীরের হাতে তার অসি উপহার। বিপ্লবী নায়কের উদ্দেশে ভবিষ্যৎ যুগের শ্রদ্ধাঞ্জলি। একদল শিশু প্রতীক সেই অনাগত ভবিষ্যতের। আর দুদিকের ভাস্কর্যে নৌ ও সেনাবিভাগের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস। সত্যি অপূর্ব কারুকার্য !

এ ছাড়া আরও তিনটি প্রতিমূর্তি স্কোয়ারে। রোশাঁবোর মূর্তি দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে লাফায়েতের ফরাসী সহযোগী রোশাঁবো। জার্মান ব্যারণ ফন স্টুবেন তখনকার ড্রিলমাষ্টার। জেনারেল ওয়াশিংটনের সুযোগ্য সহকারী। তাঁর মূর্তিরূপ উত্তর-পশ্চিম কোণে।

যুদ্ধবিজয়ী জ্যাকসন

উত্তর-পূর্বে থাডিউস কোসিউস্কো মূর্তিমান। তিনি পোলিশ। মার্কিণ স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সেনানী। এও ব্রোঞ্জের কাজ। শিল্পী অ্যান্টন পপিয়েলের হাতে কী চমৎকার বীরত্ব-ব্যঞ্জনা! ভিতের গায়ে ছোট ছোট মূর্তি খোদাই। একদিকে ছোট্ট একটি কথা—"And Freedom shrieked as Koseiuszko fell." মহান্ বিপ্লবীর প্রতি জাতির শ্রদ্ধানিবেদন।

অন্ধকারের অবগুণ্ঠন গাছে গাছে। হোটেলে ফিরতে ফিরতে অনেক রাত। স্বপ্নে সকাল সন্ধ্যার স্মৃতি মিছিল।

ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবে

আর একটি দিনের শুরু।

জানালা গলিয়ে বাইরে চোখ। ঊষা-লাবণ্যে মুগ্ধ প্রাণ। অমিয় ছড়ানো ছোট্ট বাগ। পাতায় পাতায় ছড়ানো ফুল। কার উদ্দেশে এ কুসুমাঞ্জলি? এ যেন সূর্য-প্রণয়ের প্রার্থনা।

আমার তো চলা সূচীমাফিক। যথানিয়মে লবীতে যাই। কাগজ পড়ি। গল্প করি। নতুন নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়।

মিঃ বোস, আপনার ফোন। —খবর পেয়ে রিসেপশনিস্ট-এর টেবিলে যেয়ে ফোন ধরি।

গুড মর্ণিং। হু প্লিজ?

গুড মর্ণিং। আই এ্যম মিসেস্ দাস।

—মিসেস্ দাস? আমার পরিচিত কেউ এখানে আছেন বলে তো মনে পড়ে না এ নামে। জিজ্ঞাসার উত্তরে পরিচয় লাভ। ইংরেজিতেই পুরো কথাবার্তা। কণ্ঠস্বরে ও কথায় বিদেশিনী বলেই ধারণা।

আপনি ডাঃ রজনীকান্ত দাসকে চেনেন নিশ্চয়ই। আমি তাঁর স্ত্রী। আপনাকে আমেরিকায় স্বাগত জানাই।

অসংখ্য ধন্যবাদ।—কিন্তু কে এই রজনীকান্ত দাস? অনেক দিন আগের শোনা এ নাম। হ্যাঁ ঠিক, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কি একটা বিষয়ে লেকচারার হয়ে এসেছিলেন তিনি। মডার্ণ রিভিয়্যুতে অনেক লেখাও পড়েছি তাঁর। তিনিই হবেন হয়তো।

আজ সন্ধ্যায় ডিনারে আসুন না আমাদের বাড়িতে? ডাঃ সেনও কি এসেছেন? তাহলে দুজনে এক সঙ্গেই আসবেন। খুব ভালো হবে।—মিসেস্ দাসের আমন্ত্রণ। তিনি ঠিকানাও দিলেন বাড়ির। তাঁর ডিরেকশনে অনুমান, সে বাড়ি বেশ দূর।

ডাঃ সেন এখনো আসেন নি জানালাম। আমন্ত্রণ গ্রহণেও আমিও দো-মনা। তা বুঝে মিসেস্ দাসের পাল্টা প্রস্তাব।

ঠিক আছে। বিকেল বেলায় আজ ফ্রি আছেন তো?

হ্যাঁ, তা আছি।

আমরাই আসবো আপনার কাছে। ধরুন বেলা ছটা নাগাদ। সে সময় অবশ্যই হোটেলে থাকবেন কিন্তু।

তা নিশ্চয়ই থাকবো। আপনারা অবশ্যই আসবেন। গুড বাই।

গুড বাই।

ইওর মেল প্লিজ।—আরে এ যে আমার অফিসের চিঠি। আমার দেশের প্রথম চিঠি। রিসেপশনিস্টকে অজস্র ধন্যবাদ।

মণি ভাই-এর লেখা চিঠি। কতো আগ্রহ নিয়ে পড়ি অফিসের নানা খবর। বাড়ির সংবাদে মন সুস্থির। সঙ্গে আমাদের দু কাগজে প্রকাশিত আমার লণ্ডন সংবাদের দুটি কাটিং। এরা আমাকে কতো ভালোবাসে!

আজ দশটায় ন্যাশনাল প্রেস ক্লাব পরিদর্শনের কথা। প্রাতরাশ সেরে সে পথে যাত্রা। আমি পদযাত্রী।

প্লিজ হেল্প মি।—হঠাৎ একটি অন্ধ মানুষের সামনাসামনি আমি। সাহায্যপ্রার্থী, কিন্তু ভিক্ষার্থী নয় লোকটি। তার হাতে এক গোছা পেন্সিল আর কলম। তা বিক্রির লাভে তার উদরান্ন। দিনাতিপাত। আত্মসম্মান বজায় রেখে সহানুভূতি আকর্ষণের সুন্দর পন্থা।

বিপন্নকে সাহায্য করার প্রবৃত্তি বহু লোকের। বিশেষ করে এমন বিক্রেতাকে বেশি দাম দিতেও কুন্ঠিত নয় অনেকে। প্রকারান্তরে তা দানের সামিল। কিন্তু সে দান গ্রহণে গ্লানি ভোগ করতে হয় না গ্রহীতাকে। তাতে নিছক মূল্যপ্রাপ্তির পরিতৃপ্তি!

A blind man seeks your help.—অন্ধ লোকটির গলায় ঝোলানো প্রার্থনা। সে প্রার্থনায় প্রাণের সাড়া। প্রার্থনা কিসের, এ তো আদান-প্রদান। দশ সেণ্টে একটি পেন্সিল ক্রয়।

May God help you.—এবার আমার জন্যে প্রার্থনা। ঈশ্বরের কাছে অন্ধ লোকটির আবেদন। দেশে দেশে সত্যি অনেক মিল।

কে স্ট্রীটে পড়েও অনেকটা পথ। অনেক দূর এগিয়ে এক চৌরাস্তার মোড়।

ন্যাশনাল প্রেস ক্লাব কদ্দূর আর?

ঐ যে, ঐ।—বাড়ি নির্দেশ। অজানা বিদেশীর সাহায্যে অচেনা পথিক। উল্টোদিকের ফুটপাথের কোণায় বিরাট ভবন। সে বাড়ির প্রবেশপথ দেখিয়ে দিয়ে বন্ধু বিদায়।

প্রেস ক্লাবের এই বাড়ি? এতো বাড়ি নয়, প্রাসাদ! মাথা উল্টে ওপর দিকে তাকাই একবার। এক, দুই, তিন, চার…। চৌদ্দতলা ভবন। বার তলার বেশি উঁচু বাড়ি নাকি করতে দেওয়া হয় না রাজধানীতে? তাহলে এ কি করে হলো? হয়তো বা ব্যতিক্রম। সাংবাদিকদের ব্যাপার। স্পেশাল পারমিশন হয়তো মিলেছে তার জন্যে।

তা নয় হলো। কিন্তু এই বিরাট প্রাসাদ তোলার টাকা এলো কোত্থেকে? সাংবাদিকদের নিজেদের টাকায়? তা কি সম্ভব? আমাদের ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের কথা ভাবি। দুখানা ভাড়াঘরে আমাদের অফিস। তাও আবার অন্যের সঙ্গে ভাগাভাগি। দুদেশে কতো তফাৎ!

এসব ভাবতে ভাবতেই ভিতরে প্রবেশ। একটা ছোট হলের চারদিক জুড়ে এলিভেটর। কোন্‌টায় চড়তে হবে? ক্লাবের কথা বলতেই একদিক থেকে আহ্বান।

অনেক ওপরে উঠে গেলাম। এলিভেটর থামতেই ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবের নাম-বিজ্ঞাপন চোখে জলজল।

কাকে চাই আপনার?—সামনের ঘরে ঢুকতেই রিসেপশনিস্টের জিজ্ঞাসা।

মিঃ বার্জহিমকে।

কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আগে থেকে?

একটা চিঠি আছে তাঁর নামে। মিঃ লিণ্ডের লেখা।—পরিচয় দিলাম মিঃ লিণ্ডের। আমার নিজেরও।

বসুন, বসুন।—হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিয়ে রিসেপশনিস্টের ত্বরিত প্রস্থান।

চারদিকে তাকাই। ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে অফিস। সুবিন্যস্ত। একপাশে একটি টাইপিষ্ট মেয়ে। তাঁর কাজে যেন ঝড়ের বেগ। অমন সুন্দর আঙুল কটির ওপর কী নিগ্রহ!

হঠাৎ নীরব টাইপ মেশিন। মেয়েটির কাজ শেষ বুঝি? এক মুঠো হাসি ছড়িয়ে দিয়ে আমায় প্রশ্ন:

পড়ার কিছু পেলে বোধ হয় ভালো হয় আপনার?

তা হয়, কিন্তু তার জন্যে কিছু ভাববেন না আপনি।

তা কি হয়?—বলেই মেয়েটি আসন ছাড়া। কয়েকখানা পত্র-পত্রিকা নিয়ে সামনে হাজির।

তার একখানা তুলে নিয়ে তা নাড়াচাড়া। মেয়েটিরও আবার কাজ শুরু। বিনে কাজে কেউ বসে থাকে, সে দৃশ্য বোধ হয় ওদের দুঃসহ। তাই আমার জন্যে পড়ার কাজ।

গুড মর্ণিং, আপনি মিঃ বোস?—হঠাৎ এক ভদ্রলোকের আবির্ভাব।

হ্যাঁ।

সহাস্য করমর্দন। প্রীতি বিনিময়। তারপর বার্জহিমের অনুপস্থিতির কথা জানালেন ভদ্রলোক। বোধ হয় তিনি অফিস সেক্রেটারী। একটু দমে যাবার ভাব লক্ষ্য করেই আবার আশ্বাস।

তার জন্যে কোনই অসুবিধে হবে না আপনার। ভালো একজন গাইড ঘুরে দেখাবেন আপনাকে সব কিছু। তিনিও সাংবাদিক। এই নিন আপনার গেষ্ট কার্ড।

কার্ডখানা নিয়ে দেখলাম এপিঠ ওপিঠ। এম্‌বস করা সিল্ড কার্ড। সেক্রেটারী জর্জ কুলেনের স্বাক্ষরিত সে অতিথি-পত্র। কার্ডের মেয়াদ পরের নয় তারিখ অবধি। তার আগেই অবশ্য আমার ওয়াশিংটন ত্যাগের কথা।

ভদ্রলোকের সঙ্গে আরো কিছু কথাবার্তা। জানলাম ক্লাবের কিছু কিছু নিয়মকানুন। কতো কি জানার। কতো কি দেখার। আমার এক একটি প্রশ্নের উত্তরে গাইডের নানা তথ্য পরিবেশন।

আচ্ছা, কতো দিনের এ ক্লাব?

তা প্রায় বছর পঞ্চাশ হতে চল্লো এর বয়স। ১৯০৮ সনে এর পত্তন। মাত্র দুশো জন সাংবাদিক সদস্য নিয়ে এ ক্লাবের আরম্ভ। আর দুখানা মাত্র ঘর নিয়ে প্রথম ক্লাব হাউস।—গাইডের জবাব।

সেই দুখানা ভাড়া ঘর থেকে এই চৌদ্দতলা নিজস্ব ভবন। আমাদের সংঘেরও তো শুরু দুখানা ঘরে। আমাদের সংঘেরও বয়েস প্রায় বছর ত্রিশ। চৌদ্দতলা বাড়ি আমাদের কাছে স্বপ্ন বিশেষ। কিন্তু কোলকাতায় আমাদের একতলা একটি সংঘভবন প্রতিষ্ঠা কি অসম্ভব? মোটেই নয়।

ন্যাশনাল প্রেস ক্লাব ভবন, ওয়াশিংটন ডি. সি।

নিজেদের দৈন্যদশায় মনে ব্যথা। তবুও আশা দুর্নিবার। একের পর এক ঘর ঘুরি। এ যেন ছায়াচিত্রের দৃশ্যপট পরিবর্তন। গাইডের মুখে ক্লাবের ক্রমোন্নতির ইতিহাস।

এক একটি মহাযুদ্ধের অবসানে এদেশে পত্র-পত্রিকার সংখ্যার অভাবনীয় বৃদ্ধি। সংবাদতৃষ্ণায় লোকের কাতরতা। ঘরে ঘরে রেডিও আর টেলিভিশন। মন তবুও তৃপ্ত নয়। সবারই এক বা একাধিক কাগজ চাই। তাই নতুন নতুন পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। সরকারী খবরের প্রাণকেন্দ্র যে রাজধানী। ওয়াশিংটন তাই সারা দেশের সংবাদপত্র-প্রতিনিধিদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্মকেন্দ্র।

রেডিও-টেলিভিশনেরও কিছু কিছু অফিস এখানে। ক্লাবের সদস্য-সংখ্যাও সেই মতো।

ক্লাবের সদস্য-সংখ্যা এখন কতো?

পাঁচ হাজারের প্রায় কাছাকাছি।—আমার কৌতূহলী জিজ্ঞাসায় গাইডের জবাব।

তা হলে তো চাঁদাই ক্লাবের একটা প্রকাণ্ড আয়! কতো করে চাঁদা আপনাদের?

ক্লাব সদস্যদের মধ্যে কয়েক রকমের শ্রেণী বিভাগ। প্রধান তিনটি শ্রেণীর মাথাপিছু বার্ষিক চাঁদা পঞ্চাশ ডলার। আরো কিছু সদস্যের বার্ষিক চাঁদা সাড়ে বারো ডলার।

প্রবেশিকা ফিও আছে না কি এর ওপর?

নিশ্চয়ই আছে। তা বিশেষভাবে শ্রেণীমাফিক। পঁচিশ ডলার থেকে শুরু করে একশ পঞ্চাশ ডলার পর্যন্ত।

বিস্ময়ের পর বিস্ময়। সদস্য পদে শ্রেণী-বিভাগ। সে আবার কেমন? জানতে চাই।

অ্যাকটিভ মেম্বার, নন্-অ্যাকটিভ মেম্বার, এসোসিয়েট মেম্বার এমনি এক একটি শ্রেণী। সম্পাদকীয় ও বার্তা বিভাগের লোকরাই শুধু সদস্য নন ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবের। পত্র-পত্রিকার অন্যান্য বিভাগের লোকরাও সেখানে সভ্য হবার অধিকারী। তবে সাংবাদিকদেরই মুখ্যস্থান। ভোট দেবার এবং ক্লাবের কর্মকর্তা নির্বাচিত হবার অধিকারও কেবল কর্মরত সাংবাদিক অ্যাকটিভ মেম্বরদেরই। অ্যাসোসিয়েট মেম্বার পদে নেওয়া হয় শুধু তাঁদের, সংবাদের সূত্র হিসেবে গণ্য যাঁরা।

গাইডের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নানা বিষয়ে আলোকপাত। আর একটি ছোট্ট প্রশ্নের উত্তরে ক্লাবের উদ্দেশ্য বর্ণনা। এ ক্লাবের মূল প্রেরণা সংবাদপত্রকর্মীদের সামাজিক মেলামেশা। বৃত্তিবিষয়ক আলাপ-আলোচনার সুযোগ সম্প্রসারণ। নিজেদের স্বার্থ রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকতার মান উন্নয়নের জন্যে সংঘবদ্ধ প্রয়াস।

মার্কিণ সাংবাদিকতার কোন কোন দিক আমার অপছন্দ। সস্তা উত্তেজনা সৃষ্টির নেশা তার মধ্যে অন্যতম। বিদেশী সংবাদের প্রতি উপেক্ষা আর

একটি। সাংবাদিকের মূল ভূমিকা জানা এবং জানানো। সত্য আহরণ ও সত্য প্রচার। ওপরের দুটি বৈশিষ্ট্যই এ লক্ষ্যপথের অন্তরায়। ব্যবসার দিককে বেশি গুরুত্ব দিতে গেলে আদর্শের অংগহানি। আর সে দিক উপেক্ষিত হলে অস্তিত্ব-সংকট। প্রয়োজন তাই উভয়ত সামঞ্জস্য বিধান। সে কাজে ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবের বিশেষ অবদান। গাইড বন্ধুর সঙ্গে কথায় কথায় আমার এই ধারণা। আমেরিকার কয়েকখানি সংবাদপত্র যে সাংবাদিকতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, সে বিষয়েও আমি নিঃসন্দেহ।

কী বিচিত্র এই ক্লাব বাড়িটি! সাংবাদিকতার পুরো জগৎটাই যেন এখানে। দেশী-বিদেশী চারশোরও বেশী পত্র-পত্রিকা ও রেডিও-টেলিভিশন প্রতিনিধির অফিস এ বাড়িতে! আমাদের ভারত-পাকিস্তানের কোন সংবাদপত্রের অফিসও আছে নাকি তাহলে? মনে হলো না। ইউনাইটেড প্রেসের একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়েছিলো একবার। চমকে উঠেছিলাম। আমাদের বিধুবাবুর অফিসের শাখা এখানে? পরক্ষণেই বুঝে নিলাম এ ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া নয়, ইউ-পি-এ। অর্থাৎ ইউনাইটেড প্রেস অব আমেরিকা। একই বৃত্তির এতোগুলো অফিস একসঙ্গে থাকায় কতো সুবিধে! ভাবের আদান-প্রদানে সদস্যদের জ্ঞানের প্রসার।

আরো নানা রকমের ছোটবড়ো কতো আকর্ষণ। আমোদ-প্রমোদের প্রচুর ব্যবস্থা। একটি ঘরে বসে তাস খেলছেন একদল চোখে পড়লো। বিলিয়ার্ড খেলারও ব্যবস্থা আর একটু দূরে। লাউঞ্জটি মনোরম। ডিনার ঘরটিও চোখ টানে। সাংবাদিকদের লেখার জন্যে, ছোটখাটো সাক্ষাৎকার নেবার জন্যে একদিকে কয়েকখানি ছোটবড়ো ঘর।

এসব দেখেশুনে এসে উপস্থিত বিরাট এক হলঘরে। ক্লাবের অডিটোরিয়াম। সরল স্বাচ্ছন্দ্যে মনোমুগ্ধকর পরিবেশ। একখানি চিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত। প্রকাণ্ড ছবি। কুশলী শিল্পীর অনবদ্য শিল্পার্ঘ্য। শায়িতা এক নগ্ন-নারীর মোহিনী রূপ। কিন্তু এ ছবি আর্ট মিউজিয়ামে না থেকে এখানে কেন? সেই পুরোনো কথা! A thing of beauty is a joy forever. এ তারই প্রতীক বুঝি!

ক্লাবে বাইরের মেয়েদের প্রবেশাধিকার নিয়ে খুব কড়াকড়ি। শৃঙ্খলা রক্ষায় ক্লাব কর্তৃপক্ষের সজাগ দৃষ্টি। আচরণবিধি লংঘনে বহিষ্কারেরও ব্যবস্থা। ক্লাবের গঠনতন্ত্র দেখিয়ে আমায় বুঝিয়ে দিলেন গাইড।

ক্লাবের সভা সম্মেলন ছাড়া এখানে অনেক প্রেস কন্‌ফারেন্সও হয় বুঝি ? —আমার প্রশ্ন।

দেশ-বিদেশের নেতাদের সঙ্গে সাংবাদিকরা মিলিত হন এখানে। বছর ছয় সাত আগে প্রধানমন্ত্রী নেহরুও বক্তৃতা দিয়েছিলেন এ হলে ক্লাব সদস্যদের সভায়। সে আমাদের ক্লাবের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা।

গাইডের কথায় আনন্দ-মন। মনে পড়লো ১৯৪৯ সনে নেহরুর আমেরিকা পরিদর্শনের কথা। তখন এদেশে আমাদের সদ্য-স্বাধীন ভারত-প্রধানমন্ত্রীর কী বিপুল সমাদর! নেহরু-প্রীতির সে জোয়ারে আজ বিপুল ভাঁটা। তার কারণ? নেহরু-নীতি আমেরিকার অপছন্দ। আমেরিকা ভারতের বন্ধুত্বকামী সন্দেহ নেই, কিন্তু ভারত বন্ধুত্ব চায় সব দেশের। তাই মুস্কিল। আত্মসমর্পণে বন্ধুত্বের সমাধি। ভারতের বৈদেশিক নীতি বিচারে সে বোধ চাই। আজকের আমেরিকায় যেন তার অভাব।

অডিটোরিয়াম থেকে লাইব্রেরী। বেশ খানিক সময় সেখানে ঘোরাফেরা। লাইব্রেরীহীন সাংবাদিক সংঘ সত্যি বেমানান। এখানে বইয়ের সংখ্যাও যেমন যথেষ্ট, স্বদেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকারও তেমনি বিপুল সমাবেশ। রেফারেন্স-এর সংগ্রহই বেশি। একজন লাইব্রেরীয়ানের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা। ক্লাব হলে নেহরুর সাংবাদিক সম্মেলনের ফটো এনে দেখালেন তিনি মুহূর্তের মধ্যে। কী সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা!

প্রেস ক্লাব পরিদর্শন শেষ। মনের মতো একটা আবহাওয়ায় ঘণ্টা দুই অতিক্রম। সবার সঙ্গে বিদায় সম্ভাষণ বিনিময়। টাইপিষ্ট তরুণী তখনো তাঁর কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তারই মধ্যে হাত তুলে 'বাই, বাই'। মিষ্টি হাসি মাখানো বিদায় নমস্কার।

দেশের মাটি ও দেশের মানুষ

মধ্যাহ্ন-দিন। দিবাহার সেরে হোটেলে ফিরি। আমাদের দূতাবাসের চিঠি। লিখেছেন রাষ্ট্রদূত শ্রী মেহতার সেক্রেটারী মিস্ ক্যাম্বেল। ফোনে যোগাযোগ সম্ভব হয়নি বলে এই চিঠি। সেপ্টেম্বরের চার তারিখে সন্ধ্যা ছটায় রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা। তাঁর অফিসে আমার চায়ের আমন্ত্রণ। এ সম্পর্কে ফোনে সম্মতি জ্ঞাপনের অনুরোধ।

ঘরে গিয়েই মিস্ ক্যাম্বেলের সঙ্গে ফোনে আলাপ। মংগলবার সন্ধ্যার আমন্ত্রণ গ্রহণ। এনগেজমেন্ট পাকা।

ফোন ছাড়তেই সারা পৃথিবী থেকে যেন বিচ্ছিন্ন আমি। প্রকাণ্ড একলা ঘর। সে ঘরে ছোট্ট একটি মনের ছুটোছুটি। সে মন জুড়ে কতো ভাবনা-চিন্তার ঝোপ্‌ঝাপ্‌। শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজে চোখ বুলোই। পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ঝগড়ার খবর, অশান্তির সংবাদ। একের বিরুদ্ধে আরেকের অভিযোগ। অভিযোগের অন্ত নেই। গোটা দুনিয়ার বিরুদ্ধে আমারও কি কম অভিযোগ—তার সঙ্গে আমার কম ঝগড়া! তবু এই পৃথিবীই আমার মনের কতো কাছে—আমার কতো আপন! ঋষি-কবি রবার্ট ফ্রস্টের কথা মনে পড়ে। আমেরিকার বয়োবৃদ্ধ কবি ফ্রস্ট। তাঁর মতোই বলতে ইচ্ছে—"He had a lovers quarrel with the world." নিজের সম্বন্ধেই তাঁর নিজের একথা। পৃথিবীর সব বিবাদই তেমনি হোক। তার জন্যে মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতা কেন দেশে দেশে?

এমনি সব ভাবাভাবি। চোখের পাতায় ঠাণ্ডা ঘুম। তার চৈতন্য চারটের পর।

এ সময়ে আবার কার ফোন?

হ্যালো মিঃ বোস, আমি অরুণকেও বলেছি। কাল সন্ধ্যায় সেও আসবে আমার বাড়িতে। আপনার কথা উঠতেই সে দেখলাম উচ্ছ্বসিত। তাই বল্লাম তাকে।

তা বেশ। খুব ভালো।—ধন্যবাদ জানালাম নিডহামকে এজন্যে।

খানিক বাদে আবার ফোন। এবার মিসেস্ দাসের কল। দাস-দম্পতি হাজির। লবীতে উপস্থিত। একটু আগে এসে আমার জন্যে অপেক্ষা।

তাড়াহুড়ো করে নেমে আসি। শ্রীযুত ও শ্রীমতী দাসকে অভিবাদন। তাঁরা যেন আমায় পেয়ে আত্মহারা। আমিও তাঁদের কাছে পেয়ে।

আমার সঙ্গে শ্রী দাসের বাংলায় কথাবার্তা। কথায় তাঁর 'বাঙ্গাল' টান। আমারই মতো ঢাকা জেলায় তাঁর জন্মগ্রাম। এখন মার্কিণ নাগরিক।

একটু নিরিবিলিতে আলাপের ইচ্ছে। লাউঞ্জে বড্ড ভিড়। আমার ঘরে যাবার কথায় ওরা নারাজ।

তার চেয়ে চলুন বাইরে।—এ বয়সে শ্রী দাসের উদ্যমে আশ্চর্য আমি। রীতিমতো বার্ধক্য ছাপ তাঁর দেহে। মন অজর।

তিনজন মিলে কিছুটা হাঁটাহাঁটি। তারপর রেস্তোরাঁয়। খাবার টেবিলে বসে দীর্ঘ আলাপ।

ভারতে যাবার জন্যে দাস-দম্পতির গভীর আগ্রহ। শেষ জীবনে ভারত-সেবার সুযোগ লাভের জন্যে শ্রী দাসের সে যে কী আকুতি! কৃষিপ্রধান দেশ ভারতবর্ষ। কৃষি বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ শ্রী দাস। কারিগরী বিদ্যায়ও তাঁর বিশেষ জ্ঞান। স্বীকৃতি ও সম্মানের অভাব ঘটেনি তাঁর জীবনে। সুদূর প্রাচ্যে মার্কিণ কারিগরী মিশনের চেয়ারম্যানের পদ লাভ। কৃষি উন্নয়ন পরামর্শদাতা হিসেবেও সুনাম অর্জন। এখনও মার্কিণ পররাষ্ট্র দপ্তরে দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠান। কিন্তু জন্মভূমির সেবায় শেষ জীবন অতিবাহিত করার জন্যে মন উন্মুখ।

একথা সেকথার মধ্যে এই একটি বিষয়ের বার বার উল্লেখ। আর সে সুযোগ না পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ। মাঝে মাঝে সে ক্ষোভাগ্নিতে শ্রীমতী দাসের ঘৃতাহুতি। বাংলা বলতে পারেন না মহিলা, কিন্তু বোঝেন প্রায় সব। মহাসুবিধে।

আহারান্তেও দাস দম্পতির হাতে বন্দী আমি। টুয়েন্টিনাইন্থ স্ট্রীটে তাঁদের বাড়িতে টেনে নিয়ে তবে তাঁদের প্রাণশান্তি।

একটি নিঃসন্তান পরিবার। সুন্দর একটি এপার্টমেণ্টে দুটি মাত্র প্রাণী। প্রচুর বইপত্র। নিজেদের লেখা বইও অনেক। আমার সামনে তার কতগুলোর

প্রদর্শনী। বিজ্ঞান ও অর্থনীতির বই-ই বেশী। শ্রীযুক্ত দাসের লেখা সে সব গ্রন্থ। মার্কিণ মেয়েদের নিয়ে লেখা শ্রীমতী দাসের বইখানা চমৎকার। নিজে তিনি ইয়োরোপীয়ান মহিলা। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে মার্কিণ নাগরিক।

নিঃসন্দেহে গুণী লোক শ্রীযুক্ত দাস। কিন্তু ভারত সরকারের নিকট আবেদনের ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ তিনি। তাঁর চেয়েও বেশি জ্বালা যেন শ্রীমতী দাসের। কঠোর সমালোচনা নেহরু থেকে আরম্ভ করে আরো অনেকের। শুধু একটি লোকের উদ্দেশে শ্রী দাসের শ্রদ্ধা নিবেদন। তিনি শ্যামাপ্রসাদ। তাঁর অকাল ও অস্বাভাবিক মৃত্যুতে অন্তর্দাহ। সে সব থাক।

দু কাপ কফি শেষ করে উঠে পড়ি। শ্রীযুক্ত দাস অনেক দূর অবধি আমার পথসংগী। একটি বিরাট হোটেল তিনি দেখালেন পথে। বোধ হয় সোরহ্যাম বা শেরাটন পার্ক হোটেল তার নাম। আপনিই যেন একটি শহর এই হোটেল। আমাকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে শ্রী দাস বিদায়।

ক্যাবে বসে বসে কেবল ভাবি। শ্রী দাসের কথা যতো ভাবি ততোই বিস্ময়। অদ্ভুত মানুষ শ্রী দাস। বয়সের কথা বলতে নারাজ। Whatever be my age I can work like any youngman.—আমার একটি প্রশ্নের উত্তরে তার এই জবাব। সে উত্তর ভোলা দায়।

গাড়ি যে হোটেল দুয়ারে খেয়াল নেই। দাস পরিবারের কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু ফেরার পথে গাড়ি ভাড়া একটু বেশি কেন?

আগষ্টের শেষ সকাল। ঘুম ভাঙতেই ব্যস্ততা। মনের চেতনায় কেমন যেন এক আন্দোলন। আমেরিকার শ্রেষ্ঠ পুরুষ প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার। আজ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ। সাড়ে দশটায় হোয়াইট হাউসে জরুরী সাংবাদিক সম্মেলন। সে সম্মেলনে আমারও বিশেষ আমন্ত্রণ। সে সংবাদ জানিয়েছেন মিঃ লিণ্ডে।

প্রাতরাশ সেরে আসি টুক্ করে। রাষ্ট্রপতি আইক সন্দর্শনে যাত্রার প্রস্তুতি। ফোনে অরুণের কণ্ঠস্বর।

আমি আপনার হোটেল থেকেই বলছি দক্ষিণা দা!

আরে এসো, এসো। ওপরে চলে এসো সোজাসুজি।

ভালোই হলো অরুণকে পেয়ে। তার সাহায্য মস্ত সুবিধে।

মনে আছে আজ সাড়ে বারোটায় ভয়েস অব আমেরিকায় আপনার যাবার কথা ?—অরুণের প্রশ্ন।

হ্যাঁ, মনে আছে। তুমি ফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছো সেদিন। কিন্তু আজ সাড়ে দশটায় যে আবার প্রেসিডেন্টের প্রেস কন্‌ফারেন্স।

তাই নাকি ? তাহলেও তাতে অসুবিধে হবে না কিছু। প্রেস কন্‌ফারেন্স তো এক ঘণ্টা। তার পরেও ঢের সময়। হোয়াইট হাউস থেকে বেরিয়ে এসে একটা ক্যাব নিয়েও চলে যেতে পারেন সরাসরি। আর তা নয়-তো পেন্‌সিলভেনিয়া এভিন্যুয় এসে স্ট্রীটকারে চেপে বসলেও নেমে যাবেন আমাদের অফিসের সামনাসামনি। চলুন আমিই নিয়ে যাই আপনাকে হোয়াইট হাউসে। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন।—নিজে থেকেই অরুণের আশ্বাস।

এই ধুতি-পাঞ্জাবী পরেই হোয়াইট হাউসে যাবেন নাকি ?

তা নয় তো কি ? এঁরাও যখন কেউ যান আমাদের রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে তাঁদের নিজেদের পোশাকেই যান। তাই উচিত। আমাদের বেলায়ই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন ?

বেশ, তাই চলুন। এ নিয়ে আর তর্ক করে কি লাভ ? চলুন, হেঁটেই যাই। হাতে এখনো অনেক সময়।

তাই চলো।—অরুণ আমার পথপ্রদর্শক।

এই যে ইউ-এন-আই-এ অফিস। মিঃ নিডহাম কাজ করেন এখানে। মিঃ এস্টারলাইনের কথা মনে পড়ে ? তিনিও আছেন এ অফিসে।

এস্টারলাইন ? না তো।—অরুণের বলা সত্ত্বেও মন-সমুদ্রে সম্ভব হলো না তাঁর স্মৃতি-সন্ধান।

আরো এগুই। ভারি সুন্দর একটা বড়ো বিল্ডিং মাঝখানে। কালো রঙ। তিন দিক দিয়ে রাস্তা। এদিকে ওদিকে খণ্ড খণ্ড ফুল বাগান। চোখ টানে।

এ বাড়িটি কিসের ? কোন সরকারী অফিস বুঝি ?—আমার জিজ্ঞাসা।

পেন্‌সিল্‌ভেনিয়া এভিন্যু ধরেই এ অবধি এলাম আমরা। এবার যেয়ে পড়ছি সেভেন্টিস্থ স্ট্রীটে। মোড়ের এ বাড়িটির কথা জিগ্যেস করছেন ? এটি রাজধানীর একটি বিখ্যাত ভবন। পুরোনো স্টেট ডিপার্টমেণ্ট বিল্ডিং।—অরুণের উত্তর।

ও, এখন তো পররাষ্ট্র দপ্তর উঠে গেছে টুয়েন্টিফার্স্ট স্ট্রীট আর ভার্জিনিয়া এভিন্যুর মোড়ে।

তাহলেও পররাষ্ট্র দপ্তরের কিছু কিছু অফিস এখনো রয়েছে এ বাড়িতে।

কদ্দিনের পুরোনো হবে এ বাড়ি ?

এই ধরুন বছর সত্তর বয়েস এ বিল্ডিং-এর। —এমনি কথায় কথায় সেভিন্টিন্থ স্ট্রীট ধরে আমরা এগুই। উল্টো দিকে লাফায়েৎ স্কোয়ার ফেলে আসি।

ঐ তো হোয়াইট হাউস। হোয়াইট হাউসের পিছন দিককার এক্‌জিকিউটিভ এভিন্যুতে এবার উপস্থিত আমরা। আর একটু গেলেই আপনার গেট।—লিণ্ডের দেওয়া পথ-নির্দেশ অরুণের হাতে।

অদূরে ওই বাড়িটি কি ওখানে ? অনেকটা যেন একটি শ্বেতশুভ্র মন্দিরের মতো! অনেকগুলো সিঁড়ি বেয়ে গিয়ে তবে দেব-দর্শন!

ওটি কোন মন্দির বা গীর্জে নয়। একটি বিখ্যাত কলা-ভবন। করকোরাণ আর্ট গ্যালারি।

তাই হলো। যেখানে শিল্প সেখানেই সুন্দর। তাই মন্দির।

ঠিকই বলেছেন, পুণ্যার্থীর মন নিয়েই যেন এখানে দর্শনার্থীদের নিত্য ভিড়। সেভেন্টিন্থ স্ট্রীট ও নিউইয়র্ক এভিন্যুর ওপর এই আর্ট গ্যালারি। মার্কিণ শিল্পকলার নানাবিধ সমাবেশ এখানে। তার সঙ্গে আবার একটি আর্ট স্কুল।

করকোরাণ কলাভবনের সামনেই একটি পার্ক। হোয়াইট হাউসের ঠিক পশ্চাদ্বর্তী সে পার্কের ধারে খানিক ঘোরাফেরা আর কথাবার্তা। এখনো যে বেশ সময় হাতে।

আচ্ছা, মার্কিণ রাষ্ট্রপতি-ভবনের নাম হোয়াইট হাউস কেন বলতে পারো। আছো তো বছর দুই আমেরিকায়। দেখি এর কারণটা জেনেছো কিনা এদ্দিনে।

বলুন না, আপনার কাছ থেকেই শুনি। —জেনেও হয়তো আমায় পাল্টা পরীক্ষা করার ইচ্ছে অরুণের।

ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে আমেরিকার দ্বিতীয় যুদ্ধ সুরু ১৮১২ সনে। বৃটিশ বাহিনী রাজধানী ওয়াশিংটন পর্যন্ত দখল করে ফেলেছিলো এক সময় সে যুদ্ধে।

আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলো প্রেসিডেন্টের প্রাসাদে। তখন এ প্রাসাদের নাম ছিলো এক্‌সিকিউটিভ ম্যানশন। আগুনে পুড়ে সব ছারখার। শুধু কালো কালো পোড়া দেয়ালগুলো সব দাঁড়িয়ে। ইংরেজ বিতাড়নের পর নতুন করে তৈরি হলো রাষ্ট্রপতি-ভবন। সব কালো চাপা পড়লো সাদা আস্তরণে। সেই থেকে হোয়াইট হাউস নামে এ বাড়ির পরিচিতি।

আমিও তেমনি কথাই শুনেছি।—এই বলে ঘড়ির দিকে তাকায় অরুণ।

খুব বোধ হয় দেরি হয়ে গেলো তোমার?

না, তার জন্যে আজ আর কোন ভাবনা নেই। আমার অফিসারকে জানিয়েই এসেছি আপনার কাছে। তবে এখন যাই। প্রেস কন্‌ফারেন্স শেষ করে সোজা চলে যাবেন আপনি 'ভয়েস অব আমেরিকা'য়।

বেশ, যাও তুমি। আমার এক আধটুকু দেরিও হতে পারে। —আমার কথা শেষে অরুণ বিদায়। হঠাৎ কেমন যেন শূন্যতা বোধ!

হোয়াইট হাউসে ঘণ্টা দুই

উন্মুক্ত গেট। দু একখানা করে গাড়ির আবির্ভাব। আমিও যাই।

গেটে দ্বারী আরো কয়েকজন সংগী তাঁর। এরা সবাই বোধহয় রক্ষী-পুলিশ।

আপনার প্রবেশ-পত্র?

মিঃ লিণ্ডের লেখা নোট দেখাই।

গভর্ণমেণ্টাল এ্যাফেয়ার্স ইনষ্টিট্যুটের প্যাডে লিখিত সে নোট।

আর কোন কার্ড নেই আপনার সঙ্গে?

না তো!

আমায় একটু অপেক্ষা করতে অনুরোধ। তারপর গেট-ঘর থেকে কার সঙ্গে জানি ফোনে যোগাযোগ।

আচ্ছা, যান আপনি।—তালিকার সঙ্গে নাম মিলিয়ে নিয়ে অনুমতি।

একটু পরে পরেই পথ-প্রদর্শক। বেশ খানিকটা হেঁটে এসে তবে হোয়াইট হাউস।

হোয়াইট হাউস। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক প্রাসাদ। আজও কতো ইতিহাসের সৃষ্টি এখান থেকে। এতো গুরুত্ব সত্ত্বেও এ ভবন অনাড়ম্বর। কয়েক বছর আগে দেখা আমাদের রাষ্ট্রপতি-ভবনের কথা মনে পড়ে। এর চেয়ে অনেক বেশি সমারোহ সেখানে। বৃটিশ আমলে ভারত শোষণের সঙ্গে ছিলো বড়লাট-ভবনের অমিতব্যয়িতার সামঞ্জস্য। কিন্তু সে জাঁকজমক আজ বেমানান।

কতো অতীত স্মৃতি জড়ানো এ হোয়াইট হাউস! চারদিকে ছড়ানো সব ঘটনা। প্রকাণ্ড এক এলিভেটরে চড়ে উর্ধ্বগতি। ইতিহাস-মুখর মন। দীর্ঘ সার্ধ শতাব্দী অনুভূতি-চেতনায় পরিক্রমা। ১৭৯২ সনে এ প্রাসাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা। সে উৎসবে প্রথম প্রেসিডেণ্টই প্রাণ-পুরুষ। অসম্পূর্ণ প্রাসাদ। সে অবস্থায়ই তার ওপরে তাঁর পায়চারি। নিস্তব্ধ নিরালায় কান পাতলে

আজো কি শোনা যায় সে পদচারণার শব্দ? এ ভবনে এসে বাস করার সুযোগ পাননি রাষ্ট্রপতি ওয়াশিংটন। দ্বিতীয় প্রেসিডেণ্ট জন এ্যাডামস্ থেকে এ প্রাসাদ মার্কিণ রাষ্ট্রপতিদের আবাসস্থল। উনবিংশ শতকের শুরুতে প্রথম গৃহপ্রবেশ। তারপর থেকে আরো বত্রিশ জন প্রেসিডেণ্টের আগমন-নির্গমন। লিংকনের উদার কণ্ঠস্বর, উইলসনের ন্যায়ভিত্তিক শান্তি-মন্ত্র, ফ্রাংকলিন রুজভেণ্টের রাষ্ট্র-উদ্যোগের ঘোষণা আজও যেন প্রতিধ্বনিত হোয়াইট হাউসের দেয়ালে দেয়ালে।

এলিভেটর থেকে নেমে কন্‌ফারেন্স হলের সামনে আসি। এরই মধ্যে সেখানে লোকের 'কিউ'। আমিও তাতে। দেখতে দেখতে বেশ ভিড় জমে। ঘড়ির কাঁটায় সময়ের দ্রুত পদক্ষেপ। এক এক করে সবার হলে প্রবেশ। আমার বেলায় গণ্ডগোল।

আপনার কার্ড? —এখানেও সেই একই প্রশ্ন। আমি বল্লাম আমার কথা। মুহূর্তের মধ্যে আমার সামনে একজন হোমড়া-চোমড়া অফিসার।

কী ফ্যাসাদ! মনে হলো চলেই যাই। নাই বা হলো প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে দেখাশুনো। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশায় বেশি আনন্দ। সেখানে নেই কোন বাধাবাধি। তাই ভালো।

পরক্ষণেই আবার যুক্তি-বিচার। আমারই গল্‌তি। এদের কি দোষ? আমারই উচিত ছিলো ভালো করে সব নিয়ম-কানুন জেনে নেওয়া।

যান আপনি। —হলে প্রবেশের অনুমতি। আমন্ত্রিত তালিকায় আমার নাম। তা দেখে অফিসার নিঃসংশয়।

প্রেসিডেণ্টের নিরাপত্তার জন্যে এদেশে ভীষণ কড়াকড়ি। বিশ শতকের শুরুতে এক গুপ্ত বিভাগের সৃষ্টি তার জন্যে। এই সিক্রেট সার্ভিস-এর কাহিনী পড়ছিলাম সে দিন কোন্ একটা সাময়িক পত্রে। এখানে পেলাম তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

গুপ্ত বাহিনী সৃষ্টির পূর্বে প্রেসিডেণ্টের প্রাণ সদা-বিপন্ন। মাত্র ছত্রিশ বছরে নয়জন প্রেসিডেণ্টের মধ্যে তিনজনই আততায়ীর হাতে খুন! তাই সতর্কতার এমনি বেড়াজাল। প্রেসিডেণ্টের জীবন-রক্ষী প্রায় শ' তিনেক গুপ্ত পুলিশ নাকি এখন এই হোয়াইট হাউসে। তারা প্রত্যেকেই গুপ্তচর বৃত্তিতে বিশেষজ্ঞ। এ বিভাগ সৃষ্টির পর আর কোন প্রেসিডেণ্টকে প্রাণ

হারাতে হয়নি আততায়ীর গুলীতে। এখানেই এদের কৃতিত্ব। প্রেসিডেন্টের আগে-পিছে সর্বত্রই একদল করে গুপ্ত পুলিশ। সে অবস্থায় আমি হোয়াইট হাউসে পরিচয়-পত্রহীন। কিছুটা বাধা আসবেই। সে তো স্বাভাবিক!

আর কয়েক মিনিট মাত্র বাকি সাড়ে দশটার। পূর্ণ ঘর। থম্‌থমে আবহাওয়া। ফটোগ্রাফার ও ফিল্ম-এর লোকদের কর্মব্যস্ততা। ফটো ও ফিল্ম তোলার হিড়িক। তারই মধ্যে মিঃ বেগের প্রবেশ। শেষ মুহূর্তে আসায় আসন পেতে অসুবিধে। একটি কোণার দিকে তাঁর বিদ্যুৎ-গতি।

বক্তৃতা মঞ্চে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার ঠিক সাড়ে দশটায়। তাঁর পশ্চাতে একদিকে রাষ্ট্রপতির পতাকা এবং আর এক দিকে তারকা-খচিত মার্কিণ রাষ্ট্রপতাকা। নিচে দুপাশে উচ্চপদস্থ অফিসারদের কয়েকজন। সরকারী প্রচার বিভাগেরও কিছু লোক। বাকি সব বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রতিনিধি, দেশবিদেশের সাংবাদিক।

সভাঘর নিস্তব্ধ। অভিবাদন বিনিময়ের পরে সুয়েজ সমস্যার ওপর প্রেসিডেন্টের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা। সে বক্তৃতার মূল কথা—

The Suez waterway was inter-nationalized in the sense of usage of the Canal. এবং The 1888 Treaty gave many nations right in and to the Canal in perpetuity but did not mean that these nations owned the Canal.

পরিষ্কার কথা। কিন্তু তবু সুয়েজখালে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ইংগ-ফরাসী চক্রের কেন জংগী মনোভাব? আমেরিকা শক্ত হলে ওদের চক্রান্ত ব্যর্থ হতে বাধ্য। এই ভাবছি।

হঠাৎ প্রশ্ন, পূর্ব ভূমধ্যসাগরে মার্কিণ সৈন্য প্রেরণের আদেশ দেওয়া হয়েছে কি না। প্রশ্ন শুনেই মন চঞ্চল। আগুন তাহলে লাগলো আবার!

প্রেসিডেন্টের উত্তরে দুশ্চিন্তা দূর। সে উত্তরে আন্তরিকতার সুর। সুয়েজ সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসা সাধনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র লক্ষ্য, আর কিছু নয়। এই ঘোষণায় গরম আবহাওয়া শান্ত খানিক।

আজকের দিনে অসংশ্লিষ্টতা বা নিরপেক্ষতা শুধু অসম্ভব নয়, অনুচিতও। —প্রেসিডেন্টের এ উক্তিও ভাবার মতো। এ নীতি অনুসরণেই আমেরিকার অগ্রগতি। আজ সে শুধু সবল নয়, হয়তো প্রবলতম। নিরপেক্ষতা আজ

তার কাছে হয়তো নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের কাছে তা হবে কেন? আমরা কেন কোন পক্ষ নেবো বড়োদের রেষারেষিতে? পৃথিবীর সব রেষারেষির অবসানই আমাদের কাম্য। তার জন্যে আন্তরিক চেষ্টা। আমাদের অগ্রগতির জন্যেই তা প্রয়োজন।

আর একটি প্রশ্ন। মার্কিণ সাংবাদিকদের চীন যাত্রার ওপর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে সে প্রশ্ন। সে নিষেধাজ্ঞা বাতিল করা হবে কিনা তা জানতে চান একজন আমেরিকান রিপোর্টার। মার্কিণ সাংবাদিকদের কাছে এ নিষেধাজ্ঞা নয় মনঃপূত।

তা সম্ভব নয়, জানান প্রেসিডেণ্ট। দশজন মার্কিণ নাগরিককে আটক রাখা হয়েছে কম্যুনিষ্ট চীনে। তাদের ওপর চল্‌ছে দুর্ব্যবহার। তারই প্রতিবাদে এ নিষেধাজ্ঞা।

মার্কিণ সরকারের এ যুক্তি আমার কাছে অবোধ্য। চীনের অভিযোগ, দ্বিগুণের বেশি চীনা আটক আমেরিকায়। তাই কি নয় যথেষ্ট প্রতিবাদ? অবশ্য এ অভিযোগের সত্যতা নয় সন্দেহাতীত। চীন ও আমেরিকার মধ্যে অনেক ভুল বোঝাবুঝি। আমেরিকায় চীন সম্পর্কে তীব্র বিরূপতা। চীনেও হয়তো আমেরিকার সম্পর্কে তাই। ঐ ভুল বোঝাবুঝির নানা কুফল। দু দেশের সাংবাদিক বিনিময়ে তার সমাধান সম্ভাবনা অনেকখানি। কিন্তু আমেরিকার সরকারী জেদ সে পথে অন্তরায়।

আরো দুচারটি প্রশ্নোত্তর শেষে সভাভংগ। সভা শেষেও এঁর তাঁর সঙ্গে আলোচনা। হঠাৎ এক পাশ থেকে এসে আলাপ শুরু করলেন এক ভদ্র-মহিলা। তিনি টেক্সাসের একখানা সংবাদপত্রের প্রতিনিধি।

টেক্সাসে যাবেন আপনি?—জিজ্ঞাসা।

খুব সম্ভব যাবো।

তাহলে আমাদের অফিসে যাবেন একবার। আমি জানিয়ে দিচ্ছি আপনার কথা।—এই বলে মহিলা লিখে নিলেন আমার নাম পরিচয়। আমায় দিলেন তাঁদের অফিসের ঠিকানা।

ধন্যবাদ জানিয়ে সেখান থেকে বিদায়। তারপর হোয়াইট হাউসের এদিক ওদিক একটু ঘোরাঘুরি। অনেক দর্শনীয় হোয়াইট হাউসে। বিখ্যাত ইস্ট রুমের কথা শুনেই স্মরণে লিংকন। এ ঘরে তাঁর শবাধার ঘিরে উঠেছিলো

নীরব কান্নারোল। আবার এখানেই এসে বিয়ের সাজে দাঁড়িয়েছিলেন একদিন হাস্যমুখর নেলী গ্র্যাণ্ট। নানা কারণে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এই হল। হয়তো হোয়াইট হাউসের বৃহত্তমও এই ইস্ট রুম। আমেরিকার বিংশতি প্রেসিডেণ্ট জেমস্ আব্রাম গারফিল্ড। তাঁর নির্বাচনের বছরেই আততায়ীর গুলীতে আহত হয়েছিলেন তিনি এই প্রাসাদেরই ব্লু রুমে। তার কিছুকাল পরেই তাঁর জীবনান্ত। হোয়াইট হাউসের সব চেয়ে মনোরম হল এই ব্লু রুম। এ ঘরও আবার অনেক বিয়ের বাসর। গ্রীণ রুম, রেড রুম প্রভৃতিও দেখার মতো। আরো অনেক কিছু। কিন্তু আর বিশদ দেখার সময় কই? মেন গেট দিয়ে বেরিয়ে আসি।

হোয়াইট হাউস এলাকার নাম প্রেসিডেণ্টস্ স্কোয়ার। চারদিক জুড়ে তার গাছের বাহার! তার ছায়ায় বেড়িয়ে এসে প্রাণ শীতল। পৃথিবীর নানা প্রান্তের আশি রকম গাছের নাকি সমাবেশ এখানে।

ভারত ও আমেরিকার জীবনাদর্শ

আর সময় নেই। এবার যাত্রা 'ভয়েস অব আমেরিকা'য়। স্ট্রীটকারের অভিজ্ঞতা এই প্রথম। আমাদের ট্রামের মতোই এদেশের স্ট্রীটকার। পেনসিলভেনিয়া অ্যাভিন্যু থেকে সে কারে উঠি। পাশের যাত্রীর সঙ্গে আলাপ। তাঁর সাহায্য প্রার্থনা। ভয়েস অব আমেরিকায় যেতে কোথায় নামতে হবে তা জানতে চাই। তাঁর আশ্বাসে নিশ্চিন্ত-মন।

কিন্তু কণ্ডাক্টর কোথায়? টিকিট কে দেবে? সে এক চিন্তা।

এখন ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অ্যাভিন্যুতে চল্‌ছি আমরা। পরের স্টপেই নামতে হবে আপনাকে।—অনেকক্ষণ পর আমার প্রতি পাশের যাত্রীর সতর্কতা।

আমি উঠে পড়ি। কিন্তু পয়সা যে দেওয়া হয় নি! ড্রাইভারকে গিয়ে জিজ্ঞাসা।

আপনি দেন নি ভাড়া? —ড্রাইভারের পাল্টা প্রশ্ন। সে প্রশ্ন বিস্ময়-ভরা। তাঁর সামনে এক স্লট মেশিন। সেখানে ভাড়া দিয়ে তবে তো গাড়ি চড়া! সে কি আর আমি জানি। মেশিনে কুড়ি সেণ্ট ফেলে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে পথে নামি।

নির্দিষ্ট সময় পার। তাই একটু বেশি তাড়া। হেলথ এডুকেশন অ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার বিল্ডিং। সে বাড়ির দোতলায় ভয়েস অব আমেরিকার কার্যালয়।

প্রবেশ পথের দুধারে দুটি মূর্তি মনোরম। দেয়ালের গায়ে খোদাই মূর্তি। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দুই নরনারী। হলের ভিতরেও তেমনি সব ছবি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণে জাতির অগ্রগতি। দেয়ালে দেয়ালে তার চিত্রপরিচয়। ফ্রেস্কো পেন্টিং। সে সব ছবির দিকে একবার চোখ বুলোই। এদিকে তাড়া-হুড়ো।

অরুণের অফিস দোতলায়। লিফ্‌ট কোথায়? এলিভেটর? এ আবার কি? এস্কেলেটর।

একজন বল্লেন, এস্কেলেটরেই ওপরে উঠে যান। তিনি উঠলেন। আমিও

তাঁর পিছে পিছে। বাঃ, বেশ তো মজা! ধাপে ধাপে পা ফেলার প্রয়োজন নেই। দাঁড়ালেই হলো। দাঁড়িয়ে বিশ্রাম। সিঁড়িই গতিশীল। বৈদ্যুতিক সিঁড়ি। তারই নাম এস্কেলেটর। খানিকবাদে আমি দোতলায়।

এও বিরাট অফিস। আমি চাই ভয়েস অব আমেরিকার ভারতীয় দপ্তর। ২৭৫৩ নম্বর ঘর। খুঁজে বার করতে আরো খানিক সময় নষ্ট। আমায় দেখেই অরুণের সূক্ষ্ম ব্যংগোক্তি: বাঙালী সময়ের হিসেবে খুব বেশি দেরি হয়নি আপনার। আসুন, আসুন।

আজ অরুণের রেকর্ডিং-এর দিন। বাংলা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অরুণ। এক মাস আগে তৈরি হবার নিয়ম। এক মাস পর গান্ধীজীর জন্মোৎসব। সে প্রোগ্রামেরই রেকর্ডিং আজ। আধ ঘণ্টার প্রোগ্রাম। সব প্রস্তুত। তবু অরুণ বল্লে:

খুব ভালো যোগাযোগ হয়েছে। আপনি বলুন না কিছু গান্ধীজী সম্পর্কে, বলুন তাঁর অহিংস নীতি নিয়ে। পাঁচ মিনিটের ছোট্ট একটি বক্তৃতা এখুনি রেকর্ড করে রাখি।

প্রথমটায় খানিক অপ্রস্তুতভাব। শেষ পর্যন্ত রাজী। একদিন সময় পেলেও না হয় বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে লিখে আনা যেতো। কিন্তু তা হবার নয়। এ ব্যাপারে আজই শেষ দিন। অরুণের অনুরোধ উপেক্ষা করাও সহজ নয়। কাজেই অনন্যোপায়। কিন্তু এখনো যে অনাহারী। অরুণও তাই। ক্যাণ্টিনে গিয়ে দুজনের আহারপর্বের সানন্দ সমাধা।

চলুন এবার ডাঃ ঘোষের সঙ্গে দেখাটা সেরে নেবেন। —ঘোষ সাহেবের ঘরে পৌঁছে আমায় পরিচয় করিয়ে দিয়ে অরুণ বিদায়।

জন্মে বাঙালী হলেও ডাঃ ঘোষ এখন পুরো সাহেব। এখন আর তিনি সুপ্রকাশ ঘোষ নন, ডাঃ ষ্ট্যানলি ঘোষ। আর ভারতীয় নাগরিক নন, মার্কিণ নাগরিক। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঈশান স্কলার ভারতীয় তরুণ আজ আমেরিকার সেবায় আত্মনিমগ্ন!

বেশ আলাপী লোক ডাঃ ঘোষ। তাঁর মুখে অরুণের কাজের প্রশংসা। নানা জায়গা থেকে নাকি অনেক প্রশংসা পেয়েছেন বাংলা অনুষ্ঠানের। কিন্তু ভয়েস অব আমেরিকায় বাংলা অনুষ্ঠানের সময় বড়ো কম। আমার তরফ থেকে সে অভিযোগ। স্বীকার করে নিলেন তা ডাঃ ঘোষ।

আর একদিন তাঁদের অফিসে আসার জন্যে ডাঃ ঘোষের অনুরোধ। তাতে সম্মতি জানিয়ে বিদায় নমস্কার।

অরুণের অফিসে বসেই বক্তৃতা লিখি। আড়াইটায় তার রেকর্ডিং। সময় নেই তাই ছুটোছুটি। মনে ভয়, আমার বক্তৃতার কোন কথায় ওদের আপত্তি হবে কি না। অরুণের কতোটা স্বাধীনতা, তাইবা কি জানি। লজ্জায় আমায় কিছু না বলে সে আবার অসুবিধায় না পড়ে, সে এক ভয়। আমার লেখায় কোন রকম কাটকুটেও আমি নারাজ। সে কথা মনে মনে।

যাক্ সে সব। মনের ভয় অমূলক। রেকর্ড হলো আমার পুরো বক্তৃতা। পয়লা অক্টোবর রাত্রিতে তার প্রচার ব্যবস্থা।

ভারতীয় দপ্তরের আরো কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ-সালাপ। সেখানে প্রায় জন পনেরো ভারতীয়। হিন্দী বিভাগের শ্রীমতী রাণী ও শ্রীবেহারী বড়ো হাসিখুশি।

অরুণের ডেস্কে অনেক মজার মজার জিনিস। দোলের আবির। পুজোর নির্মাল্য। হাতের রাখী। এর কোনটা বাড়ি থেকে পাঠানো। কোন কোনটা আবার ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা অনুষ্ঠান শ্রোতাদের প্রীতির নিদর্শন। চিঠির গাদাও ওর টেবিলে জমা। অরুণ বল্লে, চার পাঁচ হাজার চিঠি নাকি আসে প্রতি মাসে। পৃথিবীর নানা প্রান্তের অভিনন্দন বা প্রস্তাব-পরামর্শ। এ সবই ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা অনুষ্ঠানের জনপ্রীতির পরিচয়। কিন্তু এতোটা যেন বিশ্বাস করাও কঠিন।

ভয়েস অব আমেরিকা থেকে হোটেলে ফিরতে বিকেল চারটে! কতোটুকুই বা আর বিশ্রামকাল? এরই মধ্যে মনকে ছড়িয়ে দিই চার দিকে। আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে একটু আরাম।

তারপরে ঝর্ণা-স্নান। কী শান্তি! ফিট্‌ফাট হয়ে আবার বেরুই। তখন ছটা। এক কাপ বৈকালী কফিতে কতো তৃপ্তি!

নিডহামের বাড়িতে নৈশাহার। পরিচিত পথ। একটু আগে আগেই পৌঁছুই সেখানে। রিসেপশনিস্ট মহিলার হেসে অভ্যর্থনা।

খোঁজ নেবেন একটু মিঃ নিডহাম ফিরেছেন কি না?— জিগ্যেস করি।

নিশ্চয়ই।—ফোন করলেন মহিলা। বল্লেন,—তিনি আছেন, আপনাকে যেতে বল্লেন।

এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা। মিঃ নিডহ্যামের সঙ্গে সঙ্গে মিসেস্ নিডহ্যাম। আন্তরিকতায় ভরপুর পরিবেশ।

বাবা-মা ভালো আছেন তো আপনার?

অনেকটা ভালোর দিকে।—আমার প্রশ্নে নিডহ্যামের উত্তর। সে উত্তরে মনের বাধো বাধো ভাব কাটে।

কদ্দিন আছেন আর ওয়াশিংটনে? তারপরের কর্মসূচী?—এবারের উত্তরদাতা অতিথি স্বয়ং।

এখানে আর কয়েকদিন। তার পরেই নিউইয়র্কে।

নিউইয়র্কে মিঃ এস কে দে আছেন। আমাদের খুব বন্ধু লোক। কিছুদিন হলো ইউ-এন-ওর চাকরি নিয়ে এসেছেন কোলকাতা থেকে। চেনেন তাঁকে?

হ্যাঁ, জানি তাকে। কিন্তু আলাপ পরিচয় হয়নি কখনো।

ওদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের ভারি ভাব। খুবই আসা যাওয়া। ফোনে কথা বলবেন মিঃ দের সঙ্গে? খুবই খুশি হবেন ওরা আমার এখানে আপনি এসেছেন শুনে।

আবার ফোন করবেন এজন্যে?

তাতে কি আছে?—বলেই কল বুক করে ফেল্লেন নিডহ্যাম নিউইয়র্কে।

মিসেস্ নিডহ্যাম ব্যস্ত তখন রসুইঘরে। বাঁধা পাচক-চাকরের বড়ো একটা বালাই নেই আমেরিকায়। আমাদের ধনী গৃহিণীদের মতো অভ্যস্ত নন এ দেশের মেয়েরা আলস্য-বিলাসে। সপ্তাহে একদিন বা দুদিন করে ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে ঠিকা লোক। ধোয়ামোছা সাজানো-গোছানোর জন্যে প্রায় সব পরিবারেই সে ব্যবস্থা। সংসার পরিচালনার পরেও সমাজ সেবায় এদেশের মেয়েদের প্রধান ভূমিকা।

অরুণ তখনো অনুপস্থিত। আটকে পড়েনি তো আবার কোথাও? তাই ভাবি।

এঘর ওঘর ঘুরে দেখাতে লাগলেন মিঃ নিডহ্যাম।

সব ঘরেই কিছু না কিছু ভারত-স্মৃতি। তাঁর পড়ার ঘরে অনেক ভারত-গ্রন্থ। ভিজিটর বুকে আমার স্বাক্ষর চাই। স্বাক্ষরিত শেষ পাতায় দুটি নাম জল্‌জল্‌। আমার পরিচিত। লেডী রানু মুখার্জি আর আনন্দবাজার-সম্পাদক শ্রী চপলাকান্ত ভট্টাচার্য। তারই তলায় সব শেষে আমার সই।

বিশ্রাম-ঘরে ফিরে আসি। পানীয় পান বসে বসে। হঠাৎ আমার নাগরায় নিডহ্যামের নজর।

ও জিনিস আমারো আছে। কিনে এনেছি কোলকাতা থেকে। দেখবেন? —বলেই নিডহ্যাম উধাও দ্রুত পায়ে।

একটু পরেই উপস্থিতি। কিন্তু নতুন পোশাকে। পায়ে পাঞ্জাবী নাগরা। মাথায় পাগড়ী। কাছে এসেই হেসে কুটপাট। যেন সাগরে বান।

মিসেস্ নিডহ্যাম ছুটে আসেন সে হাসিকল্লোলে। স্বামীর অপরূপ রূপ-সজ্জায় উচ্ছ্বসিত শ্রীমতী।

হঠাৎ ফোন বেজে ওঠে। ছুটে যান মিঃ নিডহ্যাম।

হ্যালো, কে? মিসেস্ দে? আমি নিডহ্যাম বলছি।—কথা শুরু দুই শহরে। ওয়াশিংটন আর নিউইয়র্কে।

কোলকাতা থেকে আমার এক বন্ধু এসেছেন। যুগান্তরের মিঃ ডি আর বোস। কথা বলুন তাঁর সঙ্গে।—আমায় পরিচয় করিয়ে দিয়ে নিডহ্যাম ফোন এগিয়ে দেন আমার হাতে।

নমস্কার মিসেস্ দে। তিন মাসের জন্যে এসেছি এদেশে ঘুরে বেড়াতে। আপনারা এখানে আছেন শুনে আনন্দ হলো। মিঃ দে বাসায় নেই বুঝি?

না, তিনি এখন স্যানফ্রানসিস্কোয়। কিছুদিন তাঁকে থাকতে হবে সেখানে। তা হলেও নিউইয়র্কে এসে আমাদের এখানে আসতে ভুলবেন না যেন। আপনার নাম শুনেছি অনেক। দেশে দেখা হয়নি। বিদেশে দেখা হবে। তাতে আরো বেশি আনন্দ। কি বলেন?

নিশ্চয়ই। মিঃ নিডহ্যাম তো আপনাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাই আরো ইচ্ছে আপনাদের সঙ্গে দেখা করার। আচ্ছা নমস্কার।—ফোন ছাড়ি।

অরুণ হাজির। তার পিছু পিছু সেদিনের সেই মহিলা। যার সঙ্গে এ বাড়িতে আমাদের প্রথম বৈঠকে আমার প্রথম আলাপ। নাম বোধ হয় তাঁর মিস্ ফেয়ারওয়েদার। তাঁর আবির্ভাবে বাড়ির আবহাওয়ারই যেন উন্নতি! হয়তো এ তাঁর নামেরই গুণ।

মিসেস্ নিডহ্যামও এসে বসেন আমাদের বৈঠকে। বৈঠক জমজমাট। শুরু তত্ত্বালোচনা। ভারতীয় জীবন-দর্শনের সমর্থনে মিঃ নিডহ্যামের যুক্তিজাল।

মার্কিণ জীবনধারার পক্ষে অরুণের বাক্‌বিন্যাস। আমরা তিনজন শ্রোতা। মাঝে মাঝে দু একটি কথা আমাদের তরফ থেকে।

খাবার টেবিলেও সে আলোচনা। ভারতীয় ত্যাগের আদর্শের কথায় অরুণের কড়া জবাব।

ভারত-সংস্কৃতির প্রতি আমিও শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু দুর্নিবার বেগে যখন সারা দুনিয়ার অগ্রগতি তখন দরিদ্র ভারতের ত্যাগের আদর্শের কথা বিদ্রূপের মতোই শোনায় না কি? আগে আমাদের হোক কিছু, তারপর ত্যাগের কথা।—অরুণের কণ্ঠে উত্তেজনা। হবারই কথা।

অনেক রাতে হোটেলে ফিরি। শুয়ে শুয়েও ভারতীয় জীবন-দর্শন ও আমেরিকার জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনার কথা ভাবি। ত্যাগধর্মই কি ভারতীয় জীবনতত্ত্বের শেষ কথা? তা তো নয়। নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম। —এই তো আসল ভারত-বাণী। তবে?

শহরতলীর আমন্ত্রণ

স্বর্ণচাঁপা আর একটি ভোর। সেপ্টেম্বরের শুভযাত্রা। রোদরাঙা নগরী। মনের সাঁতার সেই রোদে।

বেরুতে চাই এক্ষুনি। প্রয়োজন কো াও নেই কোন। শূন্য-সূচী অন্তত এই বেলা। অপ্রয়োজনে ঘোরাফেরার এই সুযোগ। অনির্দেশ হাওয়ায় মনের উত্তরীয় উড়ু উড়ু। তেমনি মন নিয়ে একলা বেড়ানোর আনন্দ খুব।

কিন্তু সে সম্ভাবনার পথে বাধা। ভিড়ের নির্জনতায় হারানোর চেষ্টায় ব্যর্থকাম। ধরা পড়ে যাই আগে থেকেই। লাউঞ্জে নামতেই শ্রীযুক্তা মেহতা।

বেরুচ্ছেন নাকি ?

না, চা খেয়েই ফিরবো আবার।—মনকে চোখ ঠারি। একটু বসি।

আজ কি প্রোগ্রাম আপনার ? এবেলার ?—আবার প্রশ্ন।

আজ ছুটির ভোর।—বললাম হেসে।

বাঃ বেশ। তাহলে চলুন না, ওয়াশিংটন মনুমেণ্টটা আজ দেখে আসি। মেহতা-সংগিনীর প্রস্তাব।

শ্রীযুক্তা মেহতার এ সংগিনীটি আমার আগেই দেখা। তবে আলাপ তাঁর সঙ্গে এই প্রথম। যেমনি সুন্দর তাঁর বাক্‌বিন্যাস, তেমনি পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ। এরা স্বদেশের সুনাম বিদেশে। ইনি বোধহয় সিন্ধুবাসিনী। পেশায় ডাক্তার। কর্মকেন্দ্র দিল্লী। শ্রীযুক্তা মেহতার সঙ্গে তাই আগে থেকেই পরিচয়।

বেশ তো। কি বলেন, রাজী আপনি ? মেহতার জিজ্ঞাসা।

অরাজী হবার আর কি আছে এতে ? কোথাও গেলেই হলো। আপনাদের ব্রেকফাস্ট ?

সে সব শেষ। আপনি সেরে আসুন। আমরা তৈরি।

তাই যাই। ফিরে এসেই অভিযান শুরু। তিনজনের একটি সুন্দর দল। ইচ্ছে আমার হেঁটেই যাই। কিন্তু শ্রীযুক্তা মেহতার পক্ষে বোধ হয় কষ্টকর। দেহে ভারি। বয়সেও ভারিক্কী। তাই জিগ্যেস, ক্যাব নেবো ?

মেহতা-সংগিনীর তাতে ভীষণ আপত্তি। শ্রীযুক্তা মেহতারও সায় তাঁর স্বরে। ব্যস্, আমার প্রস্তাব বাতিল।

বাঁয়ের সড়ক পেরিয়ে ডাইনের পথ। দক্ষিণ ঘেঁষে আমাদের চলা। দৃষ্টির অগোচরে হোটেল প্রেসিডেন্সিয়াল। এদিকে পথ হারাই। একটু বেশি চলায় তাই বিলম্ব। চড়ার দিকে সূর্যানুরাগ।

অনেক প্রাসাদ এড়িয়ে পেরিয়ে এসে সামনে মাঠ। দৃষ্টি পিছলে যায় অনেক দূর। নরম সবুজ ছড়ানো মুক্ত প্রান্তর। কোলকাতার ময়দানের মতোই তার বিস্তার। মাঝখানে মনুমেণ্ট। আমাদের অক্টারলনীর চেয়েও অনেক উঁচু। আকাশ ছুঁই ছুঁই তার চূড়ো। বাতাস আলিংগনে মূর্ছিত-প্রায়। উচ্চতার সিঁড়ি ভাঙে মুগ্ধ চোখ।

পরিচ্ছন্ন ঘাসে মোড়া মনুমেণ্ট প্রাংগণ। মনুমেণ্ট ঘিরে এক লাইন বসার আসন। একধারে সারি সারি অনেকগুলো চেয়ার। সেদিকে ছায়া। একটি ছোট্ট সভা। একজন কি বলছেন যেন। আসনে আসনে সব মুগ্ধ শ্রোতা। বক্তৃতা শেষ। সভা ভংগ। শ্রোতারা যে যার আসন ছেড়ে এদিক ওদিক।

আবার নতুন সমাবেশ। আমরাও এবার সেই দলে। সেই বক্তারই আবার আবির্ভাব। তাঁর বক্তৃতা শুরু: The shaft of the Washington Monument is the tallest work of masonry in the world. ওয়াশিংটন স্মৃতিসৌধের পরিচয় বর্ণনা। তার ইতিবৃত্ত। মনুমেণ্টে ওঠার আগে মন তৈরির সুন্দর ব্যবস্থা।

উচ্চতায় পাঁচশো পঞ্চান্ন ফিটেরও বেশি ওয়াশিংটন মনুমেণ্ট। সৃষ্টিকালের পরিধি ছত্রিশ বছর। ১৮৪৮ থেকে ১৮৮৪। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে ৮৯৮টি ধাপ। এলিভেটরে মিনিট তিন। আকারে বিশাল এ স্মৃতিসৌধ। গঠনে সহজ। নিরাভরণ। ভেতরে নানা রাষ্ট্রের স্মারকচিহ্ন। সে সব অমূল্য সম্পদ।

শোনা শেষ। এবার আমাদের দেখার পালা। চোখে চাখার। এক একটি দল সামনে এগোয়। মনুমেণ্ট ঘেরা লাইন-আসনে উপবেশন।

হঠাৎ অদূরে দৃষ্টি-পীড়া। সুন্দর ঘাসের বুকে অসুন্দর আবর্জনা। কিছু ছড়ানো কাগজ। সিগ্রেটের বাক্স। চকোলেটের রঙীন মোড়ক। অবাক চিন্তা। কোথায়ও বড়ো নজরে পড়েনি এমনিতরো! আমাদের মতোই হয়তো কারুর অসতর্কতা।

আসন বদলে বদলে ঘুরে চলি। ঘুরে ঘুরে এগুই। ঘুরতে ঘুরতে এবার প্রায় মনুমেন্টের প্রবেশপথের কাছাকাছি। সাহায্য-কৌটো হাতে একজনের আবির্ভাব। সবারই কিছু কিছু দান যেমন ইচ্ছে। শ্রদ্ধাপূর্ণ স্বেচ্ছার দানে স্মৃতিসৌধ রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা। ভালোই।

এবার ভেতরে প্রবেশ। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার কি দরকার? এলিভেটর পদভর। উঠছি তো উঠছিই। চূড়োয় পা। কী অপূর্ব শিহরণ!

ঐ তো ক্যাপিটল। ফেডারেল গভর্নমেন্টের আইনসভা ভবন। সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদের অধিবেশন বসে যেখানে। জানলা বরাবর এখান থেকে কী সুন্দর দৃশ্য!

মন বলে আরো দেখো। এখান থেকে দৃষ্টিশরে বিদ্ধ সব কিছু। গোটা রাজধানী শহর। এক এক জানালায় রাজধানীর এক এক বৈশিষ্ট্যে দৃকপাত। এধারে লিংকন স্মৃতিসৌধের দৃশ্যশোভা। পাশের গবাক্ষপথে জেফারসন মেমোরিয়ালের অনিন্দ্য কারুকলা চোখ ধাঁধায়। তারপর শেষ জানালায় চোখ ছড়াই। এদিকে নগর-প্রেয়সী পটোম্যাক। নগর-মাটির সঙ্গে তার কতো যে মাখামাখি! নগর-নাগরীর কতো না মাতামাতি! ঢেউয়ে ঢেউয়ে আনন্দ-গান।

এলোমেলো ছড়ানো কথা। বহুজনের স্বরবিতান। কান রাখি। কিছু শুনি, কিছু হারাই। পটোম্যাকে স্নান নিষিদ্ধ। একজনের কথায় বোবা বিস্ময়। কেন? স্বাস্থ্য-বিধি। কী আশ্চর্য! আর গংগাস্নান আমাদের স্বাস্থ্য-বিধান!

আর একটি নিষেধাজ্ঞার উল্লেখ আর এক কণ্ঠে। ওয়াশিংটন মনুমেণ্ট থেকে উঁচু বাড়ি তোলা নাকি নিষেধ এ শহরে। একথা আগেও শোনা। ওয়াশিংটনের প্রতি মাথা-নত-করা শ্রদ্ধাবোধ।

স্বর্গ থেকে বিদায়। যে পথে ওঠা সে পথে নামা।

চলুন, মনুমেণ্ট অফিসটা দেখে যাবেন।—একজন অপরিচিতের আহ্বান। তাঁকে অনুসরণ। সারি সারি চেরি গাছ ফুলে ফলময়। রঙের সমারোহে বসন্ত-বন্দনা। আহা মরি মরি!

এ আবার কি অফিস? একটি প্রদর্শনী। রাজধানীর নানা দ্রষ্টব্যের মডেল-পুতুল। কতো রকম রকম ছোটবড়ো সব ছবির বই। রংগীন ছবির

পোস্টকার্ড। ছোটদের খেলনা। চিত্রবিচিত্রিত সিগ্রেট কেস, অ্যালবাম, লাইটার। আরো কতো কি! ওয়াশিংটনের লিখিত কতোগুলো সযত্নরক্ষিত চিঠিপত্র। এমনি নানা দ্রব্যের সমাবেশ। স্যুভেনির হিসেবে কিছু কিছু কেনাকাটা। অফিস দেখতে এসে কিছু খরচ।

আরো কিছুক্ষণের জন্যে পদচারণা। শহর দেখি। শহরময় সরকারী ভবনের ছড়াছড়ি। একটি বিরাট প্রাসাদের সামনে এসে ক্ষণিক থামি। ঠিক যেন অনেকটা আমাদের কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনের মতো। প্রাচীন করিন্থিয়ান স্টাইলে নির্মিত বিরাট ভবন। অদূরে অবস্থিত ক্যাপিটল ভবনের সঙ্গে সুসমঞ্জস। আমেরিকার বিধানসভার কাছাকাছি সর্বোচ্চ বিচারালয়। সুপ্রীম কোর্ট। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ব্যাখ্যা ও তার মর্যাদা রক্ষায় দায়িত্ব এই বিচারশালার। আগামী দিনের আমেরিকার আইনসংগত পথনির্দেশ এখান থেকে। ১৯৫৪ সনের ১৭ মে এই সর্বোচ্চ আদালত থেকেই কালো-ধলার পার্থক্য বে-আইনী ঘোষণা। দেশের সকল মানুষের সমানাধিকার। 'পৃথক কিন্তু সমান' নীতির পরিবর্তন। মানুষে মানুষে পার্থক্য বিলোপ। সকলের জন্যে সমান সামাজিক মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধের স্বীকৃতি। ধর্মাধিকরণের ধর্মবোধ আরো জাগ্রত হোক। সুপ্রীম কোর্টের সামনে দাঁড়িয়ে এই কামনা। কিন্তু সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত সম্পর্কেও কী প্রচণ্ড বিরুদ্ধতা আমেরিকায়! রক্ষণশীল সভ্য শ্বেতাংগদের কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের প্রতি সভ্যতা-বিরোধী ব্যবহার। এখনো তা চালু রাখতে তাঁরা বদ্ধপরিকর। মার্কিন জাতির এ এক মহাকলংক।—পথ চলি আর ভাবি।

পথে ইণ্টারন্যাশন্যাল কাফেটেরিয়া। আগেরই পরিচিত। এখানেই খাওয়া সারি। এখান থেকে ধীরে সুস্থে হোটেলে ফিরি। পথের শেষেই যেন তীব্র পথশ্রান্তি। একটু দাঁড়াই।

আপনার চিঠি।—রিসেপশনিস্টের ডাকেই যেন শ্রান্তি দূর।

হ্যাঁ, দেশেরই চিঠি। এবার বাড়ির। নিজের ঘরে গিয়ে বসি চিঠি নিয়ে। একসঙ্গে অনেকের চিঠি এক খামে। দুচারটি করে কথা অনেকজনের। তারা সবাই যেন আজ আমায় ঘিরে। শ্রীমান কুনালের গুরুতর অভিযোগ। তাকে আমি চিঠি দিইনি ভিন্ন করে। সত্যি ভারি অন্যায়। কুনাল আমার মেজ ছেলে।

বাড়ির কথায় মন তোলপাড়। দেশের কথায়। একদফা ঘুম। জেগে উঠেই হঠাৎ খেয়াল। আজো সন্ধ্যায় আমন্ত্রণ।

নগর-সভ্যতার সর্বাধুনিক রূপ আমেরিকার। তার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ এই দেশে। অতুলনীয় সমৃদ্ধি অপরিমিত বৈভবের সাক্ষ্য তার শহরে শহরে। সে সবের কিছুটা আগেই জানা। তার পল্লীজীবনের পরিচয়লাভে মন উন্মুখ। যেখানে প্রকৃতি উদার। যেখানে অনন্ত প্রাণ-মহিমা।

রোদ-রেণু-ঝরা শান্ত বিকেল। নির্দেশিত পথে আমার যাত্রা। নাইনটিন্থ ও আই স্ট্রীট। তার সংযোগস্থলে এসে দাঁড়াই। সেখান থেকে আই স্ট্রীট ধরে বাসে চিভি চেজ সার্কেল।

চিভি চেজ! ভারি সুন্দর নাম। বনাঞ্চল বুঝি ওদিকটায়? শিকারীদের তাই কাম্য স্থান। নাম-মাহাত্ম্যে অন্তত তাই বোঝায়। কিন্তু আমি সে পথে? ব্যাধ-বৃত্তি তো আমার নয়! নাইবা হলো। বন-মহিমায় মন-মুক্তি। সাময়িক হলেও তাই পরম লাভ।

চল্‌ছে বাস। স্ট্রীটকারের মতো বাসও এখানে কণ্ডাক্টরহীন। ড্রাইভারের সামনে স্লট মেশিন। সেখানে কুড়ি সেণ্ট ফেলে দিয়ে আসন গ্রহণ। গত-কালের অভিজ্ঞতায় ভুল হবার আশংকা দূর।

রাজধানী ছেড়ে আমাদের বাস এখন অনেক দূরে। দুধারে ঘনদেহ বনবীথি। কল্পলোকের কোন মায়াপুরীর মাঝখান দিয়ে যেন আমাদের গতিপথ। সুদৃশ্য প্রচ্ছদে মোড়া একখানি মহাকাব্য যেন আমার সম্মুখে। সে মহাকাব্য পাঠে আমি আত্মহারা। মনের স্বতন্ত্র চৈতন্যসত্তার আবিষ্কারে আমি যেন আত্মসমাহিত।

হঠাৎ নির্ঝরের স্বপ্নভংগ। পাশের আসন থেকে এক ভদ্রলোকের মৃদু আহ্বান। আমি কেঁপে উঠি।

আপনি ইণ্ডিয়া থেকে এসেছেন? স্টুডেণ্ট?

হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন, ইণ্ডিয়া থেকেই এসেছি। আর স্টুডেণ্ট বৈ কি? শিক্ষার কি শেষ আছে?

আপনি এখানে কি করেন?—ভদ্রলোককে আমার পাল্টা জিজ্ঞাসা। কথায় কথায় তাঁর পরিচয় লাভ। তিনি মহারাষ্ট্রীয়। আমাদের দূতাবাসের একজন কর্মচারী। ছুটির বিকেলে সকন্যা ভ্রমণ একটু।

চিড়িয়াখানা দেখেছেন এখানকার ?

না, তা দেখার অবসর হয়নি। তাছাড়া মুক্ত জীবজন্তুর বন্দীদশা দেখা আমার অপছন্দ। শিকারীদের ওপর আমার তাই বিরাগ।

কি বলেন? ওয়াশিংটনের পশুশালা যে পৃথিবী-বিখ্যাত! তা দেখে যাবেন না? যাই বলেন, আমার কিন্তু ভারি ভালো লাগে। আগেও বার দুই দেখেছি। আজ আবার চলেছি।

ও, তাই বুঝি? এদের তো আরো ভালো লাগার কথা। ছোটবেলা আমারও লাগতো। পশুশালায় শেখবার জানবারও অনেক কিছু।—ছোট্ট মেয়েটির দিকে লক্ষ্য করে হেসে বললাম আমি।

এই তো এসে গেলাম প্রায়। ডানদিকের অরণ্যঘেরা নিচু পাহাড়ী অঞ্চল। তারই মধ্যে অতি সুন্দর চিড়িয়াখানা। সিংহ, ব্যাঘ্র, গণ্ডার, হাতি প্রভৃতি হিংস্র জীবজন্তুর মধ্যে অনেক কিছুই অপরিচিত এদেশের মানুষের কাছে। গেলে দেখতে পাবেন কাক-শকুনেরও কী যত্ন এই পশুশালায়! বিস্মিত হবেন পেংগুইন, ঈগল, কস্তুর প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাখি দেখে। এমনি আরো কতো সব দেখার।—আমায় প্রলুব্ধ করার প্রচুর চেষ্টা ভদ্রলোকের। আমার এনগেজমেণ্টের কথা বুঝিয়ে বলার পর নিরস্ত। সকন্যা তিনি নেমে গেলেন একটু পরেই।

আর কতো দূর চিভি চেজ? ছাড়িয়ে চলে আসার তো নেই ভয়। ওতো একেবারে বাস টার্মিনাল। চলার পথের শেষ চিভি চেজ। কাজেই আর কিসের ভয়।

দেখতে দেখতেই টার্মিনালে এসে বাস দাঁড়ায়। লোকালয়-বিরল একটি এলাকা। তার মধ্যে এই টার্মিনালেই যা কিছু লোক-কোলাহল।

ছটা বাজতে এখনো বাকি। এখনো বিকেল রোদরাঙা। কোথায় মিঃ ও মিসেস্ নিউটন ব্লেকস্লি? বাস টার্মিনালে তাঁদের থাকার কথা। মিস কেলোও কি এসেছেন এই বাসে?

বৃথাই খোঁজাখুঁজি। কারুরই নেই দেখা। অনেকক্ষণ ধরে তৃষ্ণাবোধ। সাদা জল পেলেই যেন ভালো। টার্মিনাল বিল্ডিংএর ভেতরে যাই। এখানেও তো থাকতে পারেন ব্লেকস্লি দম্পতি? না, তাঁদের হদিস্ নেই এখানেও। কিন্তু চমৎকার একটি জলের কল দেখে মন খুশি। মুখ বরাবর কলের মুখ।

পায়ের তলায় বোতামের চাপে কলের মুখে জলধারা। হাতের সাহায্য নিষ্প্রয়োজন। কতো সহজে তৃষ্ণা তৃপ্তি!

বেরিয়ে আসি। টার্মিনাল বিল্ডিং-এর পিছন দিকে যাই। বাস মোড় নেয় সেদিক দিয়ে। সে দিকটায় আরো নিরিবিলি। একটি বেঞ্চিতে এক জোড়া মানুষ। এরাই নাকি? না, তা বোধ হয় নয়। গল্পমত্ত তরুণ-তরুণী। রোমাঞ্চ চিহ্ন এঁদের চোখে-মুখে। তাই সন্দেহ। তবু ঘুরিয়ে প্রশ্ন করি:

যদি কিছু মনে না করেন, মেরিল্যাণ্ডের গ্যারেট পার্ক কদ্দূর এখান থেকে বলতে পারেন?

ঘাড় নাড়লেন তরুণ। সসম্ভ্রম উত্তর।—দুঃখিত, আমরা জানিনে। আমরাও এখানে নতুন।

বুঝলাম আমার চাওয়া লোক তাঁরা নন। ফিরে এলাম। চিভি চেজ সার্কেলের সামনে আসি। এ খোলা জায়গাটি মনোরম। এখানে দাঁড়াই একটু। আর একখানি বাস আসে। যাত্রীরা নামেন একে একে। এঁদের মধ্যেই বা কোথায় ফিলিপাইনবাসিনী মিস্ কেলো?

আপনি মিঃ বোস?—চমকে উঠি হঠাৎ প্রশ্নে।

হ্যাঁ। আপনি নিশ্চয়ই মিঃ ব্রেকস্লি।

ঠিকই বলেছেন। আমি খুবই লজ্জিত আমার দেরির জন্যে। মার্জনা করবেন। মিস্ কেলো কোথায়? তিনি আসেন নি?

না, তাঁকে তো দেখছি না এখনো অবধি।

এখনো আসেননি?—একটু চিন্তান্বিত যেন মিঃ ব্রেকস্লি। তারপর বল্লেন, একটা ফোন করে দেখা যাক তাঁর হোটেলে। বলেই কাচের ঘরে ঢুকে ফোন করে বেরিয়ে এলেন। মিস্ কেলো হোটেলে নেই, বেরিয়ে এসেছেন অনেকক্ষণ আগে।—এই খবর।

তাহলে এলেন বলে। এ মেয়েটি আপনার বুঝি?—মিঃ ব্রেকস্লিকে জিজ্ঞাসা।

না, এটি আমার দিদির মেয়ে। কদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে আমাদের কাছে।—কতোক্ষণ ধরে এমনি সব কথাবার্তা। মিস্ কেলোর জন্যে অধীর প্রতীক্ষা।

ঐ আসছে আর একখানি বাস। এবার নয় নিষ্ফল আশা। ঐ নিশ্চয় মিস্ কেলো। সত্যি তাই।

ফিলিপাইন কন্যাকে সাদর অভ্যর্থনা। এবার গাড়িতে। মিঃ ব্লেকসলি নিজেই চালক। তাঁর পাশে বসে অনেক গল্প। পিছনের আসনে ছোট্ট মেয়েটি মিস্ কেলোর কথার জুড়ি।

মাইল ষোল পথ চিভি চেজ থেকে গ্যারেট পার্ক। এ পথ যেন না ফুরনোই ভালো, এমনি পথ। পলাশ সন্ধ্যায় হাওয়া-মাতাল একটি অভিযান। অরণ্য ছায়ার উৎসবে আমরা যেন বিশেষ অতিথি। সেই অতিথি বরণ। দুদিকে বাতাস-গান।

কথায় কথায় অনেক জানাজানি। ভূগোল বিষয়ক একখানি সাময়িক-পত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মিঃ ব্লেকস্লি। তার অন্যতম সম্পাদক। ভৌগোলিক তথ্যে তাঁর তাই প্রভূত জ্ঞান। বিশেষ করে নিজের দেশের নানা তথ্যের ওপর তাঁর বেশ দখল।

আমেরিকার গ্রামজীবন কেমন? কেমন এদেশের চাষ-বাসের অবস্থা? সে সব জানার খুবই ইচ্ছে। সে নিয়ে আমার দু চারটি প্রশ্ন। ব্লেকস্লির কাছ থেকে সে সবের সহজ উত্তর।

আমেরিকার এক পঞ্চমাংশ লোক আজও কৃষি-নির্ভর। কৃষি ও শিল্পের মধ্যে সমন্বয় সাধনে দেশের সর্বাংগীণ উন্নয়ন। ওয়াশিংটন-জেফারসনের আমল থেকেই সে নীতি অনুসরণ। শিল্প-বিজ্ঞানে আমেরিকার অভাবনীয় অগ্রগতি। কিন্তু কৃষি ব্যবস্থায়ও তার বৈপ্লবিক উন্নতি অনস্বীকার্য। আজ শতকরা নব্বুই-এরও বেশি খামারে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা চালু। পল্লী এলাকায় ছোটবেলা থেকেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে চলে নানা রকমের প্রতিযোগিতা। চাষ-বাস, গৃহস্থালী ও নাগরিক কর্তব্য পালনের পরীক্ষায় রীতিমতো পুরস্কার পায় তারা। এমনি সব প্রতিযোগিতায় জাতীয় পুরস্কারেরও রয়েছে ঢালাও ব্যবস্থা। কৃষি উন্নয়নে প্রেরণাদানে আরো কতো রকমের সুযোগ-সুবিধে।

সন্ধ্যা গড়িয়ে গড়িয়ে তখন সে প্রায় তার সীমান্ত রাজ্যে। পল্লী বনপথের শান্ত কিনারায় মাঝে মাঝে বিজলী বাতির আলো ঝলক। বাগান ঘেরা ঘেরা অনেক দূরে দূরে এক একটি বাড়ি। তেমনি একটি বাড়ির কাছে এসে গাড়ি থামে।

গেটে দাঁড়িয়ে সননদিনী মিসেস্ ব্লেকস্লি। একটু এগিয়ে এসে সাদর অভ্যর্থনা। ছোট্ট বাড়ি। সামনেই বৈঠকখানা। সেখানে বসি। পিয়ানোর ওপর জার্মান সুরকার স্থব্যেয়ারের স্বরলিপি। দেয়ালে দুখানি সুন্দর অয়েল পেন্টিং। মেহগিনি কাঠের বুকশেলফ্-এ সাজানো-গোছানো কিছু বই। এক কোণায় ছোট্ট একটি টেবিলের ওপর ফ্লাওয়ার বাস্। তার এক পাশে পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখা কিছু সাময়িক পত্র।

বৈঠকখানায় আমাদের দেশেরও কিছু কিছু ফার্নিচার। তা দেখে বিস্ময়। তাই জিগ্যেস মিঃ ব্লেকস্লিকে, আমাদের দেশে তাঁরা গিয়েছিলেন কিনা কখনো।

না ইচ্ছে থাকলেও তা আর হয়ে ওঠেনি এ অবধি। তবে আমার এক দিদি দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন আপনাদের দেশে। ভারতের মাটি আর মানুষকে কী যে ভালোবাসতেন তিনি তা বলার নয়।

ভারতে কোথায় থাকতেন তিনি, কি করতেন ?—জানতে চাই।

তিনি ছিলেন মিশনারী। বম্বে ছিলো তাঁর কর্ম-কেন্দ্র।

দেশে আসতেন নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে ?

মাঝে মাঝে নয়, কদাচিৎ। আর এসেও থাকতে পারতেন না বেশিদিন। ছুটে যেতেন আবার ভারতে। জীবনের বেশির ভাগই কেটেছে তার সে দেশে। সেখানেই তাঁর শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ। এসব তাঁরই স্মৃতিচিহ্ন।—বলতে বলতে মিঃ ব্লেকস্লির কণ্ঠে কেমন যেন একটু অসচ্ছলতা। এখানেই এ প্রসংগের তাই শেষ। তাই ভালো।

হুইস্কি, স্যাম্পেন, ভারমুথ অথবা আর কিছু? —মিসেস্ ব্লেকস্লির সবিনয় জিজ্ঞাসা।

না, ধন্যবাদ। এনি সফ্ট ড্রিংক।—মিস্ কেলোরও সায় আমার কথায়।

একটু বাদেই এক গ্লাস করে আইস-টি আমাদের হাতে হাতে। সত্যি সত্যি বরফ-চা। বরফ-জলে ভেজানো চায়ের সরবৎ। চিনি ও লেবুর রসে অপূর্ব স্বাদ। গ্রীষ্ম-পিপাসায় পরম তৃপ্তিকর।

এদিকে ননদিনী ব্যস্ত ভাই-বৌয়ের গুণপনা দেখাতে। মিসেস্ ব্লেকস্লির আঁকা তাঁর স্বামীর একখানি অসমাপ্ত তৈলচিত্র। তা নিয়ে হাজির ব্লেকস্লি-

ভগিনী। সত্যি নিখুঁত চিত্র। ঘরের আরো কখানি ছবিও নাকি তাঁরই আঁকা। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছবি আঁকা তাঁর হবি।

এ বাড়িতে বৈঠকখানা ছাড়া দুখানা বেডরুম। বাড়ির পিছন দিকে রসুই ঘর আর খাবার ঘর। সঙ্গে গ্যারেজ। স্বামী-স্ত্রীর সংসার। এই যথেষ্ট। গ্রামাঞ্চলে প্রায় সব বাড়িই এমনি ছোট ছোট। দূরে দূরে। জন-সংখ্যা অনুযায়ী ঘর-সংখ্যা। সাধারণত মাথা-পিছু একখানি ঘর। কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়েও বেশি।

আমাদের দেশে গ্রামের বাড়িতে গাড়ি থাকার কথা ভাবা কঠিন। এ দেশে কোন বাড়িতে গাড়ি না থাকাটাই দুর্ভাগ্যের কথা। চল্‌তি বছরে আমেরিকার লোক সংখ্যা সতেরো কোটি প্রায় ধরো ধরো। আর গাড়ির সংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি। গড় হিসেবে প্রতি তিনজনে একখানা গাড়ি। এও নাকি যথেষ্ট নয়! গাড়ির অভাবে কাজের অসুবিধে! পাঁচ বছরের মধ্যে লোক সংখ্যার আধাআধি হবে গাড়ির সংখ্যা, এই আশা।

চলুন খাওয়াটা সেরে নেওয়া যাক এবার। —মিসেস্ ব্লেকস্‌লির ডাকে সবার সাড়া।

ডাইনিং হলটি অনেকটা যেন বারান্দা-ঘর। লোহার জালে ঘেরা তার তিন দিক। পর্দা সরাতেই চাঁদের আলোয় স্পষ্ট প্রকৃতি। সামনে পাইন-ওক গাছের সারি-মিছিল। অনেকটা যেন বীর সৈনিকদের শান্তি যাত্রা। মুখর পটভূমি।

অনেক কথা। বিষয়-সূচীও দীর্ঘ বেশ। ফিলিপাইনের প্রসংগ প্রথম আলোচ্য। প্রশান্ত মহাসাগরের অন্যতম দ্বীপরাষ্ট্র ফিলিপাইন। তার দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা তোলেন মিস্ কেলো। প্রায় দুকোটি লোকের দেশ। লক্ষ লক্ষ লোক এখানে বেকার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর স্বাধীনতা লাভ। আমেরিকার সে অবদান। তা নইলে গোটা দেশটাই নাকি হতো 'হুকবালাহাপ' কবলিত। তার মানে রুশ তাবেদার। এককালের জাপ-বিরোধী সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী এই 'হুকবালাহাপ' দল। পরবর্তী কালে এরাই আবার কম্যু-নিষ্টপন্থী। আমেরিকাই রক্ষক ফিলিপাইনের। তার জন্যে মিস্ কেলোর গভীর কৃতজ্ঞতা। আমেরিকার সাহায্য ছাড়া তাদের অগ্রগতি অসম্ভব, এ অকুণ্ঠ ঘোষণায়ও তাঁর আনন্দ বোধ। রাজধানী ম্যানিলার এক হাসপাতাল ধাত্রী মিস্ কেলো।

ঋণ স্বীকার মানে নতি স্বীকার নয়। কৃতজ্ঞতা প্রকাশে আপত্তি নেই। কিন্তু তার মধ্যে থাকবে না কেন জাগ্রত এশিয়ার বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি? মিস্ কেলোর কথায় পাইনি সেই মন-উজ্জ্বল অনুভব। অগ্রগতির সাধনায় অবিচল পরনির্ভরতা আত্ম-শক্তির ওপর গভীর অবিশ্বাসেরই পরিচায়ক। তাই দুঃখ।

রাত বাড়ে। কথা কমে। অবশেষে বৈঠক ভাঙে। অতিথি বই-এ আমাদের স্বাক্ষর রাখেন ব্লেকস্লি-দম্পতি। একখানি করে ফটোও। তারপর বিদায়ের পালা।

আবার পথে। মিঃ ব্লেকস্লির গাড়িতে এবার আমরা ফিরতি পথিক। চিভি চেজ যাত্রী। নিঃশব্দ গ্রাম-রাত্রি। চাঁদের হাসি গাছের ডালে ডালে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা সুর-সংলাপ। উৎকর্ণ হয়ে তাই শুনি। এ যেন আমার পূব বাঙ্‌লার গ্রামের সকরুণ কান্না। দ্রুতগতি গাড়ি। ক্ষণপরেই দূর শূন্যতায় স্তব্ধ সে কান্নারোল।

ছড়ানো ছায়ায় ঘনরাত। আরো দূরে বিস্তারিত বিপুল দিগন্ত। আমরা চিভি চেজে। দুবাসে দুজন। রাজধানীর দু প্রান্তের যাত্রী আমি ও মিস্ কেলো। মিঃ ব্লেকস্লি বিদায়।

নিদাঘ মধ্যরাত্রিতে বাস অভিযান। মাইল চব্বিশ পথ। গভীর নিবিড় নির্জনতায় সে দীর্ঘপথ উত্তরণ। অবিস্মরণীয় অনুভব।

ছুটির দিনের নিবিড় আড্ডা

ঘুরে এলো রবিবার। মুক্তপক্ষ আর একটি ছুটির দিন। আর কদিন বাদে রাজধানী ত্যাগ। এখান থেকে নিউইয়র্কে, বোষ্টনে, আরো কতো জায়গায়। কিন্তু তবু যেন কিছুই নয়। কতোটুকুই বা দেখা সম্ভব তিন মাসে? বিরাট দেশ। বিরাটতর জাতি। এদের কতোটুকুই বা জানার অবকাশ হবে এই অল্প সময়ে? সুখশয্যায় সৌখীন ভাবনা।

শিশু সূর্যের হামাগুড়ি। জানালা ডিংগিয়ে আমার ঘরে তার ছানা। উঠে বসি। আজ তো আবার মধ্যাহ্ন আহারের আমন্ত্রণ। পুরোপুরি একটি ভারতীয় আড্ডার আয়োজন। শ্রী গোয়েল আর শাস্ত্রীজীর উদ্যোগ। ইণ্টার-ন্যাশনাল সেণ্টার থেকে ওদের বিদায় নেবার দিন। সে উপলক্ষেই আজকের এই আনন্দ-ব্যবস্থা। কাল রাতে হোটেলে ফিরেই হস্তগত তার স্মরণী-পত্র।

আমরা দুজন আমন্ত্রিত। আমি আর শ্রীমতী রাধালক্ষ্মী। বিদেশী পরিবেশে কয়েকটি দেশী মনের ছোঁয়াছুঁয়ি। একটি মিষ্টি দুপুরের কল্পনা।

একটু তাড়াতাড়িই যাবার কথা। কিন্তু তৈরি হয়ে বেরুতে বেরুতে বেশ দেরি। তায় আবার নতুন পোশাক। শেরোয়ানী আর চোস্ত্ পায়জামা। সে সজ্জা পারিপাট্যেও কিছু সময়ক্ষেপ। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেই হাসি। বাঙালী আমি হিন্দুস্তানী বন্ গিয়া। বেশ লাগছে দেখতে। নার্সিসাস্!

ম্যাসাচুসেটস্ এভিন্যু এলাকা। আমাদের দূতাবাসের কাছাকাছি একটি নিরিবিলি রাজপথ। এ পথেই শাস্ত্রীজীদের বাস। নম্বর মিলিয়ে মিলিয়ে সে বাসা খুঁজতে হয়রাণি। এই তো সেই নম্বর। সে বাড়ির সামনেই একটু ঘোরাঘুরি। হঠাৎ বেরিয়ে আসেন এক তরুণ। সুদর্শন।

কাকে চাই?

শ্রী গোয়েল ও শাস্ত্রীজীর কথা বলতেই আমায় নিয়ে তিনি তিন তলায়। যুবক একজন ভারতীয় মুসলমান। নাম মিঃ হোসেন। এ বাড়িতেই নিচের এক ঘরে একক ভাড়াটে। ওপরে উঠতে উঠতে কিঞ্চিৎ আলাপ।

আমিই প্রথমে অভ্যাগত। শাস্ত্রীজী আর গোয়েল দুজনেরই সে কী ব্যস্ততা! শোবার ঘরেই রান্নাবান্নার সব ব্যবস্থা। গোয়েল স্বয়ং পাচক আর শাস্ত্রী তাঁর সহকারী।

ধনীর দেশ আমেরিকা। সেখানেও থাকা চলে বেশ কম খরচায়। তারই হদিস এইখানে।

দুই সিটের প্রশস্ত ঘর। দরকারী সব ফার্ণিচার আর রান্নার বিধিব্যবস্থা। সব মিলিয়ে সাপ্তাহিক ভাড়া মাত্র দশ ডলার। হোটেলে শুধু থাকার খরচই কম করে হলেও দৈনিক চার ডলার। তাছাড়া এপার্টমেণ্টে স্বপাক খাওয়াতেও অনেক লাভ। স্বল্প খরচে মোটামুটি সুব্যবস্থা।

রান্না শেষ। খাওয়ার এখনো অনেক দেরি। শ্রীমতী রাধালক্ষ্মীর অনুপস্থিতিতে আনন্দ-আসরে নিস্প্রাণতা। শাস্ত্রীজীর অশেষ উৎকণ্ঠা। হোটেলে ফোন করে খোঁজ নেবার জন্যে ব্যগ্রতা। কিন্তু ভাবতে ভাবতেই রাধালক্ষ্মীর আবির্ভাব।

আর একটু আগে এলে রান্নারও সুযোগ পেতেন। আমরা সুযোগ পেতাম আপনার হাতের রান্না খাওয়ার। —শ্রীমতী রাধাকে লক্ষ্য করে শাস্ত্রীজীর রসিকতা।

সত্যি একটু দেরি হয়ে গেলো আমার।—হেসে উত্তর। সংক্ষিপ্ত উত্তরে দেরির জন্যে অনুশোচনা।

না, না, কোথায় এমন দেরি? মেয়েদের একটু কন্‌সেশন দিতেই হয়। সাজগোজে তাঁদের কিছু সময় চাই। আর আমাদের তৃপ্তির জন্যেই তো আপনাদের সাজসজ্জা। কাজেই একটু দেরির জন্যে আপত্তি করলে চলবে কেন? কি বলেন?—রাধালক্ষ্মীর হয়ে আমার কিঞ্চিৎ ওকালতি।

এদিকে স্নানপর্ব শেষে নিচ থেকে উর্ধ্বলোকে মিঃ হোসেন। উর্ধ্বলোকে মানে তেতলায়। আমাদের বৈঠক জমজমাট। প্রথমে কফির আসর। কফির কাপে কথার ঝড়। সামান্য ঝড় নয়, একেবারে টাইফুন। আলোচ্য-বৈচিত্র্যে আবহাওয়া নরম-গরম। আমেরিকায় ভারত-বিরোধী প্রচার। তা প্রতিরোধে আমাদের সরকার প্রায় নিশ্চেষ্ট। বেসরকারী দিক থেকেও এ বিষয়ে আমাদের অনেক কিছু করণীয়। আমরা উদাসীন। মার্কিণ পত্র-পত্রিকায় ভারত-বিরোধী অপপ্রচার নতুন নয়। তার প্রতিবাদও হয় না যথারীতি। অপপ্রচার

প্রতিরোধ ও ভারত বিষয়ক যথার্থ প্রচার ভারত-মার্কিণ সম্প্রীতি প্রসারে শ্রেষ্ঠ উপায়। দেশে দেশে সম্প্রীতি রক্ষা সকলের স্বার্থেই প্রয়োজন।

তারপরে আমেরিকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রসংগ। মিঃ হোসেন এদেশে আছেন কয়েক বছর। তিনি ছাত্র। এখানে চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁর অধ্যয়ন। কাজেই এ দেশের শিক্ষা পদ্ধতি ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ে কিছু কিছু তাঁর নিশ্চয়ই জানা। আমেরিকায় শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষাব্রতীদের মধ্যেই মতের অমিল। তবে সার্বজনিক আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা এ দেশের অগ্রগতির অন্যতম মূল কারণ। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক। স্কুল শিক্ষার খরচও অতি সামান্য। সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাই অবৈতনিক করার দিকে সরকারী ঝোঁক। যুগের প্রয়োজনে শিক্ষা ব্যবস্থারও গতি-প্রকৃতির পরিবর্তন। ব্যবসায়িক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার দিকে আধুনিক ঝোঁক। তবে যে কোন বিষয়েই হোক শিক্ষায় সম্পূর্ণতা বিধান এ দেশের বিদ্যায়তনের বৈশিষ্ট্য। ফাঁকির উপায় নেই। কর্মজীবনে তার প্রভাব। ন্যস্ত দায়িত্বের সুষ্ঠু সম্পাদন না হওয়া অবধি কোন কর্মীর স্বস্তি নেই, শান্তি নেই।

ভালো লাগছিলো মিঃ হোসেনের এ সব কথা শুনতে। শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে আরো বিশদ জানার আগ্রহ তাই প্রবলতর। জনস্বাস্থ্য বিষয়েও আমেরিকার অভাবনীয় অগ্রগতি। শ্রীমতী রাধালক্ষ্মী ও মিঃ হোসেনের মধ্যে এ নিয়ে বিস্তারিত আলাপ। যক্ষ্মা রোগ এদেশ থেকে প্রায় নির্মূল। কলেরা-বসন্ত প্রভৃতি মারাত্মক রোগও দূরীভূত। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে মৃত্যুর হার আধাআধি হ্রাস আর দেড়শো বছরে গড়পড়তা পরমায়ু প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি। সত্তর বছর পর্যন্ত নিরোগ দেহ নিয়ে বেঁচে থাকার আশা এখন প্রায় সব আমেরিকানেরই মনে মনে। সত্যি এ এক বিরাট সাফল্য।

আমাদের দেশেও মৃত্যু সংখ্যা হ্রাসের কথা শুনি। কিন্তু জীবন্মৃতের সংখ্যা যে অসংখ্য! তা থেকে আমাদের কবে নিষ্কৃতি তাই ভাবনা।

এ বিষয় সে বিষয় নিয়ে আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা। হঠাৎ মিঃ হোসেনের বিদায় উদ্যোগ। একটায় তাঁর কাছে কোন্ ছাত্র-বন্ধুর আসার কথা। তাঁর ঘরেও গল্পাহারের আয়োজন। এখন একটা বেজে পাঁচ। তাই তাঁর ছুটে পালানো।

এবার খাবার পালা। বিদেশে স্বদেশী রান্না। জিভের উল্লাস। গন্ধে উজ্জ্বল মন। সামনে রকমারি দ্রব্যসম্ভার। ভোজনে পরম পরিতোষ। গল্প করাও যেন

অসাধ্য। মাঝে মাঝে হাসির চাটনী। নিরীহ মানুষ শাস্ত্রীজী। তাঁকে নিয়েই হাস্য-পরিহাস। ভেবেছিলাম, দই-এর সঙ্গেই খাওয়া পর্বের ইতি। কিন্তু তা হবার নয়। শ্রী গোয়েলের কঠোর রসিকতায় শুধু শাস্ত্রীজী নন, আমরাও ব্যতিব্যস্ত।

শাস্ত্রীজী, ফলগুলো এনে রাখলেন কোথায়? বার করুন।—বলা মাত্র শাস্ত্রীজী উধাও। কিছুক্ষণ বাদেই হাঁফাতে হাঁফাতে এসে হাজির। এক হাতে ঠোঙা ভর্তি ফল আর এক হাতে বিরাট এক খরমুজা। অবাক কাণ্ড। গোয়েলজী হেসে কুটপাট। তার সঙ্গে আমরাও।

এগুলো কে খাবে এখন?

বারে, খেতেই হবে।—শাস্ত্রীজী নাছোড়বান্দা। এজন্যে তাঁর কম মেহনৎ? তার ওপর আবার টাকার শোক। ফল কিনতে গিয়ে পাঁচ ডলারের একটি নোটের গরমিল। কী মুস্কিল!

শেষ পর্যন্ত আপোষে রফা। এক এক খণ্ড করে খরমুজা প্রত্যেকের পাতে পাতে।

জানেন সতেরো-আঠারো রকম খরমুজা পাওয়া যায় এদেশে?

কি করে জানবো? আপনার অভিজ্ঞতা থেকে অন্তত এটুকু জেনে নেওয়া গেলো।—আমার এ উত্তরে খুশি শাস্ত্রীজী।

খাওয়া শেষে মুখশুদ্ধি। ভারতীয় রীতি। সে রীতি এখানেও চালু। শ্রীমতী রাধালক্ষ্মীর পরিবেশন।

এ না হলে ভারতীয় নারী!—প্রশংসার প্রতিযোগিতা। এদিকে 'রূপোলী সুপুরী'র কৌটো প্রায় উজাড়।

গল্প আর গল্প। রবিবারের অলস বিকেল। বন্ধু বিদায়ে মিঃ হোসেনও এসে তিনটে নাগাদ আমাদের সংগী। খানিক বাদে আর একজন অতিথির আবির্ভাব। চায়ের আসর সরগরম। একটি নিবিড় আড্ডা।

কোলকাতার অবস্থা কি এখনো আগের মতোই নাকি? নিত্য হট্টগোল? —নতুন অতিথির প্রশ্ন। সে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বিরস। কোলকাতায় ছিলেন তিনি বছর সাত-আট। চল্লিশ থেকে আটচল্লিশ। তারপর করাচী হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাড়ি। সেখান থেকে উত্তর আমেরিকায় বছর কয়েক। নানা দেশের অভিজ্ঞতায় জ্ঞানসমৃদ্ধ মানুষ। তাঁর ঝুড়িতে অনেক রসালো

গল্প। কিছুক্ষণ ধরে তাই শুনি। ইনি পাকিস্তানী মুসলমান। গোয়েল আর শাস্ত্রীজীর সঙ্গে ভাব গভীর। বিদেশে পাক-ভারত বন্ধুত্ব। আমাদের দুদেশের সাধারণ মানুষ বিদেশে ভাই-ভাই।

এখন চলি। উঠে পড়ি আমি আর রাধালক্ষ্মী। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আর সবাই।

এখন হোটেলে ফিরবেন নিশ্চয়ই। চলুন না, আমার গাড়ি করেই পৌঁছে দিই।

না, না, তার আর কি দরকার? অশেষ ধন্যবাদ। এই তো কাছেই হোটেল। বেড়াতে বেড়াতে বেশ চলে যাবো।—শ্রীমতী রাধালক্ষ্মীর উত্তর। পাকিস্তানী বন্ধুর দাক্ষিণ্য প্রদর্শনে কৃতজ্ঞতা বোধ।

নমস্কার বিনিময়। বিদায়।

মোড় ঘুরে আমরা নতুন পথে। মিষ্টি অনুভবে জড়ানো পথ। বৈকালী ছায়া ছড়ানো পথ। আমরা মূক পথিক।

মংগলবার বোস্টন যাচ্ছি, জানেন তো?—হঠাৎ নীরবতা ভংগ।

হ্যাঁ, জানি বৈকি! তার জন্যেই হয় তো আজকের এই বিদায় সংবর্ধনার ব্যবস্থা।—আমার কথায় শ্রীমতী রাধালক্ষ্মী হাসি হাসি।

আপনি ছাড়ছেন কবে ওয়াশিংটন? বোস্টন যাবেন তো?—আবার প্রশ্ন।

প্রোগ্রাম আমার এখনো অজানা। তবে এটুকু জানি, রাজধানীতে আছি আরো দিন চারেক। এখান থেকে নিউইয়র্ক, তারপর বোস্টন।

বেশ, তাহলেই হলো। ভুলে যাবেন না তো? বোস্টনে গিয়েই হার্ভার্ড স্কুল অব পাব্লিক হেল্‌থ-এ আমায় খোঁজ করবেন একবার।

তা নয় করবো। কিন্তু খোঁজ করলেই যে আপনাকে পাওয়া যাবে তেমন কি কথা আছে?

নিশ্চয়ই দেখা হবে। আপনি ফিরছেন কবে দেশে? তার আগেই আপনার দেখা পেতে চাই। আপনার সঙ্গে বিশেষ একটা দরকার আছে।

কি আবার এমন বিশেষ দরকার?—একটু ভয়ে ভয়েই জিগ্যেস করি।

সামান্য কিছু জিনিস পাঠাবো আপনার সঙ্গে। আমার দাদা নিয়ে যাবেন আপনার কাছ থেকে।

কিছুই আপত্তি নেই। তবে ওভার ওয়েইট হবার ভয়।

না, সে ভয় নেই আপনার। আমি যে জিনিস দেবো ভাবছি, তা খুবই হালকা।—এই বলে আমার ডায়েরীটা চেয়ে নেন রাধালক্ষ্মী। তাতে লিখে দেন তাঁর বোস্টনের ঠিকানা।

কথায় কথায় আমরা দুটি রাস্তার এক মোড়ে। এখানেই শ্রীমতী রাধালক্ষ্মীর হোটেল। ওয়াই ডব্লিউ সি এ। পথের মোড় থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীমতী হোটেলে। আমি আমার পথে।

আপন কুলায় ফিরেই দেখি অরুণ অপেক্ষমান।

কি খবর, হঠাৎ তুমি ?

ছুটির দিন। আপনাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুবো ভাবছি।

এইতো বেড়িয়ে এলাম। বেরুবার আর ইচ্ছে নেই আজ।

তা আপনার যেমন ইচ্ছে। আমার আর একটি আরজি আছে।

সে আবার কি ?

কিছুই নয়। জানেন তো কালও ছুটির দিন ? লেবার ডে ? প্রতি বছর সেপ্টেম্বরের প্রথম সোমবার এদেশের 'শ্রমিক দিবস'। একটি সাধারণ উৎসবের দিন। অবশ্য আমার ছুটি নেই। বরং সোমবার আমার 'রেকর্ডিং ডে'। তবু উৎসবের দিনে আপনাকে উপলক্ষ করে একটি সান্ধ্যভোজের আয়োজন করার ইচ্ছে। আগে থেকেই কয়জন বন্ধুবান্ধবকে বলে রেখেছি। এখন আপনার মতের অপেক্ষা।

এমন প্রস্তাবে অমত করার তো কিছু নেই ভাই। তবে দাঁড়াও, দেখি আবার অন্য কোন এনগেজমেণ্ট আছে কিনা। না, কিছুই নেই দেখছি— ছুটি বলেই সারা দিনের সম্রাট আমি। অবাধ অধিকার যা ইচ্ছে তাই করে বেড়ানোর।—ডায়েরী দেখে নিয়ে অরুণের আমন্ত্রণ গ্রহণ।

হ্যাঁ, এই যে আপনার কাগজ। বিস্তারিত ভারতীয় সংবাদ পাবার জন্যে আপনি উদ্‌গ্রীব। তাই আপনার জন্যে নিয়ে এলাম এই অমৃতবাজারখানা। শুধু ভারতীয় নয়, আপনার নিজের খবরও পাবেন এতে।—বলেই পৃষ্ঠা উল্টে আমার খবরটি বার করে দেখায় অরুণ। আমার হাতে তুলে দেয় কাগজখানা।

কিন্তু সে খবর আমার আগেই দেখা। মনি ভাই-এর চিঠিতে পাওয়া। সে জন্যে বিশেষ বাহবা না পেয়ে অরুণ হয়তো মনঃক্ষুন্ন। কিন্তু কাগজখানার জন্যে তাকে অজস্র ধন্যবাদ। অন্তত এক সপ্তাহের মনের খোরাক একদিনের

একখানি অমৃতবাজার। পৃথিবীর আর এক প্রান্তে সত্যি যেন তার অমৃত স্বাদ!

আমার সঙ্গে কথা শেষ করে অরুণ উধাও। লাউঞ্জে বসে বসেই কাগজ পাঠ। রাজ্য সীমা কমিশনের রায় নিয়ে বম্বেতে তখনো উত্তেজনা। সে সংবাদে নিবিষ্ট মন।

আপনি বেরোন নি আজ?—চমক ভাঙে হঠাৎ প্রশ্নে। চোখ চেয়ে দেখি ডাঃ মুরিয়েল। সেই ফরাসী মেয়ে। ডাক্তার তরুণী। প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই আসন গ্রহণ পাশের কুশন চেয়ারে। সংগিনী তাঁর হাইতি বান্ধবী।

এইতো এলাম বাইরে থেকে। তাই আর বেরুবার ইচ্ছে নেই আজ।—আমার উত্তর।

তাই বুঝি কাগজ পড়ায় এমনি মত্ততা? কি পত্রিকা এখানা?

আমাদের দেশের কাগজ।

ভারতীয় খবরের কাগজ এতো সুন্দর?—ফরাসী দুহিতা একটু অবাক জেনে। কাগজখানা চেয়ে নিলেন আমার কাছ থেকে। উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলেন। হঠাৎ একটি প্রবন্ধে মনঃসংযোগ। পৃথিবীর তিনটি বৃহত্তম নগরীর তুলনা কথা। নিউইয়র্ক লণ্ডন-প্যারিস। প্রবন্ধ পাঠ শেষ। আমার দিকে চোখ। দৃষ্টিতে গভীর গাম্ভীর্য।

ফরাসী সাহিত্য-সংস্কৃতি সব চুলোয় গেলো, প্যারিসের নাইট ক্লাবটাই বুঝি বড়ো কথা?—ডাঃ মুরিয়েলের কণ্ঠে ক্ষোভ। কাগজখানা আমার হাতে দিয়ে তাঁর স্থানত্যাগ। সঙ্গে সঙ্গে হাইতি সংগিনীও তাঁর অনুবর্তিনী।

বিচিত্র ঘটনা। বিচিত্র মানুষের সেন্টিমেন্ট। মিস্ মুরিয়েলের দেশপ্রেমকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু কোথায়, এমন কি আপত্তির আছে প্রবন্ধটিতে? আমি অবাক! সত্যি বিচিত্র মেয়ে মিস্ মুরিয়েল! এর পর আর আলাপ হয়নি তাঁর সঙ্গে।

টেলিভিসনে এড সুলিভেন। দেশ-বিদেশের সংবাদ। নাচ-গান। বিজ্ঞাপন। তার খানিক দেখে ঘরে ফিরি। অফুরন্ত অবসরে অনেকগুলো চিঠি লেখার দায়মুক্তি।

গ্রীষ্মের শেষ উৎসব

পরের দিন। সেপ্টেম্বরের প্রথম সোমবার। আমেরিকায় গ্রীষ্মের শেষ উৎসব। ঋতুর শেষ মুখরতা। আজ জাতীয় শ্রমিক দিবস। মিটিং মিছিল বনভোজন। সারা দেশব্যাপী মাতামাতি। কাগজে কাগজে কতো আলোচনা কতো ছবি। পচাত্তর বছর আগে এই জাতীয় উৎসবের প্রবর্তনা। আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম স্রষ্টা পিটার জে ম্যাকগুইর এর প্রবর্তক। জাতির সেবায় দেশের যাবতীয় উৎপাদন। সেই উৎপাদকদের উদ্দেশ্যে জাতির অভিনন্দন এই দিনে। শ্রমিকদের সঙ্গে মিলে মিশে সমগ্র জাতির আনন্দ উল্লাস।

মে দিবস পালিত হয় না এদেশে? পয়লা মে তারিখে সারা দুনিয়ার মেহনতী মানুষকে এক করার আহ্বান ধ্বনিত হয় না আমেরিকায়?

না, সে দিন আমাদের দেশে অন্য আর এক জাতীয় উৎসব। সে দিন 'শিশু স্বাস্থ্য দিবস'। সাতাশ বছর ধরে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে পয়লা মে তারিখে এই শিশু দিবস। সমগ্র জাতি ভবিষ্যৎ নাগরিকদের যোগ্য করে গড়ে তোলার সংকল্প নেয় এই দিনে।—লবীতে বসে অপরিচিত এক মার্কিণ বন্ধুর মুখে এ দেশের শিশু দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা। তা শুনে সারা বুক জুড়ে কেমন একটা মোচড় অনুভব। হায় আমার দেশের হতভাগ্য শিশুর দল! অবশ্য আমার দেশেও একটি শিশু-দিবস নির্ধারিত হয়েছে সম্প্রতি। ১৪ই নভেম্বর সে তারিখ। কিন্তু সেই পবিত্র দিবসের কর্তব্য সম্বন্ধে আমরা সবাই প্রায় উদাসীন। আমাদের সরকার, আমাদের সমাজ, আমাদের পত্র-পত্রিকার তেমন যেন কিছু করণীয় নেই সেই দিনে।

ভদ্রলোক আমেরিকার 'চিলড্রেন চার্টার'-এর কথা শোনাচ্ছিলেন। প্রেসিডেণ্ট হুভারের সেই বিখ্যাত ঘোষণার কথা বলছিলেন। কিন্তু আমার মন তখন অনেক দূরে। আমার দেশের শিশুজগতে। বিশেষ করে উপেক্ষিত উদ্বাস্তু মানবকদের মধ্যে।

সারা সকালটা মেঘ মেঘ। বৃষ্টিও টিপ্ টিপ্। মেজাজ ভিজে ভিজে। খাওয়াটা দায়সারা। হোটেল শয্যায় দেহ সটান। গীতাঞ্জলিখানা আজ মনসংগী। তারই পাতায় পাতায় দিন গড়ায়।

বিকেলে আকাশ খুশি। সূর্য-কিরণ ছড়ানো দিক্ দিগন্ত। মনের আকাশেও আনন্দ-ঢেউ। বাইরের আকর্ষণে উতলা মন। তাই বেরুই।

লোকবিরল পথ। শূন্যপ্রায় শহর। পথে পথে কিছুক্ষণ ধরে পায়চারী। বৈকালী কাগজে প্রেসিডেণ্ট আইকের ঘোষণা। শ্রমিক দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী। তিনি বলছেন: আজ দেশের শ্রমিক শক্তির বিজয় উৎসব। জাতির উন্নতিবিধানে ঈশ্বরদত্ত এই শক্তি। শ্রমিক নরনারীর সংখ্যা আমেরিকায় আজ ছয় কোটি ষাট লক্ষ। তবু দেশ বেকারত্ব থেকে মুক্ত নয়। যতো দিন সে মুক্তি না আসছে ততোদিন আমাদের চেষ্টারও শেষ নেই।

কোটিপতি লক্ষপতির দেশ আমেরিকা। সেখানেও বেকার সমস্যা! বিস্ময়ের কথা নয়, বিতর্কেরও বিষয় নয়। প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ারের স্বীকৃতি। তবে বেকার হলেও নিরাশ্রয় ও অভুক্ত হয়ে থাকতে হয় না কাউকে এদেশে। প্রত্যেক বেকারের অন্তত ছমাসের জন্যে সে দায়দায়িত্ব সরকারের। ছ মাসেরও বেশি সময় বেকার থাকার দৃষ্টান্ত এদেশে বিরল।

ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যা সীমান্তে। ডু পণ্ট সার্কেল থেকে নিউহাম্পশায়ার অ্যাভিন্যু ধরে ট্যাক্সি-দৌড়। এ রাস্তায়ই অরুণের নতুন আবাস। সে গৃহ প্রবেশেরই উৎসব হয়তো। আমি হয়তো উপলক্ষ মাত্র।

সেলফ্ এলিভেটরে ছ তলায় উঠে ঘর খুঁজি। নাম-লাঞ্ছিত দরজায় আঙুল টোকা। একটি সলজ্জ তরুণীর হাস্যমধুর অভ্যর্থনা। অবাক বিস্ময়ে থমকে দাঁড়াই। ভুল করিনি তো? কিন্তু ভুল হবে কি করে? ভাবি।

আরে আসুন, আসুন!—অরুণ ছুটে আসে পাকশালা থেকে। কোমরে জড়ানো তোয়ালে। তার গায়ে হাত মুছতে মুছতে পরিচয় করিয়ে দেয় তার বান্ধবীর সঙ্গে। বান্ধবীর নাম অনুরাধা। বুঝলাম তারই দেওয়া এ নাম। আসল নাম নিয়ে লুকোচুরি। তা জানাতে দুজনেরই ওদের আপত্তি। 'নামে কি যায় আসে?' নাই-বা জানলাম সে নাম।

রান্নায় ব্যস্ত অরুণ। পাকশালায় ঢুকে দেখি তার কর্মোদ্যম। আমাদের রান্নাঘরের সঙ্গে এদেশের 'কিচেনে'র অনেক তফাৎ। কাজের সুবিধের জন্যে

সব রকমের পরিপাটি ব্যবস্থা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই রান্না বান্না। কতোটুকুইবা আর সময় দরকার তার জন্যে। গ্যাসের উনুনে চার চুল্লী। একই বারে চারকোর্স তৈরি। উনুনের সঙ্গেই সমান উঁচুতে বাসন মাজার 'সিংক'। সেখানেও গরম জল ও ঠাণ্ডা জল। গুঁড়ো সাবানে এলুমিনিয়াম ও কাঁচের বাসন ধোয়া সেখানে কতো সহজ। উনুনের আর এক পাশে বড়ো রেফ্রিজারেটর। খাবারের সব জিনিসপত্র তার মধ্যে। পোশাক-পরিচ্ছদ কাচার মেশিনও দেখেছিলাম নিডহ্যামদের রান্না ঘরে।

মুখ বুজে পাশের ঘরে সোয়েটার বুনে চলেছে অনুরাধা। আমিও এসে বসি সেই ঘরে। অরুণের ছোট এপার্টমেণ্টে শোয়া-বসার ঐ একখানি ঘর। আর একটি কুঠরীতে সব মালপত্র।

আমার হাতে আর্ণেষ্ট হেমিংওয়ের 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস'। তার কয়েক পাতা শেষ। দরজায় জোড়া জোড়া পদশব্দ। হঠাৎ স্তব্ধ। দোর খুলতেই, 'হ্যালো, হিয়ার ইজ অণুরাধা' বলে শ্রী চন্দর প্রবেশ। পিছন পিছন শ্রীমতী চন্দ। কোলে ফুটফুটে ছোট্ট শিশু। সেই ঘুমন্ত শিশুকে সবার আদর। সেই আদরেই তার ঘুম ভাঙে। ঘুম-কাতর চোখের তলায় মিষ্টি হাসির রেশ। পরক্ষণেই আবার সে যেমনি ঘুমে তেমনি।

আমরা কথায় মাতি। অনুরাধার হাতে কাগজ পেন্সিল? বাঃ, কী সুন্দর পেন্সিল স্কেচ! তার পাশে শোয়ানো ঘুমন্ত শিশুর অবিকল ছবি। অনুরাধা শুধু অতি শান্ত নয়, সত্যি গুণী। অরুণের পাশের বাড়ির প্রতিবেশিনী অনুরাধা।

এবার এলেন শ্রী বেহারী ও শ্রীমতী রাণী। ভয়েস অব আমেরিকার দুই কর্মী। মন দেয়া-নেয়ার পালা শেষে সমূহ মিলনের অপেক্ষায় এঁরা। এঁদের সঙ্গে আগেই পরিচয়। আজ দীর্ঘ আলাপ।

হাতে হাতে খাবার প্লেট। যে যেখানে বসে, সেখানেই খাওয়া। বাঙলা দেশের মশলার গন্ধে ঘর ভরপুর। সামান্য হলেও মুখে ঝাল ঝাল। অনুরাধার খাওয়া তাতেই মাটি। বেশি করে ফ্রুট স্যালাড খেয়ে বেচারার ক্ষুন্নিবৃত্তি।

তারপরেও অনেকক্ষণ ধরে নানা গল্প। অনুরাধাই একা নীরব। উল আর কাঁটা নিয়ে তার ব্যস্ততা। আমাদের বেরুতে বেরুতে রাত বারোটা। এক ক্যাবে চন্দ দম্পতি আর এক ক্যাবে আমি। স্মৃতির ইতিহাসে আর একটি দিনের অনুলিপি।

শ্রমিক উৎসবে গাড়ি চাপায় মৃত্যু চারশো পনেরো জনের। উৎসব-উল্লাসের এই ফল! সকাল বেলার কাগজ পড়ে চমকে উঠি। এ সংখ্যা নাকি খুব বেশি নয়। বরং কমতির দিকে। পুলিশ কর্তৃপক্ষের তাই কৃতিত্ব দাবী। গত বছর এ সংখ্যা ছিলো চারশো আটত্রিশ। তাহলে কমেছে বৈ-কি? তবে অন্যান্য দুর্ঘটনার হিসেব জড়িয়ে এ উৎসবের মোট মৃত্যু সংখ্যা পাঁচশো একাত্তর।

সে যাই হোক, আনন্দের দিনে এমনি মৃত্যু মর্মান্তিক! অপমৃত্যুর এই বিরাট অংক আমেরিকার অগ্রগতির পথে একটি প্রকাণ্ড প্রশ্নবোধক চিহ্ন।— তোমার অগ্রগামীতার এই পরিণতি?

জানার নেশা দেখার সখ

কোন্ সুদূরে সন্ধ্যা এখন কে জানে? এধারে নতুন উষায় নব-জীবন। আলোর পাখি ডানা ছড়িয়ে চারদিকে। নতুন আশা।

লাগাম লাগে কাজের ঘোড়ায়। তিন দিন ছুটির পর সে কী উন্মাদনা! কাজ-পাগল মানুষগুলোর আবার সকাল-সন্ধ্যা ছুটোছুটি।

আমারও আজ কাজের তাড়া। পকেটে মিঃ লিণ্ডের পাঠানো কর্মসূচী। দৃষ্টি হাঁটে তার পাতায় পাতায়। প্রথম মোলাকাৎ ব্যবস্থা মিঃ রবার্ট এণ্ডারসনের সঙ্গে। পররাষ্ট্র দপ্তরে ইণ্ডিয়ান ডেস্ক অফিসার তিনি। অফিস নতুন স্টেট ডিপার্টমেণ্ট ভবনে। সে বাড়ি আমার ভালোই চেনা। সেই টুয়েন্টি ফার্স্ট স্ট্রীট ও ভার্জিনিয়া অ্যাভিন্যুর (নর্থ ওয়েষ্ট) মোড়ের বাড়ি। কিন্তু কোথায় আবার তার দুহাজার দুশো দশ নম্বর ঘর? ভাবনার কথা। হঠাৎ মতলব। মিঃ কুকের কাছেই যাবো সরাসরি। রাজধানী ছাড়ার আগে দেখাও হয়ে যাবে তাঁর সঙ্গে।

ঠিক এগারোটায় এনগেজমেণ্ট। একটু আগেই উপস্থিত মিঃ কুকের ঘরে। কুক খুশি। নানা রকম জিজ্ঞাসাবাদ। জানাই তাঁকে সব কথা।

ও, মিঃ এণ্ডারসনের কাছে যাবেন আপনি। সে ঘরতো এখান থেকে অনেকটা দূর। মেন বিল্ডিং-এ। একটু বসুন। লোক দিয়ে দিই আপনার সঙ্গে।—এই বলে মিঃ কুক ডাকলেন তাঁর লেডী এ্যাসিষ্ট্যাণ্টকে। বল্লেন আমাকে সাহায্য করার কথা। তারপর আমায় অনুরোধ করলেন ফেরার পথে একবার দেখা করে যাবার জন্যে।

সংগিনীই যেন আমার চোখ। পথ দেখিয়ে পথ চলেন। কী বিরাট যে বাড়ি! পথ চলার যেন শেষ নেই। স্টেট ডিপার্টমেণ্টে এ নিয়ে আমার তিনবার আসা। হালচাল দেখে একটা ধারণা ক্রমেই আমার বদ্ধমূল। স্টেট ডিপার্টমেণ্টটাই যেন একটা পৃথক গভর্ণমেণ্ট!

এই যে মিঃ এণ্ডারসনের রুম।—এই বলে একটু হাসির রঙ্ ছড়িয়ে দিয়ে সংগিনী বিদায়।

পায়ে পায়ে প্রবেশ মিঃ এণ্ডারসনের ঘরে। হাত বাড়িয়ে হাতে হাত। সে হাতে বন্ধুত্বের উষ্ণতা। তারপর প্রশ্নের পর প্রশ্ন।

ওয়াশিংটনে কোন অসুবিধে হয়নিতো কোথাও? লাগছে কেমন এদেশ?—প্রথমে এমনি সব ভাসা ভাসা জিজ্ঞাসা। ক্রমে গভীরে।

ভারতীয় রাজনীতির অবস্থা কি এখন? আপনাদের সাধারণ নির্বাচন তো আসন্ন প্রায়। তার কি ফল দাঁড়াবে মনে করেন?

নির্বাচনে কংগ্রেসের জয় সুনিশ্চিত। তবে বামপন্থী জোটের ফলে কোথাও কোথাও হয়তো গত নির্বাচনের চেয়ে এবারে কিছুটা সুবিধেও হতে পারে কংগ্রেস বিরোধীদের।—আমার এ উত্তরের পর নির্বাচন প্রসংগ নিয়ে আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা। দেখলাম মিঃ এণ্ডারসন আমাদের নির্বাচনী তথ্য সম্বন্ধে রীতিমতো ওয়াকেফ্‌হাল। শতকরা কতোজন ভোটদাতা ভোট দিয়েছিলেন বিগত নির্বাচনে, কেন্দ্রে এবং কোন্‌ রাজ্যে কতো ভোট পেয়েছিলো কংগ্রেস ও কংগ্রেস বিরোধীরা, এ সবই দেখি তাঁর জানা। ভারত সম্বন্ধে সত্যি সত্যি বিশেষজ্ঞ। ইণ্ডিয়ান ডেস্ক অফিসার হবার যোগ্য ব্যক্তিই বটে।

দেয়ালে টাঙানো প্রকাণ্ড ভারত মানচিত্র। আলমারি ও বুক-শেল্‌ফ্‌-এ ভারত বিষয়ক পুঁথি-পত্র। ভারত নিয়ে কথাবার্তা। তাই একটু ভারত ভাবনানুভূতি।

আচ্ছা, ওয়াশিংটনে কি কি দেখলেন আপনি?—মিঃ এণ্ডারসনের প্রশ্নের জবাবে এক এক করে সব বলি। বাকি কদিনের নির্ধারিত কর্মসূচীর কথা জানাই।

আর কিছু জানতে বা দেখতে চান আপনি?—আবার প্রশ্ন।

জানা আর দেখার ইচ্ছের কি শেষ আছে? তবে আমেরিকার শ্রমিকদের অবস্থা নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে কথা বলতে পারলে খুশি হতাম।

বারে, সে কথা বলেন নি কেন আপনি মিঃ লিণ্ডেকে।—বলেই ফোন তোলেন মিঃ এণ্ডারসন। ফোনে মিঃ লিণ্ডেকে অনুরোধ। মিঃ ওয়ালটার রুথারের সঙ্গে অবিলম্বে আমার একটা এপয়েন্টমেন্ট করার কথা পাকাপাকি। সম্ভব হলে আরো কয়েকজনের সঙ্গে।

আমেরিকার সেরা ট্রেড ইউনিয়ন নেতা মিঃ ওয়ালটার রুথার। আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন। দক্ষিণপূর্ব এশিয়া সফরে এসেছিলেন তিনি গত

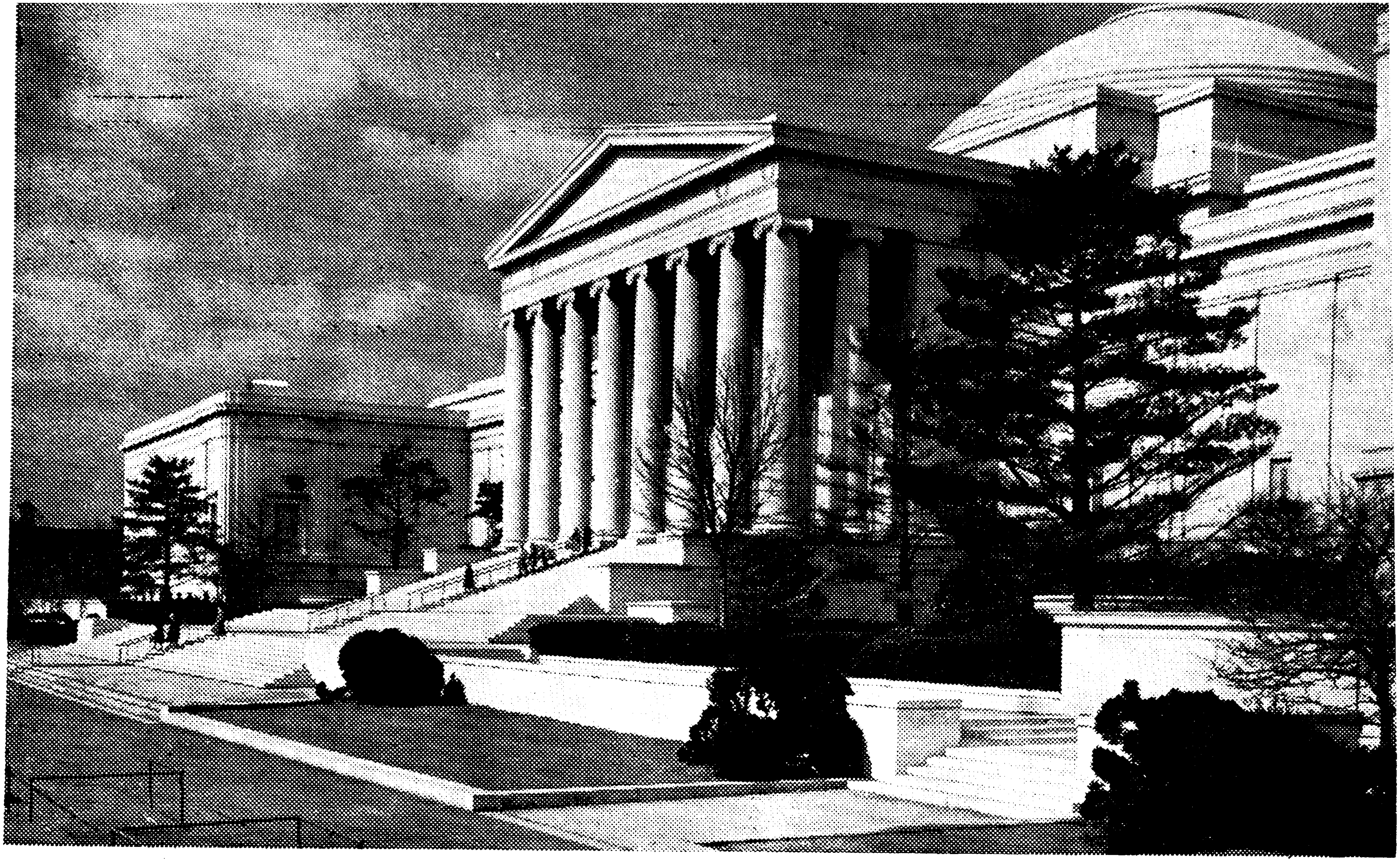

ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি, ওয়াশিংটন ডি. সি.

নির্দিষ্ট সময়ের আগেই আসি দূতাবাসে। তাই ভালো। চেনা মুখ-গুলোকে নতুন করে চেনার সুযোগ। রাজধানী ছাড়ার আগে অনেকের সঙ্গে আর একবার করে আলাপসালাপ। মনের কথা ছড়িয়ে দিই মনে মনে। কথায় কথায় রাখীবন্ধন।

শ্রী মেহতার সঙ্গে দেখা হতেই কোলকাতার বন্ধুজনদের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা। আমার কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা। চা চুমুকের ফাঁকে ফাঁকে দেশের নানা কথা। এ যেন দুজন খুব কাছের মানুষের কথাবার্তা। কিন্তু শ্রী মেহতা খুব ক্লান্ত যেন।

কাল আসুন না আর একবার একটু বেশি সময় নিয়ে। এই বলেই রাষ্ট্রদূত ডাকলেন তাঁর সেক্রেটারীকে। পরদিন অন্তত ঘণ্টাখানেক সময় পাওয়া যায় কখন, জিগ্যেস করলেন সেক্রেটারী আসার সঙ্গে সঙ্গে।

বেলা চারটে থেকে বেশ খানিকক্ষণ ফাঁকা। —জানালেন মিস্ ক্যাম্বেল।

কিন্তু সে যে আমার আবার ট্রেড ইউনিয়ন নেতা মিঃ ভিক্টর রুথারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময়। তাই এখানে আসার সময় ঠিক করা হলো সাড়ে পাঁচটায়।

পাটনার 'ইণ্ডিয়ান নেশান' পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ শচীন সেনও এসেছেন আজ। —জানলাম শ্রী মেহতাকে। এখান থেকেই যাচ্ছি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, তাও জানলাম।

ডাঃ সেনকেও তাহলে নিয়ে আসবেন কাল। আমার সাদর আমন্ত্রণ জানাবেন তাঁকে। —আন্তরিকতার নিবিড় স্পর্শ শ্রী মেহতার কথায়। সামান্য একটু চুপ করে কি যেন স্মরণ করার চেষ্টা। স্মৃতির গহনে ডাঃ সেনকে অনুসন্ধান বোধ হয়।

বাইরে তখন রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎপ্রার্থী আর একটি দল অপেক্ষমান। আমার দূতাবাস ত্যাগ।

খুঁজে খুঁজে ডাঃ সেনের হোটেলে আসি। তখন প্রায় সন্ধ্যা। তখনো ডাঃ সেনের শয্যা-বিশ্রাম। ক্লান্তি অপনোদনের প্রয়াস। এ হোটেলে একটা খুব সুবিধে। খাওয়ার জন্যে বাইরে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। সঙ্গেই রেঁস্তোরা।

দুজন একসঙ্গে না আসতে পারায় ডাঃ সেনের আপশোষ। আমারও তাই। রাষ্ট্রদূতের আমন্ত্রণের সংবাদ জ্ঞাপন। আমিই নিয়ে যাবো তাঁকে হোটেল থেকে, তাই পাকা ব্যবস্থা। আজকের মতো কর্মসূচী আমার এখানেই শেষ।

ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারিতে

সেপ্টেম্বরের পাঁচ তারিখ। বুধবার। আজকের সকাল আমার হাতে। আজ ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি দেখার কথা। সে ব্যবস্থা আগে থেকেই পাকা। আমেরিকার শ্রেষ্ঠতম শিল্পতীর্থ এই আর্ট গ্যালারি। সকাল সাড়ে নটার মধ্যেই সেখানে আসি। কন্সটিটিউশন অ্যাভিন্যুর ওপর ফোর্থ ও সেভেন্থ স্ট্রীটের মাঝামাঝি এলাকায় এ শিল্প-মন্দিরের অবস্থান।

সামনে চোখ জুড়োনো সবুজে মোড়া লন। তা পেরিয়ে এসে গ্যালারি ভবনের দিকে চেয়ে থাকি খানিকক্ষণ। নিও ক্লাসিক স্টাইলে তৈরি বিরাট বাড়ি। একটু দূর থেকে মনে হয় শ্বেতশুভ্র তার বহিরংগরূপ। আসলে তারই ওপর একটু গোলাপী আভা। সেই বহিরংগরূপেই মুগ্ধপ্রাণ। তার অন্তরংগতায় কেমন লাগবে জানি।

ভাবস্নিগ্ধ মন। সে মন নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে করিন্থিয়ান স্তম্ভরাজির দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টি। মনের ওপর গ্রীক স্থাপত্যের গাম্ভীর্য-প্রভাব।

প্রবেশ মূল্যের বালাই নেই। প্রবেশদ্বারে সঙ্গের জিনিসপত্র রেখে যাবার ব্যবস্থা। একতলাতেই অফিস। পুঁথি-পত্র, ফটো-পোস্টকার্ড ইত্যাদি বেচাকেনা।

লাইব্রেরীও একতলায়। পৃথিবীর শিল্প-সাহিত্যের বিরাট সংগ্রহ। পড়ার জন্যে পূর্ব অনুমতি প্রয়োজন। একপাশে লেকচার হল। আর্টের তত্ত্ব-বিচারে বিদগ্ধজনের বক্তৃতার ব্যবস্থা।

অফিস থেকে একখানি পরিচয়-পুস্তিকা ক্রয়। তা নিয়ে ঘুরে ঘুরে এবার ছবি দেখা শুরু।

কিন্তু এর কতোটুকু আর দেখা সম্ভব এক বেলায়। বইয়ের বিবরণ পড়েই চক্ষুস্থির। মাত্র পনেরো বছর এই শিল্প-মন্দিরের বয়সকাল। সরকারীভাবে এর উদ্বোধন ১৯৪১-এর মার্চ মাসে। এরই মধ্যে কী বিপুল এর সংগ্রহ। এ বাড়ি তৈরির খরচের অংকও অভাবনীয়। শুধু গৃহ নির্মাণের ব্যয়ই দেড়

কোটি ডলার। টাকার হিসেবে প্রায় সাড়ে সাত কোটি। হবে না? পাঁচ লক্ষ স্কোয়ার ফুট জুড়ে এই শিল্পপীঠ। দাতা স্বর্গত এণ্ডরু ডব্লু মেলন। কতো সঞ্চয় করলে একজনের পক্ষে এতো দান সম্ভব!

ঘরে ঘরে দেশ-বিদেশের শিল্পসম্ভার। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইয়োরোপ-আমেরিকার প্রধান প্রধান প্রায় সমস্ত নতুন-পুরাতন সেরা সেরা সব শিল্প-নিদর্শন। সংখ্যায় প্রায় সাতাশ হাজার। প্রাক্তন অর্থসচিব মিঃ এণ্ডরু মেলনের সংগৃহীত সব দানের ছবি ও মূর্তি নিয়েই প্রদর্শনীর প্রথম আরম্ভ। তখন মোট ছবি ১২৬ খানা আর মোট ভাস্কর্য-শিল্প ছাব্বিশ। তারপর থেকে প্রতি বছরেই সংগ্রহ বৃদ্ধি। আজ মোট নব্বইটি গ্যালারিতেও যেন স্থান অকুলান।

মিঃ মেলনের পরেই মিঃ স্যামুয়েল হেনরি ক্রেসের দান উল্লেখ্য। সংখ্যায় অবশ্য তাঁর দানই বেশি। তাঁর দেওয়া ইতালীয় চিত্রসম্ভারের তুলনা নেই। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী তাঁর প্রতিনিধিমূলক চিত্রসংগ্রহের কাল-পরিধি। ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারিতে তাঁর প্রথমবারের দান পৌনে-চারশো ছবি আর আঠারোটি মূর্তি। এসবের অধিকাংশই ইতালীয়। শিল্পকলা সংগ্রহে ক্রেসের অদম্য উৎসাহ। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ থেকেও বাছাই বাছাই চিত্রাদি ক্রয়। একাজে অকাতরে লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয়। ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি ছাড়াও আমেরিকার অন্যান্য কয়েকটি আর্ট মিউজিয়ম হেনরি ক্রেসের দানে সমৃদ্ধ।

বিচিত্র মানুষ এই হেনরি ক্রেস। তাঁর গল্প শুনে আমি অবাক। ব্যবসায়ীর ছেলে আরো বড়ো ব্যবসায়ী। আমেরিকার নানা রাজ্যে নানা শহরে তাঁর ড্রাগ স্টোর ও ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর। কিন্তু তাঁর প্রকৃত খ্যাতি মূলত নয় তার জন্যে। শিল্পকলার প্রতি তাঁর অতুলনীয় আকর্ষণ। দেশের জনগণকে শিল্পমুখী করে তোলায় তাঁর আন্তরিক আগ্রহ। তারই প্রমাণ তাঁর অজস্র দানে। অথচ কোন আর্ট গ্যালারির ছায়াও নাকি তিনি মাড়াননি ৬০ বছর বয়েসের আগে। এ শুনে আমি তো হতভম্ব। ঠিক এক বছর আগে ৯২ বছরে তাঁর মৃত্যু। তার কয়মাস আগে ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারিতে তাঁর শেষ দান। চিরবিদায়ের প্রাক্কালে জাতীয় চিত্রশালার পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দিবসকে সানন্দ স্মরণ।

একজন আমেরিকান অধ্যাপকের মুখে ক্রেসের নানা গল্প। তা শুনি আর ঘুরি নিচতলায়। নিচতলার গ্যালারিতে ডেকোরেটিভ আর্টের সংগ্রহ। তার সঙ্গে কিছু কিছু প্রিণ্ট আর ড্রইং। নতুন নতুন ছবি রাখারও ব্যবস্থা এখানে। তা ছাড়া অস্থায়ী বিশেষ প্রদর্শনীর জন্যেও কিছু স্থান এখানকার সংরক্ষিত।

মূল প্রদর্শনী দোতলায়। অধিকাংশ গ্যালারিই এখানে ছোট ছোট। স্বাভাবিক আলোর প্রাচুর্য ঘরে ঘরে। অনেক ঘরে আবার বিশেষ আলোর ব্যবস্থা। কোন কোন ঘরে স্বল্প আলো। বিষয় অনুযায়ী পটভূমিকা ও প্যানেল।

প্রথম সাঁইত্রিশটি গ্যালারি জুড়ে ইতালীয় শিল্প-নিদর্শনের সমারোহ। ইতালীয় শিল্প-রীতির ধারাবাহিক ক্রম-বিকাশ। তার প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সন্ধান এখানে। ধর্মীয় বিষয়বস্তু প্রাচীন ইতালীয় শিল্পের উপজীব্য। উজ্জ্বল রঙে আঁকা ছবিগুলো গ্যালারির প্রায়ান্ধকার পরিবেশে জ্বল জ্বল। জোত্তোর 'ম্যাডোনা ও শিশু' ছবিটির চিরন্তন আকর্ষণ। মাতৃ-হৃদয়ের কী অপূর্ব ভাব-ব্যঞ্জনা! ব্রাউনিং-এর কবিতার শিল্পী-নায়ক ফ্রা ফিলিপ্পো লিপ্পি। এই যে এখানে তাঁর অনবদ্য শিল্পকর্মের কয়েকটি অবদান। সেণ্ট প্লাসিডাসের উদ্ধারের জন্যে সেণ্ট মরাসের প্রতি সেণ্ট বেনেডিক্টের আদেশ। লিপ্পির একটি প্যানেল জুড়ে সে কাহিনীর শিল্প-বর্ণনা। ফ্রা এ্যাঞ্জেলিকো, বত্তিচেল্লী, রাফায়েল প্রভৃতি শিল্পগুরুদের কারুকর্ম দেখে কোন্ অতীতে মন উধাও।

বারট্রাণ্ড রাসেল কোথায় একবার বলেছিলেন, 'সংসারের জ্বালা এড়াবার প্রধান উপায় হলো নিজের মনের ভিতর আপনার মতো করে একটি পৃথিবী সৃষ্টি করে নেওয়া এবং বিপদকালে তার মধ্যে ডুবে থাকা।' শিল্পীদের বেলা রাসেলের একথা বোধহয় সব চেয়ে বেশি প্রযোজ্য। তবে শুধু বিপদকালে নয়, যে শিল্পী যতো বেশি তাঁর আপন পৃথিবীতে ডুবে থাকতে পারেন তিনিই বোধহয় ততো সার্থক।

আটত্রিশ নম্বর গ্যালারিতে ইতালীয় ভাস্কর্যসম্ভার। সেখান থেকে যাই ফ্লেমিশ ও জার্মান চিত্রঘরে। ইতালীয় শিল্পীদের সঙ্গে এঁদের ভাবের অনেকখানি একাত্মতা। এখানেও ধর্মীয় বিষয়ের প্রাধান্য। তবে অংকনরীতির পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। একখানি জার্মান চিত্রের দিকে প্রায় সব দৃষ্টি। শিল্পী

ম্যাথিয়াস গ্রুণওয়াল্ড। ছবির নাম 'দি স্মল ক্রুসিফিকশন'। নাম থেকেই চিত্র-পরিচয়। ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারির পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ইউরোপের নানা দেশের দেড়শো অমূল্য চিত্র হেনরি ক্রেসের শেষ দান। এ ছবি তারই অন্যতম। আমেরিকায় সংগৃহীত জার্মান চিত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলে স্বীকৃত।

আর সব ক্ষেত্রের মতো শিল্পেও ফ্রান্সের অনুকরণ। এই ছিলো রেওয়াজ এক কালের। কলাচর্চায় পরবশ্যতা। তা থেকে জার্মানীর মুক্তি-প্রয়াস বিশ শতকের প্রথমার্ধে। শিল্পকলায় তার তীব্র জাতীয়তাবোধের প্রতিফলন। উইলি বমিস্টার, ফ্রিজ উইণ্টার প্রভৃতি সেই শিল্প-মুক্তি আন্দোলনে অগ্রণী। তাঁদের ছবিও আছে নাকি জার্মান চিত্রসংগ্রহে? কই, চোখে পড়লো না তো!

এরপর ডাচ-শিল্পের চারটি গ্যালারি। তার মধ্যে দুটি ঘরে শিল্পী রেমব্রাণ্ডের একক প্রদর্শনী। শ্রেষ্ঠ ডাচ চিত্রশিল্পী রেমব্রাণ্ড। তিনি বিশ্ব-বিখ্যাত। রুবেন ও ভ্যান ডিকের শিল্পরীতির সঙ্গে তাঁর অনেক পার্থক্য। অধিকাংশ ডাচ চিত্রীরা বাস্তববাদী। দৈনন্দিন জীবনের অবিকল প্রতিচ্ছবি যেন তাঁদের এক একটি চিত্র। রেমব্রাণ্ডের প্রথম জীবনের ছবিতেও তার ছাপ। তাতে যেমনি বিস্তারিত বর্ণনা, তেমনি রঙ ঝিল্‌মিল্‌। তারপরে মধ্য বয়েস। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি। তাঁর তখনকার চিত্রকলার অন্য চেহারা। মানব-চরিত্র ও পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশ শুরু তখন থেকে। উজ্জ্বল সোনালী রঙে আঁকা 'লুক্রেশিয়া' ও 'লেডী উইথ এ ফ্যান' তাঁর দুখানা অতি বিখ্যাত ছবি। ভাবের গভীরতায় সুসমৃদ্ধ। তাঁর পরিণত বয়সের পরিমার্জিত কলা-কুশলতার পরিচয় এমনি কয়খানি অপূর্ব চিত্রে। রেমব্রাণ্ডের শিল্পবোধ বিকাশের ধারাবাহিকতা দেখে ভারি তৃপ্তি।

অষ্টাদশ শতকের বৃটিশ শিল্পকলার প্রধান বৈশিষ্ট্য পোর্ট্রেট পেন্টিং। চারখানি গ্যালারি ভর্তি তার পরিচয়। অধিকাংশ প্রতিকৃতি চিত্র হলেও কিছু নিসর্গ চিত্রের সমাবেশও বৃটিশ গ্যালারিতে। তার মধ্যে রেনল্ডস আর টার্ণারের কয়েকখানি ল্যাণ্ডস্কেপ চোখ টানে।

এখানেই আর্জেন্টিনার এক শিল্পী দম্পতির সঙ্গে আলাপ। শিল্পীর চোখে শিল্প বিচার। সে আলাদা ব্যাপার। ছবির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নিয়ে ওদের

দুজনের মধ্যে আলোচনা। আমার কানেও তার ছিটে ফোঁটা। পিকাসোর একটি কথা মনে পড়ে। কোথায় যেন পড়েছিলাম। পাখির গান শুনতে ভালো। তাই যথেষ্ট। কেন ভালো কতোটা ভালো সে সমালোচনা অবান্তর। ছবির বেলায়ও তাই। কথাটা ভাবার মতো। বাস্তবিকই সমালোচকদের ভাগ্যে পূর্ণ আনন্দভোগ বোধহয় দুরূহ।

এর পরই মার্কিণ চিত্রকলার সমাবেশ। চিত্রকলার বিভিন্ন ধারার মিলনক্ষেত্র যেন আমেরিকা। ইম্প্রেসনিজম, পোস্ট ইম্প্রেসনিজম, রিয়েলিজম, সুররিয়েলিজম, কিউবিজম, ফবিজম, এক্সপ্রেসনিজম, এ্যাবষ্ট্রাক্টিজম প্রভৃতি সবকটি ধারারই কিছু কিছু পরিচয় মার্কিণ শিল্পীদের বিভিন্ন ছবির মধ্যে। ইয়োরোপীয় প্রভাবের সঙ্গে স্বকীয় শিল্পবোধের যুগ্ম প্রকাশ অনেক ক্ষেত্রে।

স্টুয়ার্টের আঁকা খুব বড়ো একখানা ছবি। নাম তার 'স্কেটার'। ছবিখানার দিকে অনেক দৃষ্টি। আর এক বিখ্যাত চিত্রশিল্পী হুইসলার। তাঁরই এক অতি খ্যাত ছবি 'হোয়াইট গার্ল'। এখানেও এসে থমকে দাঁড়ায় সব দর্শক। রঙ-তুলির খেলায় সার্জেন্ট বেলোজ আর রাইডারেরও খুব খ্যাতি। তাঁদেরও ছবি এইখানে। মার্কিণ গ্যালারিতেও অনেক পোর্ট্রেট। তার মধ্যে প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটনের প্রতিকৃতি যেন সত্যি সজীব। শিল্পী স্টুয়ার্টের এ কৃতিত্ব।

এখান থেকে গিয়ে পড়ি ইষ্ট গার্ডেন কোর্টে। তার দক্ষিণে কয়টি গ্যালারি জুড়ে ফরাসী শিল্পের একটি সুন্দর প্রদর্শনী। শিল্পীলোক ফ্রান্স। একালের শিল্পী সংখ্যা সেদেশে নাকি ষাট থেকে সত্তর হাজার। তাঁদেরই অতি খ্যাত কয়েকজন এখানে। বিশেষ করে মাতিস, পিকাসো। এঁদের অনেক ছবি। বিশ্ব-পরিচিত এঁরা। পরিচয়ে আধুনিক হলেও জন্ম এঁদের দুজনেরই উনিশ শতকের শেষভাগে। ১৮৬৯-এ মাতিস আর ১৮৮১-তে পিকাসোর জন্ম। পাবলো পিকাসোর জন্ম অবশ্য স্পেনে। উনিশ বছর বয়সে প্যারিসে আগমন। আর এক শিল্পী বন্ধুর সহযোগিতায় কিউবিজমের গোড়া পত্তন। আর সেই থেকে তাঁর চিত্রকলা নিয়ে আলোড়ন। তাঁর প্রভাব আজ শিল্প জগতের যত্রতত্র।

মাতিস-পিকাসো এবং তাঁদের পরবর্তী আধুনিকদের শিল্পকর্ম দেখা শেষ। সেখান থেকে চলে আসি ফরাসী শিল্পের প্রধান গ্যালারিগুলোতে।

শেষ গ্যালারি কয়টি সত্যি বৈচিত্র্যময়। উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী শিল্পের সমাবেশ এখানে। ইম্প্রেসনিষ্ট ও ইম্প্রেসনিজম পরবর্তী যুগের শিল্পীদের আঁকা বিখ্যাত চিত্রাবলী। ফরাসী শিল্পের সে এক যুগ-সন্ধিকাল। প্রাচীনের বেড়াজাল ভেঙে নবীনের আত্ম-প্রতিষ্ঠা। মনেঁ, মানেঁ প্রভৃতি সে বিপ্লবের মন্ত্রদাতা। রেখার প্রয়োজন অস্বীকার। নিমেষের দেখায় প্রকৃতির যে ভাব বা ইম্প্রেসন চোখে পড়ে তারই চিত্রাংকন। প্রকৃতির নিজস্ব রঙের স্বীকৃতি। নতুন নেশা, নতুন স্বপ্ন। তাকেই ফুটিয়ে তুললেন দেগাঁ, রেনোয়ার, গগ্যাঁ, সেজান, ভ্যান গগ, তুলো-লোত্রে এবং আরো অনেকে।

সে সব ছবি দেখে দেখে আমি যেন মোহমুগ্ধ। একে একে পেরিয়ে যাই ঘরগুলি। কুর্বে, পিসারো ও সেজানের অপূর্ব রচনা-সম্ভার। মানেঁর আঁকা 'বৃদ্ধ স্বরশিল্পী' মানবীয় আবেদনে সংবেদনশীল। রেনোয়ারের হাতে স্নানান্তে কবরী বন্ধনরতা সুন্দরীর ছবিখানি প্রাণোচ্ছল।

শেষের গ্যালারিতে শিল্পাচার্য কোরো'র একটি অতুলনীয় পোর্ট্রেট। ঠিক যেন ফ্রেমে গাঁথা একটি জীবন্ত নারীমূর্তি।

ফরাসী শিল্পের প্রতি আমেরিকার গভীর আকর্ষণ। হয়তো সব দেশেরই। তবে মার্কিণ শিল্পকলায় ফরাসী প্রভাব অত্যন্ত বেশি। হবারই কথা। মার্কিণ চিত্রীর চর্চাকালের অন্তত কিছুটা সময় শিল্পস্বর্গ প্যারিসে অতিক্রান্ত। তাঁদের কেউবা মাতিস-শিষ্য কেউবা গগ্যাঁর। এমনি সব। তাইতো আমেরিকার ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারিতে ফ্রান্সের ছবির ছড়াছড়ি।

কিন্তু এর মধ্যে ভারত কোথায়? আমাদের ভারতবর্ষ? এই বিপুল বিশ্ব-চিত্র গ্যালারির এক কোণেও কি ভারতীয় শিল্পকলার স্থান হতে পারতো না একটু? মনে জিজ্ঞাসা। তাই ভাবতে ভাবতে বাইরে আসি।

বিচিত্র জায়গা এই আর্ট গ্যালারি। রঙে আর তুলিতে বিচিত্র শিল্পের জগৎ। আমার চোখে স্বপ্নাবেশ। ধীরে ধীরে নেমে আসি আবার নিচে।

নেমে এসে আবার সেই আর্জেন্টিন দম্পতির সম্মুখে।

আপনি কি এখানেই খাবেন?—আর্জেন্টিন ভদ্রলোকের জিজ্ঞাসা।

না, দুঃখিত। আপনাদের সঙ্গে এক সঙ্গে বসে খেতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু আমার এক সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে আজ লাঞ্চ-এ মিলিত হবার কথা।—বলে বিদায়।

ওঁরাও সঙ্গে সঙ্গে ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারির কাফেটেরিয়ায়। সরকার পরিচালিত এই কাফেটেরিয়া। ভারি সুন্দর ব্যবস্থা। দূরাগত দর্শকদের পক্ষে বিশেষ সুবিধে। গোটা দিন সারা অন্তরকে ছড়িয়ে দিয়ে শিল্পলোকে বিচরণ। তাই প্রয়োজন।

কিন্তু আমার বেলায় তা অসম্ভব। পূর্ব নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম সে পথে বাধা।

মার্কিণ রাষ্ট্রের ভারত-চিন্তা

ঘড়ির কাঁটা প্রায় একটা ধরো ধরো। আমার কি দোষ? আর্ট গ্যালারির ঘরে ঘরে অজস্র মানুষের সুখ-দুঃখ। আনন্দ-কান্নার ছড়াছড়ি। ছবি আর ছবি। মহৎ শিল্পের বিচিত্র সম্ভার। মন বলছিলো, আরো আরো। চোখ বলছিলো, মরি মরি! সেই অনুভবের চূড়োয় দাঁড়িয়ে হঠাৎ খেয়াল। তাই রক্ষে।

ক্যাব নিয়েই দে-দৌড় ছুট্। কিন্তু মন তবু সেই পিছনে পড়ে। সেই চিত্রলোকের বিচিত্র কথায়। সেই রাফায়েল থেকে শুরু করে পিকাসো-গঁগ্যার বলা কথায়। নানা রঙে নানা ঢঙের আঁকিবুঁকি। তারই ছায়া তারই মায়া চোখের তারায়।

বিস্তীর্ণ এ জীবন। গভীর তার পটভূমি। গভীরতর অনুভব। হোক অজস্র খণ্ডচিত্র। ভাগে ভাগে ভগ্নাংশ। তবুও একই তো সব মানুষ। একই অনুভূতি। গড়িয়ে পড়া চোখের জল। ছড়িয়ে পড়া হাসির কণা। সর্বত্র এক। পার্থক্য আছে, বৈচিত্র্য আছে। বৈচিত্র্যের বিশাল পটভূমিতে ঐক্যের অনিন্দ্য বনিয়াদ। আকাশের বৃষ্টিধারা। সমুদ্রের অথৈ জল। আলাদা। কিন্তু আসলে এক। এই একইতো পূর্ণ। সেই পূর্ণতার ক্ষণিক স্পর্শ। সে জাদুস্পর্শে কুলকিনারাহীন ভাবরাজ্যে তোলপাড়। অসীম আনন্দ। ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি দর্শনে অমূল্য লাভ।

গাড়ি হোটেল দরজায়। একটা বেজে কয়েক মিনিট। কী লজ্জার কথা! মিঃ সেলিগ এস হ্যারিসন আমায় না পেয়ে যদি ফিরে গিয়ে থাকেন!

না, এইতো তিনি। আমার জন্যে অপেক্ষমান মিঃ হ্যারিসন। সঙ্গে তাঁর বন্ধু মিঃ রিচার্ড লিওনার্ড পার্ক। ক্যালিফোর্ণিয়া ইউনিভার্সিটির পলিটিক্যাল সায়েন্স-এর অধ্যাপক তিনি। বার্কলেতে পড়ান তিনি। এরই ঠিকানা দিয়েছেন বোধহয় বন্ধুবর শ্রী শিবনারায়ণ রায়। হঠাৎ মনে পড়ে।

মিঃ শিবনারায়ণ রায়কে চেনেন আপনি?

খুব ভালো করে চিনি। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু শিবনারায়ণ। কোলকাতায় তাঁর বাড়িতেও গেছি আমি।—আমার জিজ্ঞাসায় অধ্যাপক পার্কের উত্তর। সে উত্তরে একেবারে পাইকপাড়ার কথা উল্লেখ। আমরা প্রতিবেশি জেনে তিনি খুশি। শিববাবুও শীগ্‌গির আমেরিকায় আসছেন বলায় তাঁর আরো আনন্দ। কংগ্রেস নেতা শ্রী স্বরেন্দ্রমোহন ঘোষের কথাও বিশেষ করে জিগ্যেস করলেন পার্ক। আরো কয়েকজনের কথা। গাড়িতে বসে বসে এসব আলোচনা।

দয়া করে পড়বেন এই রচনাটি। আমার লেখা। মতামত পেলে খুশি হবো।—মিঃ হ্যারিসন একখানি পুস্তিকা তুলে দেন আমার হাতে। আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ। তার সঙ্গে সঙ্গে মতামত দেবার আশ্বাস।

বইখানির ওপর চোখ বুলোই। 'চ্যালেঞ্জ টু ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজম'। মার্কিণ ত্রৈমাসিক পত্র 'ফরেন এ্যাফেয়ার্স' থেকে পুনর্মুদ্রিত প্রবন্ধ। প্রবন্ধের নামে বইয়ের নাম। পাতার পর পাতা ওল্টাই। দৃষ্টি ছড়াই ওপর ওপর। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পরিপন্থী ভারতের ভাষা-বিরোধ। তারই একটি স্বন্দর বিশ্লেষণ। সে বিরোধে কম্যুনিষ্ট পার্টির ইন্ধন জোগানোর সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত নিয়েও আলোচনা। শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন :

Will India develop as a strong Centrally-directed political whole, or will she, under the stresses of regionalism, become a congeries of loosely federated states ?

এ প্রশ্নের উত্তরে লেখক বলছেন :

The answer is inextricably linked, of course, with the shape that Indian leaders give to their political institutions in the coming decades......Since Independence Nehru's Congress Party has maintained its power in all states, but in time a divergence could easily develop between a state party in power and the ruling national party. The Central Government will then have to decide whether firm action will relieve or aggravate the resulting crisis, and whether the firm action that may be needed is possible under the present Constitution. There

are dangers both in bold action and in trusting to the ultimate good sense of regional leadership.

The impatience with the slow pace of economic progress, hampered as it is by regional bickering, pushes Indian leaders in the direction of a stronger and stronger central authority. For no matter how valiantly Indian nationalists press forward with integrating programs on all fronts, the central authority remains caught in a vicious circle in which national progress requires unity and unity demands rapid development.

নিউ রিপাব্লিক সাপ্তাহিক পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক মিঃ হ্যারিসন। সাংবাদিকের সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় এ প্রবন্ধ-পুস্তিকায়। ভারতীয় রাজনীতির গভীরে প্রবেশ। লেখার মালমশলা সংগ্রহে কী আন্তরিক নিষ্ঠা! নিরপেক্ষ বিচার। উপসংহারে আশাবাদ :

It is more likely that a political formula will evolve by which national unity can be consolidated. এ আশার জন্যে লেখককে ধন্যবাদ।

কিন্তু একি, আমরা যে এক রেঁস্তোরা দরজায়! ভেবেছিলাম 'নিউ রিপাব্লিক' অফিসে যাত্রা। কিন্তু সে তো নাইণ্টিন্থ স্ট্রীটেই। এ যে অনেক ঘুরে এলাম অন্য কোথাও!

খেতে খেতে অনেক আলাপ। হ্যারিসন আর পার্ক। দুজনেই তাঁরা গোড়া ডেমোক্রাটিক। রিপাব্লিকান শাসনের ঘোর বিরোধী। আইজেনহাওয়ারের অনিশ্চিত নেতৃত্বের কঠোর সমালোচনা। যতো অযোগ্যের প্রশ্রয় তাঁর কাছে! অন্যায়েরও! প্রসংগত ম্যাকার্থি-নিক্সন নিয়ে আলোচনা। ডালেসের পররাষ্ট্রনীতির ব্যর্থতার নানা বিষয় উল্লেখ। শেষ পর্যন্ত সুয়েজ সমস্যা নিয়ে তালগোল পাকানোয় বিরক্তি প্রকাশ। এরি মধ্যেই নির্বাচনী প্রচারের ব্যাপকতা।

বেলা আড়াইটায় ইউ এস আই এ অফিসে। মিঃ হ্যারিসনের গাড়িতেই সেখানে পৌঁছি ঠিক সময়ে। ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে অধ্যাপক পার্কের আমন্ত্রণ। তাঁদের কাছ থেকে আমার ছুটি।

একটু বসুন। এই এলেন বলে মিঃ এস্টারলাইন।—এস্টারলাইনেরই এক সহযোগীর অভ্যর্থনা। সেখানে বসি। সামনে 'ফরেন এ্যাফেয়ার্স' ম্যাগাজিন। এইতো জুলাই সংখ্যা। এ সংখ্যায়ই মিঃ হ্যারিসনের প্রবন্ধ 'চ্যালেঞ্জ টু ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজম'। তাতেই আর একবার চোখ বুলোই।

এই যে মিঃ বোস!—মিঃ এস্টারলাইনের খুশির উচ্ছ্বাস। দেখা হতেই আকস্মিক অনুপস্থিতির জন্যে দুঃখ প্রকাশ।

ইউনাইটেড স্টেটস্ ইনফরমেশন এজেন্সী। তার একজন এ্যাসিট্যাণ্ট ডাইরেক্টর মিঃ জন এইচ এস্টারলাইন। নিকট-প্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকা সংক্রান্ত বিষয়াবলীর ভারপ্রাপ্ত তিনি। কোলকাতায় কালচ্যুরাল এ্যাফেয়ার্স অফিসার হিসেবে ছিলেন কিছুকাল। আমায় দেখে তাই কোলকাতার স্মৃতি স্মরণ।

ইউ এস আই এ-র প্রকাণ্ড অফিস। শাসন বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এটি একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৩ সন থেকে চালু এই কার্যালয়। আমায় সব ঘুরে ঘুরে দেখান মিঃ এস্টারলাইন। অফিসের বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্ট। মার্কিণ প্রচার যন্ত্রের এই হেড-কোয়ার্টার। পৃথিবীর বিরাশীটি দেশে ছড়ানো এর দুশোটি শাখা! মোট কর্মী সংখ্যা প্রায় বারো হাজার। তার মধ্যে সাড়ে সাত হাজার বিদেশী। আর বাকিটা আমেরিকান কর্মচারী। আমেরিকান কর্মীদের হাজার দেড়েক দেশের বাইরে। বাকি সব এই ওয়াশিংটন হেড-কোয়ার্টারে। সংবাদে, বইয়ে, বেতারে, ছবিতে ও ছায়াচিত্রে এদেশের কথা বিদেশে প্রচারের কী ব্যাপক বিপুল ব্যবস্থা! অবাক লাগে দেখে।

কিন্তু একটা কথা। বিভিন্ন দেশ থেকে নানা তথ্য সংগৃহীত হয়ে আসে এখানে। তারপর সে সব তথ্যের ওপর পর্যালোচনা। হেডকোয়ার্টারে বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞ রাখা সেজন্যে বোধহয় সংগত। অবশ্য এ অফিসেরই একটি শাখা 'ভয়েস অব আমেরিকা'। সেখানে রয়েছে কোন কোন দেশের প্রতিনিধি। কিন্তু মূল অফিসেও তেমনি বোধ হয় থাকা দরকার।

একটি ঘরে অনেকগুলো টেলিপ্রিণ্টার। পৃথিবীর নানা প্রান্তের সঙ্গে যোগাযোগ। এক এক অঞ্চলের জন্যে এক একটি মেশিন। একটি টেলিপ্রিণ্টারে ভারতীয় সংবাদ। রাজ্য পুনর্গঠন সংক্রান্ত বিক্ষোভের সর্বশেষ খবর। সে সংবাদ পাঠে আমার নিবিষ্টমন। ক্যামেরায় আমি সে অবস্থায়।

এস্টারলাইনের ঘরে ফিরে আরো খানিক বাক্-বিস্তার। রাজনৈতিক জীবন থেকে রাজাজীর অবসর গ্রহণের প্রসংগ নিয়ে কিছু আলাপ। তারপর চীন। তারপর মিশর। এমনি নানা কথা।

পাশের দেয়াল-তাকে নয়াদিল্লীর 'আমেরিকান রিপোর্টার'। এমনি আরো কয়টি দেশ থেকে প্রকাশিত মার্কিণ প্রচার দপ্তরের সাময়িক মুখপত্র। একখানা 'আমেরিকান রিপোর্টার' তুলে নিয়ে দেখি।

আপনি পান না এখানে এ কাগজ?—এস্টারলাইনের প্রশ্ন।

না তো।—আমার উত্তর।

এদিকে ওঠার তাড়া। পরবর্তী কর্মসূচী চারটেয়। তাই উঠি।

আমেরিকায় শ্রমিক জীবন

পেনসিলভেনিয়া অ্যাভিন্যু থেকে জ্যাকসন প্লেসে। পুরোনো সি আই ও বিল্ডিং। ট্রেড ইউনিয়ন নেতা মিঃ ভিক্টর রুথারের সঙ্গে এপয়েণ্টমেণ্ট সেখানে। রিসেপশনিস্ট খবর পাঠাতেই নিজে এসে আমায় অভ্যর্থনা। ভারি মিষ্টি আন্তরিক শ্রমিক নেতার ব্যবহার।

মিঃ রুথারের অফিসে বসে চারদিকে তাকাই। বিস্ময়ে মন চমৎকার। কোন ট্রেড ইউনিয়নের অফিস এমনি হতে পারে সে আমার ধারণার অতীত।

নানা বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে খোলাখুলি আলোচনা। আমেরিকার শতকরা বিশজন লোক এখনো দরিদ্র। দুঃখের হলেও এ কথা সত্যি। মিঃ রুথারের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি।

আমাদের অফুরন্ত সম্পদ। দক্ষতার সঙ্গেই আমরা তা কাজে লাগিয়ে আসছি। কিন্তু এখনো আমাদের সামাজিক দায়িত্ববোধের যথেষ্ট অভাব। আর যান্ত্রিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক অগ্রগতির ভারসাম্য রক্ষায়ও আমাদের ব্যর্থতাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। তারই বেদনা আজো পর্যন্ত ভুগতে হচ্ছে কিছু লোককে।—আমেরিকার অর্থনৈতিক বনিয়াদ ও জীবনযাত্রা সম্বন্ধে শ্রমিক নেতার সুন্দর বিশ্লেষণ।

আপনি কি মনে করেন না, যুদ্ধোত্তর আমেরিকায় দ্রুত উন্নতি ঘটছে জীবনযাত্রা মানের?

তা ঘটছে সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে জাতীয় সম্পদের ক্রমবৃদ্ধির ফলে জনসাধারণেরও আর্থিক সামর্থ্য বেড়েই চলেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এদেশে আজ শতকরা বিশজন লোকের সুযোগ নেই দৈনন্দিন স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নির্বাহের। অথচ আমি মনে করি, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে সামান্যতম দারিদ্র্যের চিহ্নও থাকার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই।—বলতে বলতে যেন একটু উত্তেজিতই হয়ে ওঠেন মিঃ রুথার।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার কথা। খাদ্য ও উপযুক্ত বাসস্থানের তখন বিশেষ অভাব। আমেরিকার এক-তৃতীয়াংশ লোকের সেজন্যে দুঃখভোগ।

সে প্রসংগে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের একটি উক্তির উদ্ধৃতি। তারপর মিঃ রুথারের নিজের মন্তব্য।

সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে সত্যি, কিন্তু সেই সব বঞ্চিত মানুষের অনেকেরই জীবনে আধুনিক মার্কিণ সভ্যতার পূর্ণ সুযোগ লাভের সম্ভাবনা এখনো সময় সাপেক্ষ। সেদিনের অপেক্ষায় আমরা, যখন একটি মানুষেরও অভাববোধ থাকবে না কোন কিছুর। দেশের সকল মানুষ হবে সকল বিষয়ে অভাবমুক্ত।

একটি সুন্দর স্বপ্ন। বলিষ্ঠ আশা। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সে কি সম্ভব?—মিঃ রুথারের কথায় আমি ভাবি। এ যেন নিগ্রো কবি ল্যাংস্টন হিউজেস্-এর সেই স্বপ্নের মতো:

Last night I dreamt
This most strange dream,
What everywhere I saw
What did not seem could ever be.

তবে স্বপ্ন যদি সত্যি হয়, সে তো ভালো কথা। সারা পৃথিবীর অভিনন্দন সে জন্যে জমা।

এরপর শ্রমিক গোলযোগ সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর। গোলযোগ কথাটিতে মিঃ রুথারের কিঞ্চিৎ আপত্তি।

শ্রমিক-মালিক বিরোধ আছে এদেশে। কিন্তু তাকে আর গোলযোগ বলে মনে করি না আমরা। শান্তিপূর্ণভাবেই মীমাংসিত হয়ে যায় অধিকাংশ বিরোধ।

মার্কিণ ইস্পাত কারখানার শ্রমিকদের সাম্প্রতিক ধর্মঘটের কথা তুলি আমি।

হ্যাঁ সে কথা সত্যি। পয়লা জুলাই দেশব্যাপী সে ধর্মঘটের শুরু। আর সাতাশে জুলাই শান্তিপূর্ণ আলোচনায় তার নিষ্পত্তি। শ্রমিকদের অধিকাংশ দাবী গৃহীত হওয়ায় সহজে মীমাংসা। জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্মীদের দাবী-দাওয়াও বাড়বে সেতো স্বাভাবিক। আর তা পূরণ করার জন্যে কখনো কখনো ধর্মঘট অপরিহার্য হয়ে ওঠাও অসম্ভব নয়। তবে আমেরিকার মালিক-গোষ্ঠী এ সত্য উপলব্ধি করছেন যে, শিল্প কারখানায়

শ্রমিক দক্ষতা ও সম্পদ বৃদ্ধির জন্যেই অতিরিক্ত মুনাফার সমবণ্টন এবং আনুপাতিক বেতন বৃদ্ধি অবশ্য প্রয়োজন। বিশেষ করে মালিকদের এই উপলব্ধির ফলেই আমেরিকার বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে বিভিন্ন ট্রেড

প্রথম শ্রমিক দিবসের একটি চিত্র। ঐ দিন দশহাজার শ্রমিক 'ইউনিয়ন স্কোয়ারে' জমায়েৎ হয়েছিলেন। সভাশেষে ইউনিয়ন স্কোয়ার থেকে সুরু শহরের বিখ্যাত রাজপথ ব্রডওয়ের ওপর দিয়ে একটি বিরাট শোভাযাত্রা পরিচালিত হয়।

ইউনিয়নের সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। শিল্প-জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।—বলেই থামেন রুথার।

অতিরিক্ত মুনাফা বণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগ্রহ প্রকাশ আমার তরফ থেকে।

এ ব্যবস্থা নতুন কিছু নয় আমেরিকায়, জানান রুথার। তবে এর ব্যাপক প্রয়োগ সাম্প্রতিক। গত দশ বারো বছরের মধ্যে পাঁচ গুণেরও বেশি শিল্প প্রতিষ্ঠানে এ পরিকল্পনা প্রবর্তিত। বর্তমানে সে সংখ্যা প্রায় বিশ বাইশ হাজার। সর্বত্রই তার অসামান্য সাফল্য। মালিকদের মতো শ্রমিকদেরও শিল্পে অংশীদারত্বের বোধ জাগ্রত। ফলে যেমনি কর্মে উৎসাহ বৃদ্ধি, তেমনি উৎপাদনের পরিমাণ এবং গুণমান। মুনাফা বণ্টন পরিকল্পনার জনপ্রিয়তা ও দ্রুত প্রসারের তাই কারণ। কোন কোন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানেও এ ব্যবস্থা চালু। শুনে আমার গভীর আনন্দ। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী শিল্প সংস্থার কার্য পরিচালনায় সহায়ক প্রতিষ্ঠানও আমেরিকায় এখন নাকি শতাধিক।

পরোক্ষে ক্রেতারাও তা হলে এর থেকে কিছু সুবিধে পাচ্ছেন, তাই না? —আমার জিজ্ঞাসা।

নিশ্চয়ই। তাঁরা ভালো জিনিস পাচ্ছেন। তা ছাড়া সব জিনিস পাচ্ছেন অপেক্ষাকৃত অনেকটা সুলভে। শ্রমিক-মালিক সম্প্রীতির এ একটা মস্ত বড়ো সুফল বৈকি!

আমেরিকায় শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্কের কথা শুনে আমার সন্তোষ। শ্রমিকদেরই শুধু নয়, সারা দেশের অবস্থার উন্নয়নে সে সম্প্রীতির নিতান্ত প্রয়োজন। আর তার জন্যে দরকার শ্রমিকদের বিপুল সংঘশক্তি। সে শক্তি অর্জন করায় মার্কিণ শ্রমিক নেতৃত্বকে অভিনন্দন।

কিন্তু একথা ভুলবেন না, আমেরিকার শ্রমিকদের যে পরিমাণ নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা নেই। নিজেদের কথাই বলি। ঘরের জানালা দিয়ে কতোবার এসে আততায়ীর গুলী প্রবেশ করেছে রুথার পরিবারে। আমাদের দুভাই-এর দেহে সেই গুলীর আঘাতের চিহ্ন এখনও অতীত নির্যাতনের জীবন্ত সাক্ষ্য।—বলতে বলতে যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন রুথার।

মিঃ ওয়ালটার রুথারের সঙ্গে দেখা না হওয়ায় আমার দুঃখ প্রকাশ। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে ছোট রুথারের অনুরোধ।

ডেট্রয়েট ওয়ালটারের কর্মকেন্দ্র। সেখানেই এখন আছেন তিনি। কিছুকাল

থাকবেন সেখানে। আপনার কথা লিখে জানাবো তাঁকে। মিঃ লিণ্ডের কাছ থেকে খবর নিয়ে জানিয়ে দেবো তাঁকে আপনার কর্মসূচী। খুবই খুশি হবেন তিনি আপনার সঙ্গে দেখা হলে।—ভিক্টরের কথায় আমিও খুশি। আমারও খুব ইচ্ছে ওয়ালটারের সঙ্গে আলাপ করার।

ডেট্রয়েট। পৃথিবী বিখ্যাত ফোর্ডের মোটর কারখানা সেখানে। প্রায় দুলক্ষ শ্রমিকের কর্মতীর্থ। বছরে পনেরো লক্ষাধিক মোটর গাড়ি নির্মাণের কাহিনী কী রোমাঞ্চকর! টুকরো টুকরো পাঁচ হাজার অংশ মিলিয়ে নাকি ফোর্ড কোম্পানীর এক একখানি মোটর গাড়ি। স্বয়ং হেনরি ফোর্ড সাহেবের আত্মকথার বর্ণনা। ডেট্রয়েট অটোমোবাইল কোম্পানীর ফোর্ড মোটর কোম্পানীতে রূপান্তর। সে কাহিনী জানার মতো। সে কারখানা দেখায় আরো আনন্দ। সেখানে যাবার চেষ্টা করবো, জানালাম ভিক্টরকে।

ওয়ালটারের দক্ষিণ এশিয়া সফরের বিবরণ। পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ডালেসের নিকট গত তেইশে মার্চ তারিখে পাঠানো তাঁর স্মারকলিপি এবং আরো কিছু ছাপানো কাগজপত্র। সময়মতো দেখার জন্যে আমার হাতে তুলে দেন মিঃ রুথার।

স্মারকলিপিখানিতে ভারত সম্পর্কে ডালেসের মনোভাবের কঠোর সমালোচনা। ভারতের প্রতি মার্কিণ শ্রমিক নেতার দরদের পরিচয়।

ভিক্টরও সহানুভূতি প্রকাশ করলেন ভারতীয় শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে। ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে জ্যেষ্ঠের রিপোর্টের উল্লেখ।

দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে একটি মাত্র সুসংহত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা গড়ে তোলা বাঞ্ছনীয়। ভারতে সুস্থ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পথে রাজনৈতিক দলীয় প্রভাব প্রবল অন্তরায়। আমেরিকার শ্রমিক সংস্থাগুলো রাজনীতির সঙ্গে সংস্পর্শহীন। তা ছাড়া দুটি কেন্দ্রীয় সংঘের সাম্প্রতিক মিলনে এদেশের শ্রমিক আজ বিপুল শক্তিশালী।—বল্লেন ভিক্টর।

আপনি বলছেন, রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামান না আপনারা। তা হলে আগামী নির্বাচনে ষ্টিভেনসন-কেফভার জুটিকে সমর্থনের নির্দেশ দেওয়া হলো কি করে আপনাদের তরফ থেকে?

কোন দলীয় ভিত্তিতে নয়। এঁরা দুজন শ্রমিকদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল। তাই এঁদের নাম সুপারিশ করা হয়েছে আমাদের তরফ থেকে। শ্রমিকদের অনেক ভোটই পাবেন ভালো ভালো রিপাব্লিকান

প্রার্থীরা। কিন্তু অবাঞ্ছিত ডেমোক্র্যাট প্রার্থীরাও শ্রমিক ভোট পাবেন, তেমন আশা দূরাশা।—এভাবে আসন্ন নির্বাচন সম্পর্কে শ্রমিক মনোভাব বিশ্লেষণ করলেন মিঃ রুথার।

তারপরে বিদায় মুহূর্ত। শেষ অংকে আমার মাধ্যমে ভারতীয় শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে রুথার ভ্রাতৃদ্বয়ের অভিবাদন জ্ঞাপন। মার্কিণ শ্রমিকদের অভিনন্দন। উপসংহার।

আবার ফিরতে হয় হোটেলে। ডাঃ সেন লাউঞ্জে অপেক্ষমান। সেই সকাল থেকেই আমার হোটেলে তাঁর উপস্থিতি। যে কদিন সম্ভব আমার সঙ্গে এক হোটেলে থাকার ইচ্ছে।

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় এনগেজমেণ্ট। ঠিক সময়েই শ্রী মেহতা সকাশে আমি আর ডাঃ সেন। দূতাবাস তখন লোকবিরল। কফি ও কেকের সঙ্গে সঙ্গে নিরিবিলি মিষ্টি আলাপ। ডাঃ সেনের সঙ্গে শ্রী মেহতার পুরোনো কালের পরিচয় আবিষ্কার। ডাঃ সেন তখন কোলকাতার ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। শ্রী মেহতাও তখন কোলকাতায়। সেই পুরোনো পরিচয় এতোদিন পর আবার ঝালাই।

আমাদের আলোচনায় জাতীয় আন্তর্জাতিক নানা প্রশ্ন। হঠাৎ ফোন। এক মিনিটে রাষ্ট্রদূতের কথা শেষ। মুহূর্ত পরেই আমাদের সামনে ক্যামেরাম্যান নিয়ে শ্রী ট্যাণ্ডন। ফটো-ছবিতে আমাদের কফি-আসর।

সে আসর ভাঙে অনেক পরে। আমরা যখন আবার পথে তখন শহরে সন্ধ্যা ছায়া। গাড়িতে বসে ডাঃ সেনের সঙ্গে সরস নিরস নানা আলাপ। তারই মধ্যে আমার মনে একটি কথার কেবলি ঘূরপাক। পরকে সাহায্য করার অদম্য ঝোঁক। মার্কিনী ব্যক্তি-চরিত্রের এ একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কথাটা তুলেছিলেন রাষ্ট্রদূত শ্রী মেহতা। অল্পদিনের অভিজ্ঞতায় আমিও পেয়েছি তার অনেক প্রমাণ। কিন্তু আজ আর সে বৈশিষ্ট্য শুধু ব্যক্তি-চরিত্রে সীমাবদ্ধ নয়। আজ তার ব্যাপ্তি জাতীয় বৈশিষ্ট্যে। পৃথিবীর দ্বারে দ্বারে আমেরিকার সাহায্যহস্ত আজ প্রসারিত।

তবু কেন আমেরিকা সম্পর্কে এতো বিরূপতা দেশে দেশে? মনে মনে ভাবি। এ বিষয়টি আমেরিকানদেরই বিশেষ করে ভাবার মতো। কেউ কেউ তাঁরা ভাবেনও বটে। মিঃ ওয়ালটার পি রুথারের সাম্প্রতিক স্মারকলিপিটি

তার প্রমাণ। পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ডালেসের কাছে স্পষ্ট ভাষায় তাঁর বক্তব্য পেশ। তিনি বলেছেন:

It seems to me, as it does to many other Americans, that our economic aid programs have been too late and too little and have been planned and executed in a spirit of bargaining which has cost us dearly, seriously damaging the fund of good will which had existed in most cases beforehand. There has been too much calculation as to whether or not a nation receiving aid would submit to our leadership, whether it would fit itself into our current pattern of military alliances and whether it would demonstrate the proper amount of gratitude.

তারপর তিনি আরো বলেছেন: We have developed too much the attitude whether or not expressly stated in economic aid legislation or in the language of formal agreements, that if a country is not *for* us, she is *against* us. এ যে কতো বড়ো ভুল তা দেখিয়েছেন জ্যেষ্ঠ রুথার ভারতের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে।

হোটেলে পৌঁছতেই টেলিফোন ডাক। মিসেস্ দাসের একটি অনুসন্ধান। ডাঃ সেন এসেছেন কি না সে জিজ্ঞাসা। আমাদের দুজনকে তাঁদের একত্রে চাই। ডাঃ সেনও আমার হোটেলে, তা জেনে সন্তোষ।

কাল বিকেল ছটায় তাহলে আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। ডাঃ দাসকেও নিয়ে যাবো। তখনই কথা হবে।—মিসেস্ দাসের সঙ্গে এপয়েণ্টমেণ্ট।

ডাঃ রজনীকান্ত দাসের নাম ডাঃ সেনেরও পরিচিত। দাস-দম্পতির সঙ্গে আমার প্রথম দিনের সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা স্মরণ। তা বিস্তারিত জানাই ডাঃ সেনকে।

হোটেলে এক বেডের ঘরের অভাব। ডাঃ সেনের জন্যে তেমনি একখানি ঘর প্রয়োজন। তা না পেয়ে অগত্যা ডবল বেডের ঘরেই স্থান গ্রহণ। পাশের শূন্য শয্যা শেষ অবধি শূন্য ছিলো কি না তা অজানা। তবে তেমনি শূন্যতা নিয়ে স্বপ্নজাল রচনার স্বর্ণ সুযোগ। রসাশ্রয়ী মন ডাঃ সেনের।

হাস্ত-পরিহাস তাঁর কথায় কথায়। তাঁর মতো লোকের কদিনের সঙ্গলাভে আমার মনের সজীবতা।

উইলসন শতবার্ষিকীর কথা বলা হয়নি তো ডাঃ সেনকে! নিজের ঘরে বসে রাত্রিতে ভাবি। আমেরিকান পলিটিক্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশনের দ্বিপঞ্চাশৎ বার্ষিক সম্মেলন। উইলসন শতবার্ষিকী এবারের অধিবেশনের বৈশিষ্ট্য। আসছে কাল থেকে তার শুরু। কদিন আগেই মিঃ লিণ্ডের মাধ্যমে তাতে যোগদানের আমন্ত্রণ লাভ। কয়েকদিনব্যাপী অনুষ্ঠান। প্রতিদিন একাধিক প্যানেলে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা। সাত তারিখের একটি প্যানেলে ভারত বিষয়ে অধ্যাপক মেরিল গুডলের বক্তৃতা। সে আলোচনায় অংশ গ্রহণের কথা। গত দুরাত ধরে চলেছে তারই প্রস্তুতি। ডাঃ সেন এসে পড়ায় যেন দায়মুক্তি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলায় আহত-মন মহামতি উড্র উইলসন। পৃথিবীতে 'ন্যায়ভিত্তিক শান্তি' প্রতিষ্ঠায় গভীর আত্মপ্রত্যয়। মহাযুদ্ধান্তে ভার্সাই সন্ধিপত্রে জাতিসংঘ গঠনের পরিকল্পনা রূপায়ন। উইলসনের চৌদ্দ দফা সর্ত গ্রহণে রাষ্ট্র-প্রতিনিধিদের স্বীকৃতি। কিন্তু জাতিসংঘে যোগদানে আপন দেশের সিনেটের অনুমোদনলাভে বারংবার তাঁর ব্যর্থতা। উইলসনের জীবনের সে এক আমৃত্যু ক্ষোভ। অথচ সেই জাতিসংঘেরই ভগ্নস্তূপের ওপর আজকের রাষ্ট্রসংঘ। আর সেখানে আজকের আমেরিকার কী বিপুল প্রতিপত্তি। কিন্তু এতো সত্ত্বেও আজকের পৃথিবীতে কোথায় ন্যায়, কোথায় শান্তি!

সকালে উঠে ডাঃ সেনকে নিয়ে চা-পর্ব সমাধা। তারপর দুজন দুদিকে। ডাঃ সেনের এপয়েণ্টমেণ্ট গভর্ণমেণ্টাল এ্যাফেয়ার্স ইন্সটিট্যুটে। আমার এ-এফ-এল—সি-আই-ও বিল্ডিং-এ। সম্মিলিত কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংস্থার নবনির্মিত এই ভবন। যথাসময়ে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিতি। ঠিক সোয়া নটায়। কিন্তু আমি যে বিস্ময়ে অভিভূত। এমন অপূর্ব বাড়ি তৈরি হয়েছে শ্রমিকদের চেষ্টায়! এ যে রাজধানীর অন্যতম সুরম্য প্রাসাদ!

একতলায় রিসেপশন টেবিল। সেখানে কেন্দ্রীয় সংস্থার কর্তৃপক্ষীয় একজন আমার জন্যে অপেক্ষমান। লবীর সুপ্রশস্ত সম্মুখভাগ জুড়ে কাচের দরজা। ভিতরে দেয়াল জোড়া চমৎকার মুর্যাল পেন্টিং। বাইরে থেকেই তা দৃষ্টিগোচর। আমার সঙ্গীর মুখে সে সব চিত্রের বর্ণনা। ছয় রঙা আমেরিকান

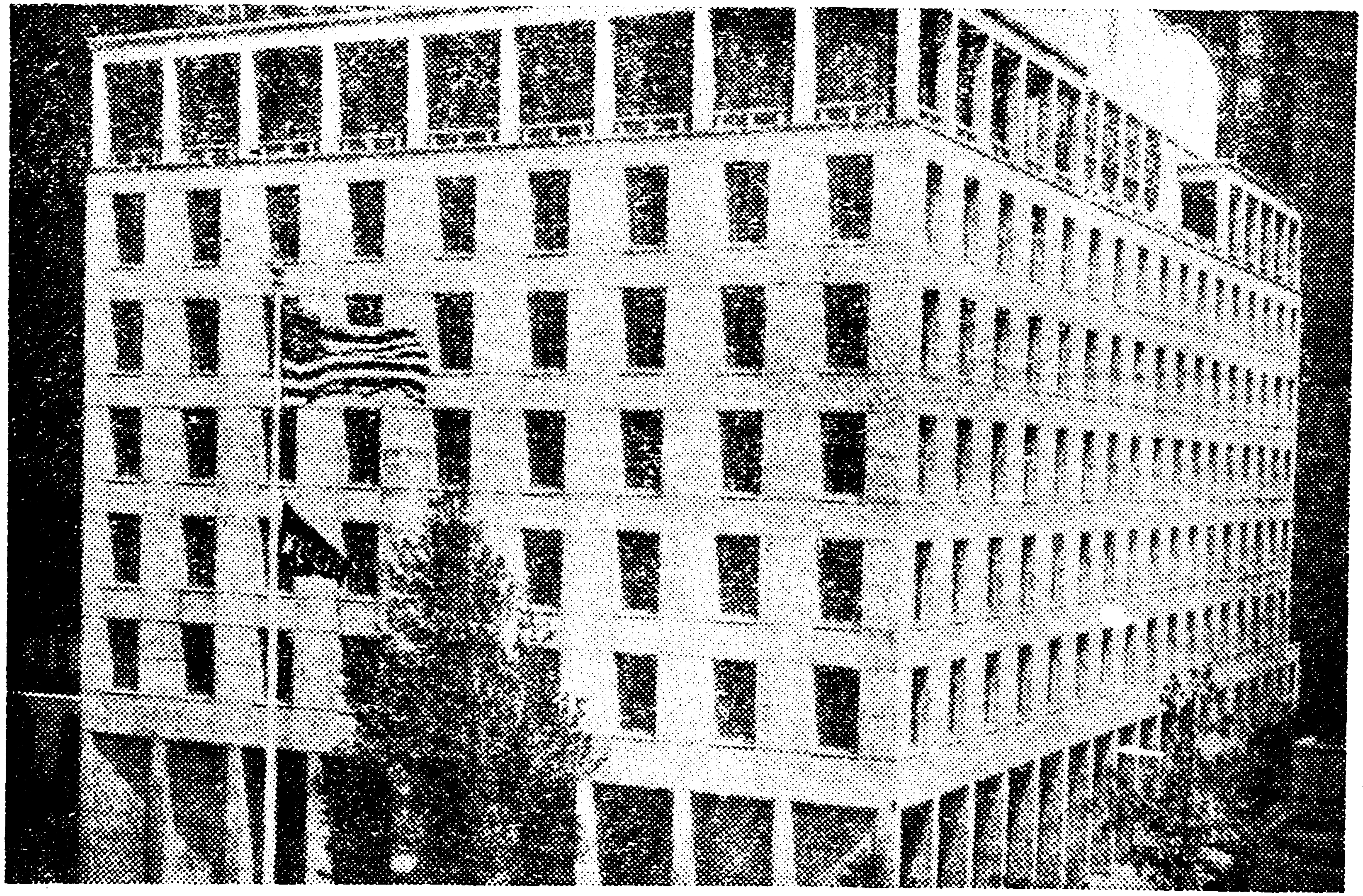

এ-এফ-এল-সি-আই-ও ভবন : মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনের সিক্স্‌টিন্থ ষ্ট্রীটের ওপর অবস্থিত এ-এফ-এল-সি-আই-ওর নতুন বিরাট ভবন। রাজধানীর অন্যতম সুরম্য এই বাড়ির অদূরে রাষ্ট্রপতি ভবন 'হোয়াইট হাউস' এবং লাফায়েৎ পার্ক।

মার্বেল পাথর। তার ওপর পাঁচ-রঙা ইতালীয় গ্লাস গোল্ডের ছবি। সতেরো ফিট উঁচু ও একান্ন ফিট লম্বা দেয়ালে বাইজেণ্টাইন-মোসাইক পদ্ধতির চিত্রাংকন। মেশিনের ওপর মানুষের আধিপত্য। শান্তির জন্যে ব্যাকুলতা। আর সংসার রক্ষায় মানুষের সহজাত প্রেরণা। এ কয়টি বিষয় দেয়াল-চিত্রে অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট।

ওপরে উঠে এসে মিঃ হেনরি রুৎস্-এর সঙ্গে প্রথম আলাপ। কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংস্থার আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি মিঃ রুৎস্। দেশবিদেশের অতিথিদের দেখাশোনার ভার তাঁর ওপর। তিনিই ঘুরে ঘুরে দেখালেন সংস্থার বিভিন্ন বিভাগ। সর্বোচ্চ তলায় কর্মকর্তাদের কার্যালয়। মোট পঁয়তাল্লিশ ফিট ত্রিশ ফিট কাউন্সিল রুমটি ভারি ছিম্‌ছাম্। প্রকাণ্ড একটি টেবিল মাঝখানে। তার চার দিকে উনত্রিশখানি চেয়ার। আঠাশখানি এক ধরনের। অপরখানি একটু বড়ো। সেখানা প্রেসিডেন্টের বিশেষ আসন। বর্তমান প্রেসিডেণ্ট মিঃ জর্জ মিনি। দেড় কোটি শ্রমিক সদস্য-তালিকাভুক্ত এই কেন্দ্রীয় সংস্থার। তাঁদের ভালোমন্দ আলোচনার কেন্দ্রস্থল এই কাউন্সিল রুম। উনত্রিশ জন কর্ম-পরিষদ সদস্যের এই সভাঘর।

কম্যুনিষ্ট পার্টি পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়নও তো কতগুলো আছে এদেশে। তারাও কি এই কেন্দ্রীয় সংস্থার অনুমোদিত?

হ্যাঁ, এখনো এদেশের পাঁচ-ছয়টি ইউনিয়ন কম্যুনিষ্ট পার্টির কবলিত। কিন্তু অতি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে তাদের সদস্য সংখ্যা। অদূর ভবিষ্যতে সেই সব কয়টি ইউনিয়নেরই কেন্দ্রীয় সম্মিলিত সংস্থার সঙ্গে যোগদান অবধারিত বলে আমাদের ধারণা। রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এ কয়টি ইউনিয়ন। তাই তাদের অনুমোদন আমাদের গঠনতন্ত্র বিরোধী।—মিঃ রুৎস্-এর উত্তরে নতুন তথ্য।

কাউন্সিল রুম থেকে প্রেস ডিভিসনে। দুখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় এখান থেকে। এ-এফ-এল—সি-আই-ও নিউজ-এর সম্পাদকীয় দপ্তরের বন্ধুদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক। আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার ও কংগ্রেস অব ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অর্গেনাইজেশন্-এর মুখপত্র এই পত্রিকা। নামেই তা প্রকাশ। অর্থের বিনিময়ে বিজ্ঞাপন গ্রহণ নিষিদ্ধ শ্রমিক সংস্থার এই মুখপত্রের। মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত পত্রপত্রিকার কথা মনে পড়ে।

শ্রমিক সাংবাদিকতাকে সর্বাংগ সুন্দর করার জন্যে এদেশে আন্তরিক চেষ্টা।

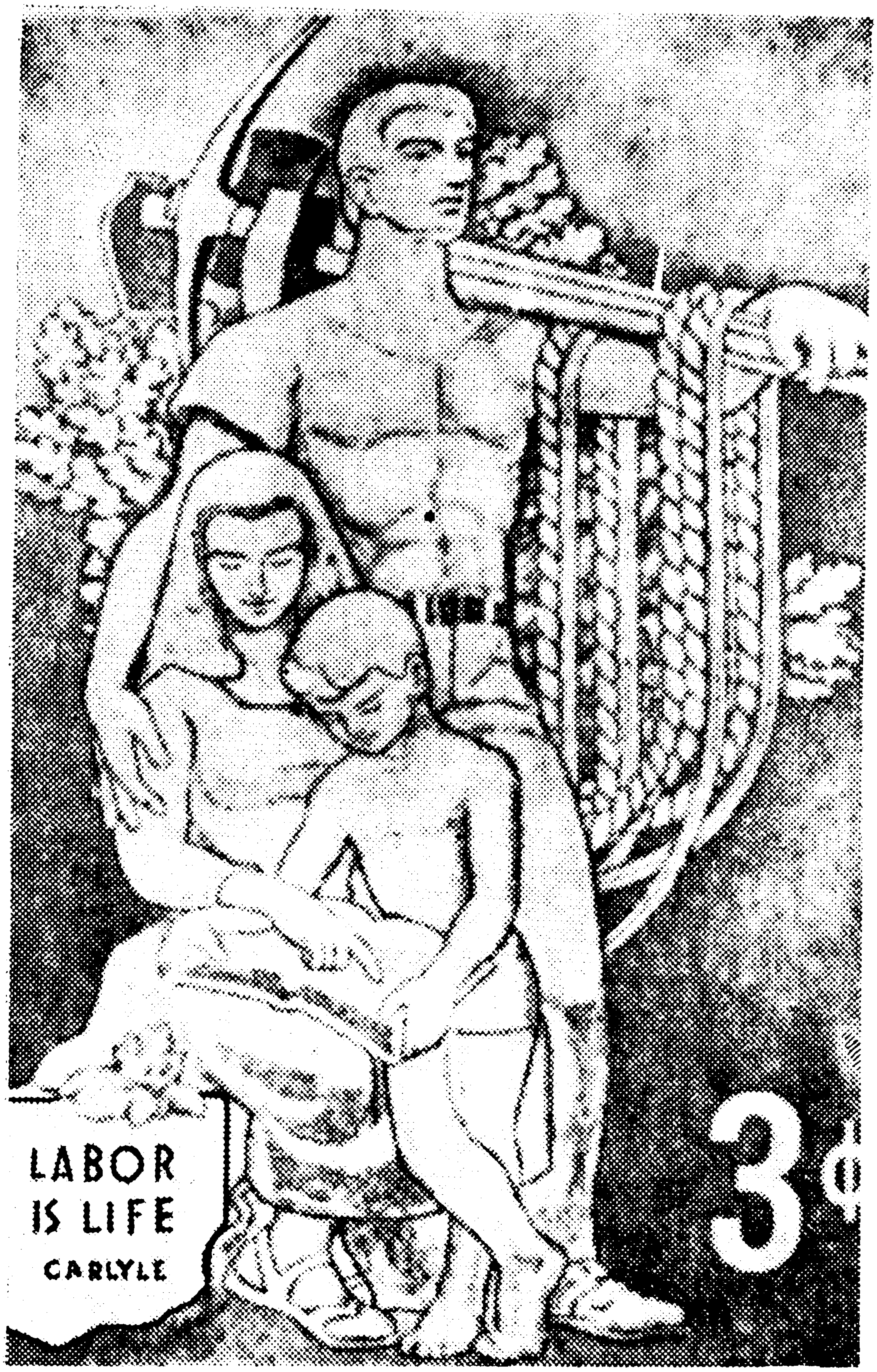

শ্রমই জীবন : ১৯৫৬ সনের মার্কিন শ্রমিক দিবস উপলক্ষে প্রচারিত তিন সেণ্টের একটি ডাক টিকিট। এ-এফ-এল-সি-আই-ও ভবনের ম্যুরাল পেণ্টিং থেকে চিত্রটি গৃহীত।

ইণ্টার ন্যাশনাল লেবার প্রেস এসোসিয়েশনের সাম্প্রতিক অধিবেশন নিয়ে কথা ওঠে। এই এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে পুরস্কার দেওয়া হয় শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকতার জন্যে। এবার সে পুরস্কার পেয়েছে তেল-রাসায়নিক ও আণবিক কর্মীদের মুখপত্র 'ইউনিয়ন নিউজ'। আমেরিকান নিউজ পেপার গিল্ড নিয়ে আরো খানিক আলোচনার পর বৈঠক ভঙ্গ। তারপর পত্রিকা অফিসের এঘর-সেঘর ঘুরে দেখা।

সাপ্তাহিক পত্রিকার জন্যে যে এতো বিরাট আয়োজনের প্রয়োজন হতে পারে তা দেখে বিস্ময়। সে বিস্ময় নিয়েই নিচে নামি।

এমনি সাততলা বাড়ি তৈরি করতে লাগবে না চার মিলিয়ন ডলার? সে আর কি এমন বেশি? টাকার অংকে মাত্র দু কোটি মুদ্রা।

লবীর মুর‍্যাল পেণ্টিং-এর দিকে আবার চোখ। মাঝখানটায় যেন শ্রমিক জীবনের জয়যাত্রার একটি সুন্দর গল্প। এ চিত্রই দেখেছি শ্রমিক দিবস উপলক্ষে প্রচারিত তিন সেণ্টের ডাকটিকিটে।

সুস্থ সবল এক জোয়ান মরদ দাঁড়িয়ে। অগ্রগমনে উদ্যত সে। কাঁধে তার গাইতি আর হাতুড়ি। কর্ম-প্রতীক। পাশে বসে তার প্রিয়তমা। ছেলে পড়ানোয় ব্যস্ততা তার। চোখেমুখে তাদের শান্তির হাসি। আনন্দ ছাপ। একটি সুখী সচ্ছল শ্রমিক পরিবার। এক কোণে লেখা কারলাইলের অমর বাণী: Libor is life—শ্রমই জীবন। সত্যি তাই।

নূতন পৃথিবীর নগর-নাগরিক

জীবন ও জগৎ এদেশে কাছাকাছি। আনন্দময় জীবন। জগৎও তাই সুন্দর। হোটেল ষ্ট্যাটলারে তার ছবি।

রাজধানী ওয়াশিংটনের অন্যতম সেরা হোটেল ষ্ট্যাটলার। আমেরিকান পলিটিক্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশনের বার্ষিক অধিবেশন আজ থেকে শুরু এখানে। নাম রেজিষ্ট্রি প্রয়োজন তার জন্যে। সে উদ্দেশ্যেই বেলা বারোটায় আমার আসা। বহু লোকের ভিড়। কিন্তু সে ভিড়ের জন্যে বিরক্তির কারণ নেই কোন। হাসির লাবণ্য ছড়ানো চারদিকে। গল্প আর গল্প কেবল। কোথাও জোড়ায় জোড়ায়। কোথাও দল বেঁধে।

অধ্যাপক পার্কের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। দ্বিতীয় দফা আলাপের সুযোগে দুজনেই খুশি। পার্কের সাহায্যে সহজেই আমার কাজ সমাধা। খোঁজাখুজি থেকে পুরো রেহাই। তিন ডলারে নাম রেজিষ্ট্রি।

পলিটিক্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মেলন। কয়েক দিনব্যাপী তার অধিবেশন। বিভিন্ন প্যানেলে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা। এক এক প্যানেলে এক এক বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের অংশ গ্রহণ। ভোজসভায় মিসেস্ রুজভেল্ট, প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান প্রমুখ গণ্যমান্যদের ভাষণ। এ উপলক্ষে এমনি সব ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগের কতো সুযোগ। কিন্তু রাজধানীতে আমি তো মাত্র আর একদিন। কাজেই এ সুযোগের অনেকখানি থেকেই বঞ্চিত।

সম্মেলনের দীর্ঘ কর্মসূচী। তার মধ্যে মাত্র দুটি প্যানেলে যোগদানের সিদ্ধান্ত। তার একটি আজই বিকেল আড়াইটায়। মে ফ্লাওয়ার হোটেলে সে প্যানেলের বৈঠক। আর্বান প্ল্যানিং নিয়ে আলোচনা সেখানে। পৌর কল্যাণ বিধানে নাগরিক সচেতনতার অভাব আমাদের দেশে। আর এদেশে নগর-জীবনের কী সুন্দর পরিবেশ! সে সম্পর্কে আলোচনা শুনতে তাই আগ্রহ।

খাওয়া-দাওয়া সেরে হোটেলে ফিরি। একটু বিশ্রাম।

হোটেল মে ফ্লাওয়ার অনতিদূরে। ক্যাবে আমার হোটেল থেকে মিনিট কয়েক। রম্য-দর্শন মে ফ্লাওয়ার। নামের সঙ্গে অপূর্ব তার সঙ্গতি। অলিন্দতলায় ঝোলানো রকম রকম ফুলঝুরি। হোটেল দেয়ালের সহজ সরল অঙ্গসাজ। পথিক-দৃষ্টি অনিবার্য।

আলোচনা শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই আমার আগমন। প্রধান বক্তার পর আরো কয়েকজনের ভাষণ। তারপর প্রশ্নোত্তর। আমেরিকার নগরশাসন বিষয়ে নানা তথ্য সংগ্রহ তা থেকে। সভায় প্রাপ্ত বিভিন্ন পত্র-পুস্তিকায়ও বহু বিবরণ।

প্রবল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আমেরিকায়। তা সত্ত্বেও নগর-জীবনের বিকাশে, জাতীয় জীবনের অগ্রগতিতে সহযোগিতাই মূল কথা। এ শহর আমার, এদেশ আমার, এ বোধ প্রত্যেকের মধ্যে। নিজের শহরকে সুন্দর রাখার, দেশকে এগিয়ে নেবার পথে সহযোগিতা। এ সুবুদ্ধি সবার মনে সদাজাগ্রত।

আমাদের দেশের মতোই অনেকগুলো বিশেষ 'দিবস' পালনের রেওয়াজ রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। তার মধ্যে 'নাগরিক দিবস'-এর গুরুত্ব বোধ হয় সর্বাধিক। নাগরিক কর্তব্য স্মরণ ও নগর কল্যাণ বিধানের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ। এ দিন এ কাজ প্রত্যেকের করণীয়। 'জনগণের দ্বারা গঠিত জনগণের জন্যে জনগণের সরকারের' প্রতি সেদিন সবার মুখে মুখে আস্থা ঘোষণা। পৌর-শাসন ব্যবস্থাও সেই গণতান্ত্রিক বোধেরই প্রতিচ্ছায়া।

রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা ও শাসনতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা। অন্তত এ দুই ক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে আমেরিকানদের অনেক মিল। কিন্তু জীবনযাপন প্রণালীতে এ দুই দেশে অনেক তফাৎ। আমাদের গণতন্ত্রের বড়াই অনেক ক্ষেত্রে অন্তঃসারশূন্য। অশিক্ষার অন্ধকারে আচ্ছন্ন দেশ। শিক্ষার ছিটেফোঁটা আলো এখানে সেখানে। গণতন্ত্রের সফল রূপায়ণ ও তার যথার্থ রূপানুভূতি অসম্ভব এই সামান্য আলোয়। গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি আমার ভারতে আজো তাই অস্বীকৃত। 'সাম্য, স্বাধীনতা ও ন্যায়'-ভিত্তিক গণতান্ত্রিক জীবন-পদ্ধতি আমেরিকায়। কি দেশ-শাসন, কি নগর-শাসন সবই এখানে সে অনুযায়ী।

নগর উন্নয়নের শিক্ষা আমেরিকায় পবিত্র শিক্ষা। নগর-বিধি অনেকটা

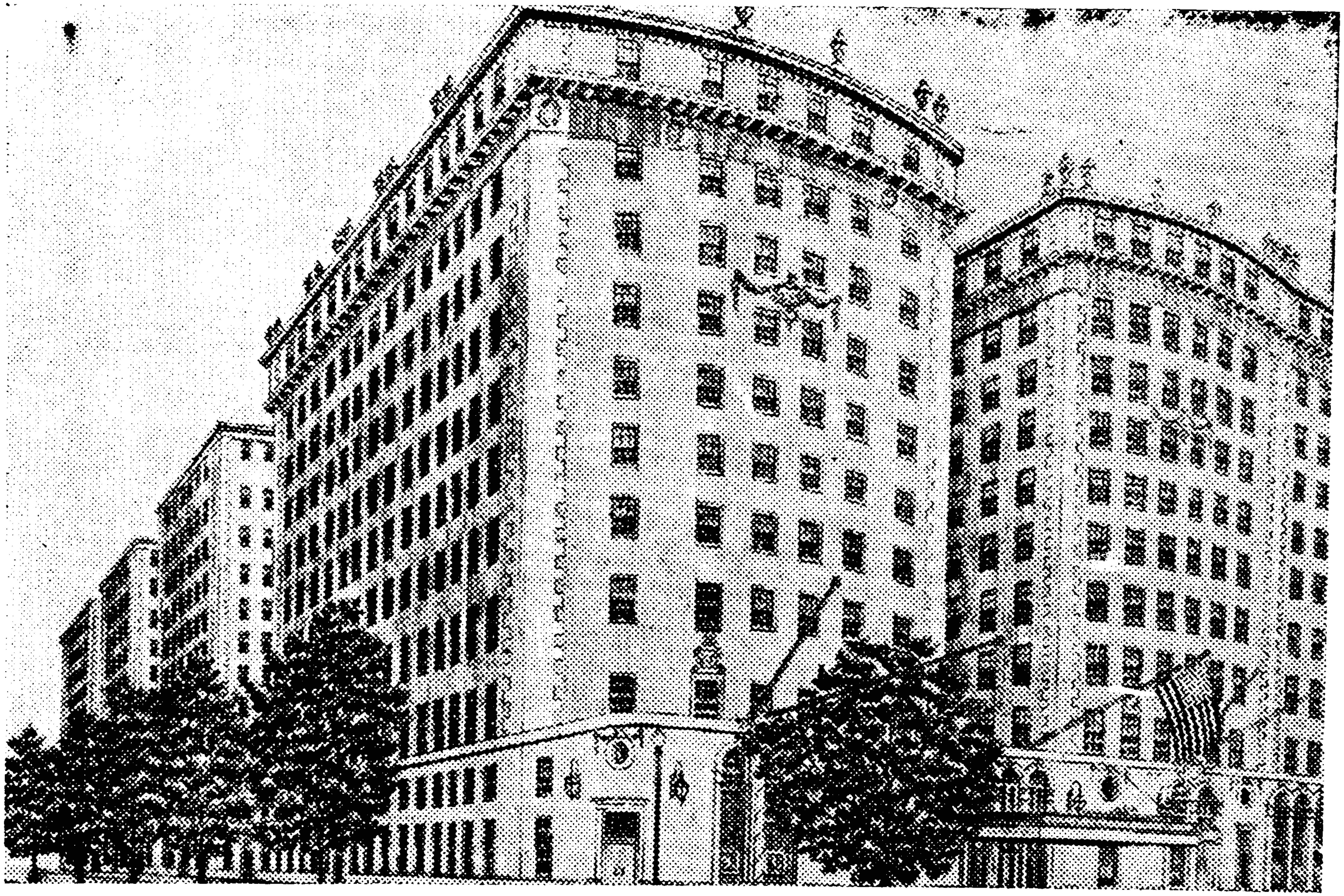

ওয়াশিংটনস্থ মে ফ্লাওয়ার হোটেল : আমেরিকান পলিটিক্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশনের দ্বিপঞ্চাশৎ অধিবেশন উপলক্ষে কয়েকটি আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয় এই হোটেলে।

যেন ধর্মীয় অনুশাসন। সকল শ্রেণীর নর-নারীর কাছেই তা অবশ্য পালনীয়। শহরের সর্ববিধ সুখ-সুবিধা বিধানে সহযোগিতা ও সমন্বয়। তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বোধ কখনো বাধা নয় এখানে। আরো সুন্দর চাই আমার শহর। আরো স্বাস্থ্যকর। এ আকাঙ্ক্ষা শহরবাসীর মনে মনে। বুদ্ধি-বৃত্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের মধ্যে সে আগ্রহ সৃষ্টি। মহৎ কাজ। এ কাজের জন্যে রয়েছে নানা সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান। রাজনীতির স্পর্শমুক্ত এ সব সংস্থা। দল-মতনির্বিশেষে সবার সহযোগিতা এদের সঙ্গে। নগর সেবায় এদের সার্থকতা। সংখ্যায় অসংখ্য এরা। আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলার কাজে এদের অমূল্য দান।

এবার আমেরিকার নগর-শাসনের কথা। এ সম্পর্কে তিনটি প্রণালী চালু আমেরিকায়। গোড়াগুড়ি থেকে চালু মেয়র-কাউন্সিল ব্যবস্থা। এ একেবারে পুরোনো ইংল্যাণ্ডের পৌর-শাসনতন্ত্রের মার্কিণী রূপ। বৃটিশ উপনিবেশের যুগ তখন আমেরিকায়। প্রবাসী শাসক ইংরেজের দ্বারা স্বদেশীয় পৌর-প্রণালীর পত্তন এদেশে। মেয়রের কর্তৃত্ব তখন অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কিন্তু একালে তা অনেক বেশি।

মেয়র-কাউন্সিল পদ্ধতির ও অবশ্য দুটি ধারা। একটিতে মেয়রের উপদেষ্টা পরিষদ মাত্র কাউন্সিল। মেয়রের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীন। অন্য ধারায় কাউন্সিলই প্রকৃত শক্তিস্তম্ভ। মেয়রের পরিচালক। মেয়র যেখানে স্বপ্রধান বিভাগীয় কর্তা, নিয়োগ সেখানে তাঁরই হাতে। ছোট ছোট শহরে, কোন কোন বড়ো শহরেও মেয়রই সভাপতি কাউন্সিল সভায়। স্থানীয় শাসনবিধি সংক্রান্ত যে কোন সিদ্ধান্ত তিনি বাতিলের অধিকারী। তাঁর ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা অবশ্য সীমাবদ্ধ। যে কোন বিষয়ে সে ক্ষমতা নিরর্থক করা সম্ভব কাউন্সিলের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে।

মেয়রের অনেক কাজ। প্রায় সর্বত্রই বাজেট রচনার দায়িত্ব মেয়রের। বিভিন্ন মিউনিসিপ্যাল কোর্টে বিচারকের কাজও করেন তিনি। মার্কিণ পৌর-শাসন ব্যবস্থার এ একটি বিশেষ দিক। তবে অনেক শহরে আবার সিটি ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর বিচার ভার। সেই সিটি ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করেই মেয়রের পৌর বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব শেষ। বাজেট রচনার ব্যাপারেও কোন কোন বড়ো শহরে এমনি পৃথক ব্যবস্থা। মেয়র নিযুক্ত সিটি ট্রেজারারের ওপরই সে

সব পৌরসভার বাজেট প্রণয়নের দায়-দায়িত্ব। অর্থ দপ্তরের কর্তা সিটি ট্রেজারার।

স্বপ্রধান হলেও খেয়াল-খুশি মতো কাজে মেয়রেরও অনেক বাধা। গুরুতর অভিযোগে মেয়র অপসারণে সক্ষম সিটি কাউন্সিল। অবশ্য খুব বেশি ভোটাধিক্য প্রয়োজন তার জন্যে। সাংঘাতিক অপরাধে দণ্ডিত মেয়র নিজেই পদত্যাগে বাধ্য। কোন কোন শহরে মেয়রকে পদচ্যুত করার ক্ষমতা ভোটদাতাদের। অনেক রাজ্যে আবার মেয়রের পদচ্যুতি গভর্ণরের হাতে।

আমরা যাদের কাউন্সিলার বলি, আমেরিকায় তাঁরা কাউন্সিলম্যান। নগর-পরিধি ও নগর-গুরুত্বে তাঁদের সংখ্যার কম-বেশি। কোথাও পাঁচ, কোথাও পঞ্চাশ। তবে কুড়ি থেকে ত্রিশই তাঁদের সাধারণ সংখ্যা। বড়ো বড়ো শহরে মেয়রও বেতন-ভুক গণসেবক। কাউন্সিলম্যানরাও। ছোট শহরে তা সম্ভব নয়। তাই বাইরের উপার্জনে তাঁরা নির্ভরশীল। অনেক পৌরসভায় কাউন্সিল সভা পরিচালনা থেকে মেয়র মুক্ত। সে সব ক্ষেত্রে নির্বাচিত সভাপতির ওপর সে দায়িত্ব।

কাউন্সিলম্যানদের কার্যকাল মেয়রেরই মতো সাধারণত। জনস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, নৈতিকমান সম্পর্কে বিধিবিধান রচনা। জরুরী প্রয়োজনে অর্ডিন্যান্স জারী। কাউন্সিলের বিশেষ উল্লেখ্য এ সব কার্যাবলী। নগর উন্নয়নের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখাও কাউন্সিলম্যানদের বিশেষ দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে গাফিলতি সাধারণত অকল্পনীয়। সব শহরই তাই এক একটি স্বপ্নপুরী। কাউন্সিলের গুরুত্ব যেখানে বেশি, কাউন্সিলম্যানদের কাজও সেখানে তেমনি অধিক।

পৌর শাসনে মোটামুটি এই মেয়র কাউন্সিল প্রণালীর পরিচয়। এ ব্যবস্থাই আমেরিকায় সর্বাধিক চালু। কমিশন ব্যবস্থাও চালু অনেক শহরে। এতেও অবশ্য মেয়রই প্রধান পৌরপতি। তবে তিনিও কমিশনারদের মধ্যে থেকেই নির্বাচিত।

কমিশন প্রণালী প্রবর্তনের কাহিনীটি জানার মতো। যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম রাজ্য টেক্সাস। প্রাকৃতিক সম্পদেও সর্বাধিক সমৃদ্ধ। তা বলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে নিষ্কৃতি নেই তার। টেক্সাসেরই একটি শহর গালভেষ্টন।

বিংশ শতাব্দীর পরিক্রমা মুখে এ শহরের চরম বিপদ। প্রচণ্ড ঝড়। মেক্সিকো উপসাগরের ক্ষিপ্ত রূপ। প্লাবিত গালভেষ্টন। ধন-প্রাণের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি। নগর-জীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক মিলে নগর রক্ষার জরুরী পরিকল্পনা রচনা। রাজ্য আইনসভায় সে পরিকল্পনা পেশ। সঙ্গে সঙ্গে সে প্রস্তাব গ্রহণ। মেয়র-কাউন্সিল পরিচালিত নগর-শাসন ব্যবস্থা সাময়িকভাবে বাতিল। আর তারই স্থলে পাঁচজনের এক নগর কমিশন গঠন। এ যেন অনেকটা আমাদের পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থার মতো। পাঁচজন সৎ-বুদ্ধি শিল্পপতির হাতে নগর রক্ষার ভার। এক একটি বিভাগের কর্তৃত্ব এক একজনের হাতে। তাঁদের আন্তরিক চেষ্টায় দ্রুত ফিরে আসে শহরের স্বাভাবিক অবস্থা। এ সাফল্যে গালভেষ্টনে কমিশন প্রণালী পাকাপাকি। ক্রমে ক্রমে সারা রাজ্যে এর জনপ্রিয়তা। এমনকি টেক্সাসের বাইরেও কোন কোন পৌরসভায় এই ব্যবস্থা চালু। কমিশনের সদস্য সংখ্যা সাধারণত তিন থেকে সাতের মধ্যে। তাঁদের স্থায়িত্ব কোথাও দুবছর, কোথাও চার।

জনপ্রিয়তায় অবশ্য তৃতীয় প্রণালীরই দ্বিতীয় স্থান। তাকে বলা হয় কাউন্সিল-ম্যানেজার প্রথা। এও আর এক বন্যা বিপর্যয়ের ফল। ১৯১৪ সনের কথা। ওহাইও রাজ্যে ভীষণ প্লাবন। ডেটন শহর ডুবুডুবু। এ অবস্থায় অভিনব এক নগর-শাসন ব্যবস্থার উদ্ভাবন ডেটনে। মেয়র-কাউন্সিল ও কমিশন প্রণালীর এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। কমিশনের মতোই পাঁচজনের কাউন্সিলের হাতে নগর-রক্ষার দায়িত্ব। নাগরিকরা সব নিশ্চিন্ত। কিন্তু সহযোগিতায় সদা প্রস্তুত। এমনি করে সে যাত্রা ডেটনের বিপদ মুক্তি। তারই ফলে ডেটনকে অনুসরণে নানা জায়গায় তোড়-জোড়। হাজারেরও বেশি শহরে আজ তাই কাউন্সিল-ম্যানেজার শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত।

প্রথম দুটি প্রণালীর যা কিছু ভালো তা নিয়ে এই নতুন ব্যবস্থা। অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই এতে। কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত রূপায়ণের দায়িত্ব তাঁদেরই নিযুক্ত ম্যানেজারের ওপর। সে দায়িত্ব পালনে ম্যানেজারের পূর্ণ স্বাধীনতা। কাউন্সিল সভায় অংশ গ্রহণেও তিনি অধিকারী। তবে ভোটাধিকারে তিনি বঞ্চিত। ম্যানেজার আসলে পৌরসভার প্রধান কর্মকর্তা। কাউন্সিলম্যানদের তাই কাজ হাল্‌কা। নগর উন্নয়নে নতুন নতুন পরিকল্পনা চিন্তার অনেক সময় তাঁদের। নতুন নতুন অনেক

ব্যবস্থাপনার। আমেরিকার নগর-জীবন তাই এতো সুন্দর। এতো সুখকর। সবার আনন্দে আনন্দমুখর।

আর আমাদের কোলকাতা? কজনের আনন্দ-মেলা সে মহানগরী? দিনের কর্ম-ক্লান্তি শেষে সায়াহ্ন-সুখ আহরণের কোথায় কতোটুকু ব্যবস্থা সেখানে? বস্তীর অন্ধকারক্লিষ্ট জীবন-বিষণ্ণতা। তা মোচনেরই বা প্রয়াস কোথায়? শ্রীহীন-দীনতায় রাজপথের অঙ্গে অঙ্গে লজ্জা-ছাপ। রাজপথ নামে সে যেন এক একটি ব্যঙ্গ কবিতা। কোলকাতা পৌরসভার এক একটি বিতর্কের কথা মনে পড়ে। আমরা তর্কে মাতি। এরা কাজে মাতোয়ারা। আমাদের পৌরসভাগুলো কবে সত্যিকারের কর্মসভার রূপ নেবে তাই ভাবি।

নগর কল্যাণে এদেশে নতুন নতুন প্রচেষ্টা। তা নিয়ে কতো রকম প্রশ্ন, কতো আলোচনা। কতো পুস্তিকা, কতো ইস্তাহার। সে সব শুনে সে সব পড়ে নতুন জ্ঞানলাভ।

কিন্তু এবার ওঠা দরকার। ছটায় আবার দাস দম্পতির আসার কথা। একটু আগে থেকে তৈরি থাকবো, সেই ভালো। ভাবতে ভাবতেই সভাও শেষ।

বারে, বাইরে রাজধানীর বৃষ্টি-স্নান! আহা, এ বর্ষণে কী প্রাণারাম! কোলকাতায়ও কি এখন এমনি বৃষ্টি? এমনি জোরে? এতোক্ষণ ধরে? তাহলে আমার শহরের যে এতোক্ষণে কি অবস্থা তা ভাবতে ভয়। অথচ স্নানান্তে রাজধানী এখানে কী যে অপরূপ!

হোটেলে ফিরেই ডাঃ সেনের খোঁজ! তিনি হোটেলে আগে থেকেই। আহারান্তে শয্যাসুখের আনন্দভোগ। বৈকালী স্নান সেরে নতুন সজ্জায় আমি ফিটফাট। ডাঃ সেনের ঘরে গিয়ে খানিক আড্ডা।

ছটা বাজে বাজে। আমরা লাউঞ্জে। যথাসময়ে সস্ত্রীক ডাঃ দাসের উপস্থিতি। দুই ডক্টরে প্রথম পরিচয়। পরিচয় বিনিময়ের পর থেকেই সেই পুরোনো গল্প। দাস দম্পতির বক্তৃতার আমরা শ্রোতা। সেদিন ছিলাম আমি একা। আজ আমরা দুজন। শেষ জীবনে দেশের মাটিতে ফিরে আসার জন্যে ডাঃ দাসের কী আকুতি! তার সুযোগ না পাওয়ায় দেশের মানুষের বিরুদ্ধে স্তূপীকৃত অভিযোগ। শুধু অভিযোগ নয়, পুঞ্জীভূত অভিমান। কিভাবে এর প্রতিকার সম্ভব?

হঠাৎ অরুণের ফোন। আমার জন্য কি এক বিশেষ বার্তা। আমার অনুপস্থিতেতে প্রথমবারে কল্ ব্যর্থ তার। ঘরে ফিরেই পেয়েছি সে সংবাদ। কী এমন কথা ?

ও, ভয়েস অব আমেরিকায় কাল একটা ইণ্টারভ্যু। বেশ, কাল অফিসে যাবার পথে এসো একবার। তখনই সময় ঠিক করে নেয়া যাবে।—অল্প কথায় কথা শেষ। শুধু এ সঙ্গে ডাঃ সেনের আসার খবরটা জানাই অরুণকে।

একটু পরেই দাস দম্পতি বিদায়। আমরাও বেরোই। অনিশ্চিত পথে পদচারণা। হঠাৎ একটা জরুরী কথা ডাঃ সেনের। একটা কাজের কথা।

তৃতীয় আর চতুর্থ চোখের অভাবে আমি দৃষ্টিহীন। আপনি থাকতে থাকতেই এর একটা ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে।

কেন, কি হলো আবার ? চশমা হারিয়ে ফেলেছেন বুঝি !

না, হারাইনি। তবে ভাঙা ফ্রেমের চশমা পরে চলতে ভয়। পথে কোথায় কিভাবে ঘটে গেছে এই দুর্ঘটনা।

কালকের মধ্যাহ্ন কর্মসূচীর এ প্রধান কাজ। ডাঃ সেনের সঙ্গে কথা পাকা। সকালে পলিটিক্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশনের সভার কথা তুলি। সে খবর দেখি তাঁরও জানা। সকাল সাড়ে নটায় ভারত-আলোচনায় তাঁরও আমন্ত্রণ। সেখানে বলার দায়িত্ব তাঁর ওপর চাপিয়ে আমি নিশ্চিন্ত।

নৈশাহার সেরে ঘরে ফিরতে রাত দশটা। আমাদের পক্ষে এই স্বাভাবিক। কিন্তু এদেশে রাত নিয়ে কেইবা মাথা ঘামায় ?

সংখ্যাতত্ত্বের দেশ

এ কয়দিনের মধ্যে বহু বইপত্র টেবিলে জমা। কিছু কেনা, বেশির ভাগই উপহার। উপহারের বই অধিকাংশই তথ্যমূলক।

সংখ্যাতত্ত্বের দেশ আমেরিকা। প্রতি শিায়ে সংখ্যাতাত্ত্বিক গবেষণা। আর কথায় কথায় অন্যান্য দেশের সঙ্গে নিজেদের অগ্রগতির তুলনা। বিশেষ করে রাশিয়ার সঙ্গে। দৌড় পাল্লায় আর সবাই যে কতো পেছনে তার হিসেব।

তেমনি একখানা ছোট্ট বইয়ে মনোনিবেশ। সংখ্যাতত্ত্বের গহন অরণ্য। ওতে আমার বড্ড ভয়। বই পড়ে দেশ জানতে যাওয়ার বিড়ম্বনা। তবু তারই একটি বিশেষ অংশে বিশেষ করে দৃষ্টিপাত।

পাঁচ কোটি পরিবার আমেরিকায়। আড়াই কোটির বেশি পরিবারের নিজস্ব বসত-বাটি। সারা দেশে সাড়ে পাঁচ কোটির মতো মোটরগাড়ি। তিন কোটির বেশি টেলিভিশন। সাড়ে বারো কোটি রেডিও সেট। টেলিফোনও পরিবার পিছু একটির বেশি।

সারা বইখানিতে এমনি হিসেবের ছড়াছড়ি। অংকের গ্রহ-উপগ্রহময় যেন একখানি বিরাট আকাশ। সে আকাশ পরিক্রমা শেষ। দৃষ্টি-সূর্য অস্তাচলে। দুচোখ যেন ঘুমে অবশ।

সকাল বেলা আমার প্রস্তুতির আগেই অরুণ হাজির। কি আবার ইণ্টারভ্যু, জানতে চাই। শ্রম-মূল্য কিছু আছে কি-না তার জন্যে, সেও প্রশ্ন। সরকারী বরাদ্দ অর্থে টান টান। কিছু উপার্জনে সাচ্ছন্দ্য সম্ভব। কিন্তু অরুণের উত্তরে নিরাশ সেদিকে।

আমি সরকারী অতিথি। সরকারী বরাদ্দ রয়েছে আমার জন্যে। ভয়েস অব আমেরিকা সরকারী প্রতিষ্ঠান। সেখান থেকে দক্ষিণা প্রাপ্তিতে তাই বাধা।

সাধারণ কয়টি প্রশ্নের কথা বল্লে অরুণ। তার উত্তরের জন্যে কিছু ভাবনা নেই। বেলা দেড়টায় সময় ঠিক। কথা পাকা করে অরুণ উঠি উঠি।

টেলিফোন হঠাৎ কলমুখর। ডাঃ সেনের তাড়া।

কি, তৈরি? আমি নিচে নামছি। আপনি আসুন। —আমরাও লবীতে পৌঁছি ডাঃ সেনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। অরুণের কথা ডাঃ সেনকে আগেই বলা। এবার পরিচয়।

অরুণ অফিসযাত্রী। আমরা রেস্তোরাঁয়। সেখান থেকে হোটেল ষ্ট্যাটলারে। আমেরিকান পলিটিক্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মেলনের কুড়ি নম্বর প্যানেলের বৈঠকে এখানে। এ বৈঠকে ভারত প্রসংগ আলোচনা। একটু আগে আসায় প্রধান বক্তা প্রফেসার মেরিল আর গুডলের সঙ্গে আলাপের সুযোগ।

সত্যি সব সুন্দর সাদা-সিধে মানুষ অধ্যাপক গুডল। তাঁর সঙ্গে মনখোলা কথা-বার্তায় প্রাণতৃপ্তি। তাঁর বক্তৃতা শুনে আরো মুগ্ধ। এ যেন কোন ভারতীয় অধ্যাপকের মুখে ভারত বিষয়ের বিশ্লেষণ।

আধুনিক ভারতে শাসন-কার্য পরিচালনা। অধ্যাপক গুডলের বক্তৃতার বিষয়। পাশ্চাত্য প্রভাবের উল্লেখ। সে প্রভাব অগভীর। সাংস্কৃতিক পার্থক্য তার মূল কারণ। জাতীয়তা বোধ সে পথে আর এক বাধা। সারা এশিয়ায় আজ জাতীয়তার পূর্ণ জোয়ার। নেতাদের মনেও তার গভীর রেখাপাত। পাশ্চাত্য রাজনীতির প্রতি সহজাত আপত্তি। পাশ্চাত্য আদর্শ পুরোপুরি গ্রহণ তাই অসম্ভব। আধুনিক ভারতের কর্ম ও চিন্তাধারার পরিচয় গুডলের কথায়।

কয়েক বছর ভারতে ছিলেন অধ্যাপক গুডলে। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত ছিলেন তিনি অধ্যাপনায়। সেই সূত্রে উত্তর প্রদেশের শাসন কার্য সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ জ্ঞান। তারই ছাপ তাঁর বক্তৃতায়। "The brahmanical tradition of leadership and governance is as varied as it is rich ; no single clearly defined concept of leadership and rule is easily extracted. Traditional Indian concepts have been drawn upon by a wide range of contemporary political leaders in an effort to advance particular programs. Hindu literature has been invoked by marxians and gandhians."

অনেকাংশে সত্যি। ভারতীয় নেতৃত্বের আদর্শে প্রাচীন ধারার

অনুবর্তন। যুগধর্মের প্রয়োজনে যা কিছু যোগ-বিয়োগ। কিন্তু আসল রূপ ঐতিহ্যগত।

কি সেই রূপ? অধ্যাপক গুডলের ব্যাখ্যায় অভিনবত্ব। ভারতীয় সমাজ সংগঠনে কর্তব্যানুযায়ী শ্রেণী বিভাগ। উনিশশো পঞ্চাশে ক, খ, গ, ঘ এই চার শ্রেণীর রাজ্য বিভাগে তার ছায়া। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগীয় কর্তৃত্বেও ব্রাহ্মণ্যবাদের শ্রেষ্ঠত্ব ছাপ। এমনি সব সমালোচনা। পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থার যুক্তি-বিচার। পঞ্চায়েতী শাসনে গ্রাম্য দলা-দলির উল্লেখ। ঐতিহ্যের প্রতি অন্ধ-বিশ্বাসের অভিযোগ। গ্রামীণ ভারতে সুস্থ পরিবর্তন আসতে তাই বিলম্ব। তবুও বক্তা নিরাশ নন। "Ultimately, it may be likely that secret elections, in contrast to the now fairly general show of hands, will spark a greater democratic potential in the old village structure".—এ আশা সত্যিকার একজন ভারত-প্রেমিকের।

ভারত বিষয়ে অজ্ঞ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ। সাধারণত আমাদের এই ধারণা। সাধারণভাবে একথা অনেকখানি সত্যিও বটে। কিন্তু ভারত-বিশেষজ্ঞও অনেক আছেন আমেরিকায়। তেমনি একজন এই অধ্যাপক গুডলে।

ডাঃ সেন আর ডাঃ সুন্দরম্ বক্তা ভারতের পক্ষ থেকে। ডাঃ সেনের বক্তৃতায় পঞ্চায়েতী শাসন ব্যবস্থার যুক্তি বিশ্লেষণ। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ডাঃ সুন্দরমের ভাষণে। তারপর নানা প্রশ্নোত্তর। তারপর সভা ভংগ।

ফিরতি পথে একটা কাজ সারি। ইন্টারন্যাশনাল সেণ্টারে যাই। সবার সঙ্গে বিদায় সাক্ষাৎ। আমায় দেখে মিসেস্ জুডিথ রাসেল খুব খুশি।

আমার দেশের কিছু চিহ্ন রেখে যাবার ইচ্ছে সেণ্টারে। 'মা ও ছেলে' যামিনীদার বিখ্যাত ছবি। তারই একখানা চমৎকার ফটো আমার কাছে। তাই তুলে দিই মিসেস্ রাসেলের হাতে। সেই ছবির দিকে তাঁর দৃষ্টি স্থির। আবেগ চঞ্চল মাতৃহৃদয়। আমায় নিয়ে গেলেন ওপরের অফিসে। সেখানে এক একজনের এক এক জিজ্ঞাসা।

প্রথম যাচ্ছেন কোথায় এখান থেকে? —একজনের প্রশ্ন।

নিউইয়র্ক। —এ উত্তরের সঙ্গে সঙ্গেই গান শুরু ভদ্রমহিলার। তাঁর সুরে সুর মেলান আরো কজন। সঙ্গে সঙ্গে একটু নাচের মহড়া। সে গানের মর্ম,

সে নাচের অর্থ ভারি চমৎকার। নিউইয়র্কবাসিনী এঁরা। নিউইয়র্কের প্রিয়জনদের কথা সর্বক্ষণই এঁদের ভাবনায়। আমি যেন তাঁদের গিয়ে একথা জানাই।

কালিদাস এবার আমার স্মরণ-পথে। এ কালের মেঘদূতের ভূমিকায় আমি।

হোটেলে আমার জন্যে ডাঃ সেনের অপেক্ষা। দুজনে মিলে যাই চশমার দোকানে। সাড়ে এগারো ডলারে একটি ফ্রেম কিনে তবে সোয়াস্তি। ডাঃ সেন আবার চক্ষুষ্মান।

খাওয়া সেরেই আমি ভয়েস অব আমেরিকায়। ডাঃ সেন গভর্ণমেণ্টাল এ্যাফেয়ার্স ইন্সটিট্যুটে। ভয়েস অব আমেরিকায় আমার ইণ্টারভ্যু ঠিক তিনটায়। তার আগে ভারতীয় বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায়গ্রহণ। ডাঃ স্ট্যালনি ঘোষের সঙ্গে ভারতীয় বিভাগের বেতার-সূচীর উন্নতি নিয়ে আলোচনা। তারপর ষ্টুডিওতে আমি অরুণের সঙ্গী। অরুণই প্রশ্নকর্তা। আমি উত্তরদাতা।

দুসপ্তাহ হলো আপনি এসেছেন এদেশে। কেমন লাগছে আপনার এদেশকে, এদেশের লোকজনদের ?—বেতারে আমাকে পরিচিত করিয়ে দেবার পর প্রথম প্রশ্ন। এ প্রশ্নের সহজ সরল স্বাভাবিক উত্তর। বিভিন্ন লোকের মুখে বিভিন্ন রকম এর উত্তর হওয়া বোধ হয় অসম্ভব।

কেন বলি। প্রাকৃতিক সম্পদে অপূর্ব আমেরিকা। পার্থিব ঐশ্বর্যেও অতুলনীয়। চতুর্দিকে সুখ-সাচ্ছন্দ্য আর আনন্দ। সে দেশ ভালো না লেগে পারে কখনো ? আর এদেশের লোকের কথা। তাঁরা সহৃদয়। তাঁরা সহজ বন্ধু। আতিথেয়তায় অনন্য ও আন্তরিক। ভালো লাগবে না তাঁদের ? তবে সাধারণ মানুষ বোধ হয় ভালো পৃথিবীর সবখানেই।

আপনি সাংবাদিক। এদেশের সংবাদপত্র সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা ?—দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা। সে ধারণা আমার অসম্পূর্ণ। উত্তরও তেমনি। এ দেশের বিভিন্ন রাজ্যের পত্র-পত্রিকা ও তাদের কার্যপদ্ধতি দেখায় আমার আগ্রহ। তার আগে বিস্তারিত বলা অসমীচীন। তবে নিউইয়র্ক টাইমস, ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর ও ওয়াশিংটন পোষ্ট প্রভৃতি যে সংবাদপত্র জগতের গৌরব সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কিন্তু এ সব সেরা সেরা কাগজেও পৃথিবীর অন্যান্য

প্রান্তের সংবাদের অভাব। এশীয় সংবাদ বিশেষভাবে উপেক্ষিত। চাঞ্চল্য সৃষ্টি করার দিকে অধিকাংশ মার্কিণ পত্র-পত্রিকারই যেন একটা স্বাভাবিক ঝোঁক। প্রশ্নোত্তরে এ সব বিষয়ে সমালোচনা।

আরো কয়েকটি প্রসংগের পর আলোচনা শেষ। তারপরেও কতোক্ষণ ধরে অফিসে বসে কথাবার্তা। চারটে পনেরোয় গভর্ণমেণ্টাল এ্যাফেয়ার্সে এপয়েণ্টমেণ্ট। আমার ট্যুর প্রোগ্রাম, টিকিট-পত্র সবই আজ নেবার কথা। চারটে যে বাজে বাজে।

নেমে আসার পথে যাই একবার ভয়েস অব আমেরিকার কণ্ট্রোল রুমে। একটি কাঁচের ঘরে একজন মাত্র মহিলা কর্মী। সে ঘরে নানা দেশের সময় নির্দেশ। নানা ঘড়িতে চোখ ঘুর ঘুর। এখানে এখন বিকেল চারটে। আমার দেশে গভীর রাত। রাত তিনটে। কোলকাতায় এখন সবাই ঘুমে।

মনের দিগন্তে লঘুপক্ষ গাঙচিলের ছুটোছুটি।

ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এভিন্যু থেকে সোজা ম্যাসাচুসেটস্ এভিন্যু। ভয়েস অব আমেরিকা থেকে গভর্ণমেণ্টাল এ্যাফেয়ার্স ইন্সটিট্যুট। কিন্তু ক্যাবে সে আর কতোক্ষণ? ঐটুকু সময়ের মধ্যেই কল্পনায় যেন বিশ্বদর্শন।

ইন্সটিট্যুটে ঢুকতেই ফুল-খুশি। রিসেপশনিস্ট তরুণীর স্বভাব-সুন্দর হাসির অভ্যর্থনা। সসম্ভ্রম নিবেদন—মিঃ লিণ্ডে অপেক্ষা করছেন আপনার জন্যে।

ফোনে খবর পেয়েই মিঃ লিণ্ডের আবির্ভাব। আমার যাবতীয় কাগজপত্র নিয়ে তিনি প্রস্তুত। নিজের অফিস ঘরে আমায় নিয়ে ঢুকে সহকারিণীকে আহ্বান। আমার কর্মসূচী ভালো করে বুঝিয়ে দেবার ভার তাঁর ওপর। আর একটি কি কাজে মিঃ লিণ্ডের ব্যস্ততা।

আমরা আর এক ঘরে। কিন্তু কিইবা এমন বিশেষভাবে বুঝে নেবার? অতি চমৎকার ব্যবস্থা। টাইপ করা পরিচ্ছন্ন সফরসূচী। আমার জন্যে তার তিন কপি। একখানা কপি নিয়ে পাতা ওল্টাই একের পর এক। বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র জুড়ে বিস্তৃত বিচরণ। সম্ভব হয়ে উঠবে তো সমগ্র সূচী অনুসরণ? মন দরিয়ায় চিন্তার ঢেউ।

সূচী অনুযায়ী যাতায়াতের টিকিট ব্যবস্থা। সবকিছু সাজানো গোছানো। কোথাও প্লেনের টিকিট, কোথাও ট্রেনের। তবে আকাশপথেই বেশি চলাচল।

তা নইলে যে অনেক সময়হানি। তুরকমের টিকিট বই। আমার হাতে তা তুলে দিয়ে লিণ্ডে-সহকারিণীর একটু মিষ্টি হাসি। সে হাসির মধ্যে দিয়ে একটি সতর্কবাণী। টিকিট বই তুখানা খুব সাবধানে রাখার পরামর্শ।

আর একটি বিষয়ের দিকেও আমার দৃষ্ট আকর্ষণ। সফরসূচীর শেষাংশে সময় সম্পর্কে লিখিত হুঁসিয়ারি। তুধরনের সময় নির্দেশ আমেরিকায়। আমাদের দেশের স্ট্যাণ্ডার্ড আর লোক্যাল সময় ব্যবস্থার মতো। ভারতে তা এখন অতীত কথা। কিন্তু এদেশে তা আজও সচল। সমগোত্র হলেও নামে কিঞ্চিৎ পার্থক্য। এদেশে স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম আর ডে লাইট সেভিং টাইম। স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম ডে লাইট টাইমের এক ঘণ্টা আগে আগে। এদেশের অনেক অঞ্চলে ডে লাইট টাইম অনুযায়ী সব কাজ কর্ম। ট্রেন চলাচল কিন্তু সারা দেশ জুড়েই স্ট্যাণ্ডার্ড টাইমে। বিমান চলাচল আবার স্থানীয় সময় অনুসারে। স্থানীয় সময় ও ডে লাইট টাইমে অনেকক্ষেত্রেই গোলমাল। অথচ সময়ের একটু এদিক ওদিক হলে পথ-পিছল। সে বিভ্রাট সম্পর্কে সতর্কতা প্রয়োজন। সফরসূচীতে এমনি নানারকমের আরো উপদেশ।

আবহাওয়ার অবস্থা বুঝে প্লেনের টাইমেরও খুব অদল-বদল হয় কিন্তু। হোটেল থেকে বেরোবার আগে সব সময়ই প্লেন ছাড়বার টাইম জেনে নিতে ভুল করবেন না যেন। হঁ্যা, আর একটা কথা, কোথাও কোন অসুবিধে হলেই সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠাবেন আমাদের। জরুরী হলে টেলিফোন করবেন কিংবা টেলিগ্রাম। —বিদায় দেবার আগে মিঃ লিণ্ডের সুপরামর্শ। এ যেন দূরপথযাত্রী ভাই-এর প্রতি ভাই-এর কথা।

গভর্ণমেণ্টাল এ্যাফেয়ার্স ইন্সটিট্যুটে থেকে মিঃ নিডহ্যামের বাড়িতে। রাজধানী ছাড়ার আগে একবার দেখা করার জন্যে তাঁর অনুরোধ। নিডহ্যামের এপার্টমেণ্টে কোলকাতার রুচিশীল উচ্চ মধ্যবিত্তের পরিবেশ। সেখানে বসে আড্ডা জমাতে বেশ মজা। ভারতীয় চিত্রকলা এবং আরো নানা শিল্প-সম্ভারের সমাবেশ তাঁর ঘরে। আমার দেওয়া একখানা ছবি উপহারও রেখে যাবো এখানে এই ইচ্ছে।

শিল্পী মহীতোষ বিশ্বাসের আঁকা একখানি পটের ছবি রয়েছে আমার সঙ্গে। রাধাকৃষ্ণের একখানি অতি মনোরম ছবি। রঙ্-তুলিতে মনের মাধুরিমার অপূর্ব বিন্যাস। এ ছবির যেন এই যোগ্য স্থান। নিডহ্যামের হাতে তুলে

দিতেই চোখে তাঁর আনন্দ ঝর্‌ঝর্‌। ছবির জন্যে স্থান নির্বাচনে সেই থেকেই তাঁর চিন্তা-ভিড়।

শ্রীমহীতোষ পটচিত্রী। তাঁর ছবিতে যামিনীদার চিত্রের আদল খানিক। ঘরের ভাষায় এখানে শিল্পীর মনের কথা। পরের ভাষায় কথা বলা নয় অসম্ভব। তবে মনের কথা তাতে থেকে যায় যেন অনেক দূর। একালে অনেক শিল্পীরই অনুকরণে মত্ত মন। তার ভালোমন্দ তাঁদেরই জানা। আমার প্রশ্ন সহজ সরল। ঘরের কথা পরের ঢঙে বলতে গিয়ে তৃপ্তি কোথায়? সে কথা থাক।

আমার কার্যক্রম দেখে নিডহ্যামের সন্তোষ। তবে তা নিয়ে আলোচনার অবসর কম। সময়ের সঞ্চয় যে সীমাবদ্ধ। এখুনি আমার ওঠা দরকার। হোটেলে ফিরে অনেক কাজ। বিদেশ বিভূঁইয়ে একক চলায় মহা ঝামেলা। বিশেষ করে চির-অগোছাল আনাড়ির পক্ষে। গোছগাছ করার দায় সে এক দুশ্চিন্তার ব্যাপার।

আজকের বৈঠক তাই অল্পেই শেষ। চা পান শেষে বিদায় নেবার আগে নিডহ্যামের অভিনন্দন।

ফিরে আসুন সারা আমেরিকা ঘুরে। আবার দেখা হবে। গল্পে শুনবো আপনার অভিজ্ঞতা। নিজের দেশ এমনিভাবে দেখার আমারও সৌভাগ্য হয়নি এতোদিনে। কাজেই আপনার কাছ থেকে গল্প শোনার এতো সখ। —করমর্দনের সঙ্গে মিঃ নিডহ্যামের উষ্ণ শুভেচ্ছা।

বাইরে সন্ধ্যা রাত। আলোর সমুদ্রে আনন্দ ঢেউ। আকাশে অজস্র তারার ঝিকিমিকি। এতো আলোর মধ্যেও আমি যেন অদৃশ্য। পায়ে পায়েই খানিক এগুই। ডু পণ্ট সার্কেলের কাছে এসে ক্যাবে চাপি। এখান থেকে আমার হোটেল মিনিট আটেক।

অর্ধেকের বেশি মালপত্রই রেখে যেতে হবে ওয়াশিংটনে। বিনা খরচায় চল্লিশ পাউণ্ড পর্যন্ত সঙ্গে নিয়ে ঘোরার অনুমতি। আমেরিকার আকাশপথে এই নিয়ম। তারও কম নিয়ে বেরোনো সংগত। পথে পথে জমবে বোঝা, জানাই কথা। তেমনি ভাবেই যা কিছু সব দুইভাগে ভাগ। এক সুটকেশ আর দুই ব্যাগ আমার সফর-সঙ্গী। শ্রীমান অরুণ বাকি সব কিছুর জিম্মাদার।

সারাদিন ধরে ঘোরাঘুরি। তারপর এতো কাজে পরিশ্রান্ত। কাল সকালেও হাতে কিছু সময়। যথেষ্ট তাই। এবার দেহ চায় শয়ন আরাম। কিন্তু শুয়েও যে ঘুম নেই, এই বিপদ।

বাতি-নেভানো হোটেল ঘর। পাত্‌লা অন্ধকারে অতীত-ভবিষ্যতের ছায়া-মিছিল। চোখের পাতায় রকম রকম ছবির নাচানাচি। অদ্ভুত অদ্ভুত সে সব ছবি। এ যেন টি এস এলিয়টের সেই The Hollow Men-এর মতো ব্যাপার।

> Shape without form, shade without colour,
>
> Paralysed force, gesture without motion ;—

তারই মধ্যে হঠাৎ কখন ঘুমের যবনিকা। সে ঘুম ভাঙে যখন, তখন ভোর। সকালের রৌদ্র-মসৃণ ওয়াশিংটন তখন স্বচ্ছরূপা। স্মরণে তার মর্ম-মুখর মধুস্মৃতি। নতুনকে দেখার আনন্দ লোভ। বিরল অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য সঞ্চয়। সে সঞ্চয়ের আশা মন জুড়ে।

আমেরিকার আত্মার সন্ধানে

আজকের সকালের কেমন একটা অদ্ভুত আকর্ষণ। 'আমেরিকার আত্মার সন্ধানে আজ থেকে আমার সফর শুরু। হয়তো তারই জন্যে অনুভবে অপূর্ব শিহরণ।

ডাঃ সেনের সঙ্গে প্রাতরাশ। এবারকার মতো ওয়াশিংটনে শেষ খানা। ফিরে এসেই দেখি অরুণ হাজির। ওকে নিয়েই বাঁধাই-ছাদাই-এর পর্ব শেষ। কম নয় বড়ো লটবহর। কি আর করা।

হোটেল গেটে গাড়ি তৈরি। হোটেলের দেনা-পাওনা মিটিয়ে আমিও প্রস্তুত। ডাঃ সেনকে একা ফেলে যেতে মন যেন কেমন কেমন। আবার কোথাও না কোথাও দেখা হবে এই আশা।

ক্যাব ইউনিয়ন স্টেশনে। অরুণ সঙ্গী আমার। বিদায় নেবে বলে বিদায় দিতে আসা। ট্রেন এগারোটায়। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা বাকি আরো। ডুপ্লিকেট শ্লিপ দিয়ে মাল নিয়ে পোর্টার উধাও। হাতও খালি। সময়ও বেশ হাতে। ঘুরে ফিরেই দেখি খানিক।

সামনেই কলম্বাস মেমোরিয়াল ফাউণ্টেন। 'নতুন পৃথিবী'র আবিষ্কারক ক্রিষ্টোফার কলম্বাসের প্রতি এদেশের লোকের গভীর শ্রদ্ধা। তাঁর প্রতিমূর্তি তাঁর স্মৃতিসৌধ শহরে শহরে। আমেরিকায় প্রায় গোটা ত্রিশ নাকি এমনি কলম্বাস স্মরণী। তার চেয়েও বড়ো কথা, আট দশটি রাজ্যে একটি করে শহরও রয়েছে তাঁর নামে। ওহাইও রাজ্যের রাজধানী শহর কলম্বাস। একজন আমেরিকান সহযাত্রীর সঙ্গে আলাপে এমনি সব তথ্যলাভ। সিটি পোস্ট অফিসের সুন্দর সৌধ কলম্বাস ফোয়ারার এক পাশে।

বিরাট এই ইউনিয়ন স্টেশন। শাদা গ্রানাইট পাথরে তৈরি শক্তদেহ প্রকাণ্ড প্রাসাদ। মার্কিণ রাজধানীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আগমন-নির্গমন পথ। স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষ দর্শনীয় এখানে। মূল প্রবেশ পথে ছয়টি বিপুলায়তন সুদর্শন স্তম্ভ। তার প্রত্যেকটির মাথায় একটি করে রূপক মূর্তি। অগ্নি,

বিদ্যুৎ, কৃষি, যন্ত্রশিল্প, স্বাধীনতা এবং কল্পনা-শক্তি। এক একটি স্তম্ভ-মূর্তি এদের এক একটির প্রতিরূপ। স্টেশন ভবনে ষাট একরব্যাপী সুদৃশ্য চত্বর। এক কোটি ডলার ব্যয়ে তার সজ্জাবিধান। চোখ-জুড়োনো নানা দৃশ্যের চিত্রায়ন চারদিকে। ঠিক মাঝখানে এক জলফোয়ারা রঙ্-বেরঙ্। অর্ধলক্ষাধিক লোকের জমায়েৎ স্থান এ স্টেশনের প্রধান যাত্রীমিলনাগার। সাড়ে সাতশো ফিটেরও বেশি দৈর্ঘ্য। মনে মনে মেলাই এই ইউনিয়ন স্টেশনকে আমাদের ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস আর হাওড়া স্টেশনের সঙ্গে।

সময় ফুরোয়। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি যথাস্থানে পোর্টার দাঁড়িয়ে। আমার মালপত্র ট্রেনে ঠিক জায়গায় মজুত। অধিকাংশ যাত্রীর জিনিসপত্রই নিজের নিজের হাতে হাতে। এদেশে তাই রেওয়াজ। পোর্টারের সাহায্য নেন খুব কম লোকে। তাও আবার বিশেষ প্রয়োজনে। আত্মনির্ভরশীলতার সৎ দৃষ্টান্ত। অরুণ পোর্টারের ঠেলায় আমার মাল তুলে দিলে কেন? মালবহনে আমায় অনভিজ্ঞ ও অশক্ত ভেবে। কিন্তু সে তার ভুল।

পাওনা পঁচিশ সেণ্টের সঙ্গে পাঁচ সেণ্ট বখ্‌শিস পেয়ে পোর্টার খুশি। ডুপ্লিকেট শ্লিপ চেয়ে নিয়ে সে অন্তর্ধান।

ঠিক এগারোটা। কাঁটায় কাঁটায় গাড়ি ষ্টার্ট। ওয়াশিংটন বিদায়!

পেনসিলভেনিয়া রেল রোড। সে পথ ধরে ওয়াশিংটন-ফিলাডেলফিয়া-নিউইয়র্ক ট্রেনে নিউইয়র্ক যাত্রা।

আমার পাশের আসনে এক নিগ্রো ভদ্রলোক। মধ্যবয়স্ক। সামনের আসনে তাঁর তরুণী স্ত্রী এবং একটি শিশু। ভদ্রলোক অত্যন্ত গুরু-গম্ভীর। শিশুটিকে শান্ত রাখতে মায়ের প্রাণান্ত চেষ্টা। রকম রকম খেলনাতেও তার বিরক্তি। স্বামী-স্ত্রী দুজনের চোখেমুখেও ক্লান্তি-চিহ্ন। অনেকক্ষণ পর একটি প্রশ্নোত্তরে কারণ সন্ধান। অনেক দূরপথের যাত্রী ওরা। দুদিন ধরে ওঁরা ট্রেনে ট্রেনে।

এদেশে ট্রেন সার্ভিস বেসরকারী। এক এক কোম্পানীর এক এক রকম বিধিব্যবস্থা। সাধারণত দুরকমের গাড়ি। কোচ আর পুলম্যান কার। রাত্রিতে শোবার পক্ষে পুলম্যান কারে ভারি সুব্যবস্থা। সে অভিজ্ঞতা আমার আরো পরের। পরেই হবে তা নিয়ে আলোচনা।

কোচে বসার কুশন অনেকটা প্লেনের মতো। অনেক গাড়িতে আবার

শিকাগো থেকে লস্ এঞ্জেলেসের পথে সাণ্টা ফি রেলরোড কোম্পানীর দোতলা ট্রেন

ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারির একটি কক্ষ

আসনগুলোকে ঘুরোনো চলে ইচ্ছে মতো। কাচবন্ধ সব জানলা। তার ওপর পর্দা। গাড়িগুলো সবই অনেক বেশি চওড়া আমাদের দেশের ট্রেনের চেয়ে। সারা ট্রেনে অবাধ চলাচলের ব্যবস্থা। এতে আত্ম-সংকোচন ভয় থেকে খানিক মুক্তি।

কামরার ভেতরে আমার ততোটা নেই খেয়াল। বাইরের দৃশ্যে মুগ্ধ মন। কী অপরূপ রূপচর্চা প্রকৃতি সুন্দরীর! মাঝে মাঝে আবার তাতে মানুষের হাতের কারিকুরি। এক একটি গ্রাম-নগরীর রূপলাবণ্যে চোখ ঝল্‌সায়।

বড়ো একটি নদী পেরিয়ে এবারডিন। এ যেন বিশ্বকর্মার আপন হাতে তৈরি এক নতুন স্বর্গ-শহর। কিন্তু এবারডিন এখানে? সে কিছু আশ্চর্য নয়। গোটা ইয়োরোপটাই তো আমেরিকার চারদিকে ছড়িয়ে। শুধু ইয়োরোপ কেন সারা পৃথিবীর লোক নিয়েই আজকের আমেরিকা। নানা দেশের নানা শহরের নাম তাই যুক্তরাষ্ট্রের এখানে ওখানে। সে দিক থেকে আমেরিকা যেন গোটা পৃথিবীর একটি ক্ষুদে সংস্করণ।

এবারডিন পেরিয়েই আবার আর একটি ছোট নদীর রূপোলী ধারা। দুই নদীর বাহুবেষ্টনে এবারডিন রসস্নিগ্ধ।

আমাদের ট্রেন এল্‌কটনে সাড়ে বারোয়। এও এক অনুপম পল্লী-শহর। স্নানান্তে সুসজ্জিতা এ যেন এক অপরূপ লাবণ্যময়ী তরুণী। মাঝে মাঝে বিচিত্র বনবীথি। শীতের রোদে চুল ছড়িয়ে বসে যেন আরাম ভোগ।

ট্রেন চলে। রেলপথের দুধারে যেন হেলানো মাটির আরাম-কেদারা। সবুজের বুকে হলুদ ফুলের ছড়ানো বিস্ময়। নীল দুপুরে অবাক রূপ-বিন্যাস। তারই মধ্যে ঝাঁক ঝাঁক মোটর গাড়ি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও যান্ত্রিক সভ্যতার অপূর্ব মিতালি।

দেখতে দেখতে একটা বড়ো স্টেশন। দেলেওয়ার রাজ্যের ওয়েলিংটন। বড়ো বড়ো অনেকগুলো ফ্যাক্টরি এখানে। বেশ কিছুক্ষণ পর আবার কর্ম-কোলাহল।

আর একটি স্টেশন। স্টেশনের গা ঘেঁষেই একের পর এক কারখানা। এ অনেকটা আমাদের বালী-বেলুড়-লিলুয়া পরিবেশ। তবে অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন। সুপরিকল্পিত বাড়ি ও বাগ-বাগিচার জন্যে অনেক বেশি দৃষ্টি সুন্দর। অদূরেই জন বার্টন হাই ইংলিশ স্কুল। এমনি একটি স্কুলের নাম

দেখে চমকে উঠি। এ যে আমাদের দেশের বিদ্যালয়ের মতোই একটি নাম!

এর পরেই জংশন স্টেশন ফিলাডেলফিয়া। ফিলাডেলফিয়ায় দুটি স্টেশন। এটি প্রথম স্টেশন। শহরের পশ্চিমে। এটিই বড়ো। আর একটি শহরের উত্তরে। সেটি ছোট। বেলা দেড়টায় ছেড়ে পাঁচ মিনিটেই প্রথম স্টেশন থেকে নর্থ স্টেশনে।

ঐতিহাসিক শহর ফিলাডেলফিয়া। কিছুদিন পরেই এ শহরে আমার আসার কথা। এখানে তিনদিনের কর্মসূচী।

ডাইনিং হলে বসে খেতে খেতে আমাদের ট্রেন ট্রেনটনে। নিউ জার্সি রাজ্যের একটি ছোট শহর ট্রেনটন। স্টেশনের গায়েই বেয়ার এসপেরিনের প্রকাণ্ড কারখানা। মাথা ধরার মুক্তি-বটিকা এখান থেকেই ছড়ায় বিশ্বময়?

পুরু কাচের জানালার ভেতর দিয়ে বিস্তীর্ণ মাঠের হাতছানি। আর একটু দূরে দূরে ঘন বনের নিবিড় মায়া।

ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে আসি পেট ভরপুর। ট্রেনে খাওয়ার খরচ কিন্তু বেশ বেশি। মোটামুটি খাওয়ায়ও অন্তত চার ডলার।

পথের নেশায় আচ্ছন্ন মন। নতুন অভিজ্ঞতায় মন মশগুল। নতুন বৈকি! হাওড়া-শেয়ালদার মতো স্টেশনে স্টেশনে নেই এখানে হুড়োহুড়ি। দরজার পা-দানিতে নেই বাদুড়-ঝোলার মতো যাত্রীদৃশ্য।

সেকথাই ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলি। আমার আসনের কাছে পৌছে একটু অবাক। আর একজন কে আমার সোফায় দিব্যি বসে। থাক্। এইতো এখানে একটি আসন এখনো খালি। পাশের সোফায় একজন রেলওয়ে চেকার। ইনিইতো টিকিট দেখে গেছেন খানিক আগে। এখানেই বসি। তাই ভালো। এদেশের ট্রেন সার্ভিস সম্বন্ধে কিছুটা জানার সুযোগ।

একের পর এক আমার প্রশ্নধারা। উত্তরও সঙ্গে সঙ্গেই। প্লেন, বাস ও মোটর গাড়ির সঙ্গে ট্রেনের প্রতিযোগিতার কথা ওঠে।

এ একটা বড়ো সমস্যা বটে, তবে এতে নৈরাশ্যের কারণ নেই কোন।—রেলকর্মীর আশাবাদ। উত্তরে তাঁর অনেক তথ্য। মার্কিণ রেলপথ পৃথিবীর বৃহত্তম। দৈর্ঘ্যে মোট দু লক্ষ চৌত্রিশ হাজার মাইল। গোটা পৃথিবীটাকে

নাকি বেড় দেওয়া চলে এক পাক। পরিবহনের প্রয়োজন মেটাতে আজও রেলপথ এদেশে অপরিহার্য।

রেলকর্মীদের সামনে অটোমেশন আর এক সমস্যা। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির ব্যাপক প্রসারে ব্যাপক ছাঁটাইয়ের আশংকা। অনেক কমে গিয়েও রেলকর্মী সংখ্যা এদেশে এখন প্রায় সাড়ে দশ লাখ। দু লাখ আড়াই লাখ অটোমেশনের বলি হবার সম্ভাবনা আগামী দশ বছরে। তার আর কি করা। যান্ত্রিক অগ্রগতির ওপর নির্ভর দেশের উন্নতি। তবে নতুন নতুন কাজের অভাব নেই আমেরিকায়। তাই এদেশের রেলকর্মীরা অনেকটা নির্ভয়।

এরপর মার্কিণ রেলপথের ক্রমোন্নতি নিয়ে আলোচনা। রেল-দুর্ঘটনার সংখ্যা হ্রাস রেলওয়ে দক্ষতার মুখ্য পরিচয়। বিরাট দেশ আমেরিকায় একটিও রেল-দুর্ঘটনা ঘটেনি ১৯৫২ সনে। চেকারের মুখে তার সগৌরব ঘোষণা। শ্রমিকদের বেতনও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি। যুদ্ধের আগে রেল-শ্রমিকের ঘণ্টাপ্রতি আয় ছিলো পৌণে এক ডলারের মতো। আজ সেখানে দু ডলার। এ ছাড়াও রেলকর্মীদের জন্যে নানা রকমের ভাতা ব্যবস্থা। নতুন নতুন অনেক সুযোগ-সুবিধে। দক্ষতা বৃদ্ধির তাই মূল কারণ। বলতে বলতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন বক্তা।

জানেন, দোতলা ট্রেন চালু হয়েছে আমাদের দেশে। সাণ্টা ফি রেল রোড কোম্পানীর বিশেষ ব্যবস্থা যাত্রীদের আরামের জন্যে। শিকাগো থেকে লস্ এঞ্জেলেস অবধি দীর্ঘ পথে দোতলা ট্রেনের যাতায়াত শুরু গত জুলাই মাস থেকে।

না, এ সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই আমার।—রেলকর্মীর প্রশ্নোত্তরে আমার স্বীকৃতি।

ধীরগতি আবার ট্রেন। কাছেই বুঝি আবার স্টেশন? ঠিকই তাই। আমার আসনের ভদ্রলোক নেমে যেতে উদ্যোগী। আমিও যাই স্বস্থানে।

প্রায় আড়াইটায় নিউ বুর্ণসউইকে। দুটি ছেলে আর একটি মেয়ের ছোট্ট দল। এ স্টেশন থেকে আমাদের সঙ্গে তারা নতুন যাত্রী। এরা কলেজ-পড়ুয়া। এক একজনের হাতে এক একটি আপেল। সামান্য মালপত্র। আরো কয়জন ছাত্র আগে থেকেই আমাদের আশে-পাশে। নতুন দলটিকে পেয়ে তাদের মধ্যে বেশ কলরোল। মেয়েটি হাসি-ঝলমল্। নানা প্রশ্নেও

সে নিরুদ্বেগ। আজ শনিবার। আনন্দ লুঠ। নিউইয়র্কে তাই বুঝি প্রমোদযাত্রা!

কিন্তু একি মুস্কিল, হঠাৎ উত্তেজনা! বাংকের ওপর সবারই জিনিসপত্র। একটির ওপর আর একটি বোঝা। কিন্তু নিগ্রো ভদ্রলোকের স্যুটকেশের ওপর কিছু রাখতে দিতে তাঁর ঘোর আপত্তি। শুধু এই কারণেই নতুন একজন যাত্রীর ওপর তাঁর ভীষণ উষ্মা। স্বামীকে শান্ত করতে ভদ্র-মহিলার ব্যর্থ চেষ্টা। ছাত্রটি অপ্রস্তুত। ব্যাগটি হাতে নিয়েই সে তার আসনে। ওদের আনন্দে বাধা।

সেন্টন। ঠিক স্টেশন বলা যায় না একে। প্রায় নির্জন এলাকায় সাধারণ একটি হল্ট মাত্র। একজন মাত্র যাত্রী উঠলেন এখান থেকে। নামতে দেখা গেলো না কাউকে। নতুন যাত্রী আমাদের পাশেরই এক শূন্য আসনে। তাঁর সঙ্গের মালপত্র বাংকের ওপর রাখতে যেতেই আবার হট্টগোল! নিগ্রো ভদ্রলোক আবার গরম। দুজনে কথা কাটাকাটি। আর কতোটুকুই বা পথ এখান থেকে!

কিসের এই উত্তেজনা? কেনই বা এতো আপত্তি? একটু শান্ত মুহূর্তে নিগ্রো যাত্রীটিকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা। তাঁর উত্তরে একটা অদ্ভুত কম্‌প্লেক্স-এর পরিচয়।

আপনি বোধহয় নতুন এদেশে। বোধহয় বিশেষ কিছুই জানেন না এ দেশের হোয়াইট ম্যানদের সম্বন্ধে। জন ব্রাউন এবং তারপর আরো অনেকের প্রাণ দিতে হয়েছে কৃষ্ণকায়দের ওপর এদের জুলুম বন্ধ করার জন্যে। কিন্তু আজও তা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা সম্ভব হলো না।—বলেই মুখ ফেরালেন নিগ্রো ভদ্রলোক। সে মুখভংগিতে যেমনি বিরক্তি তেমনি উত্তেজনা।

জন ব্রাউনের নাম শুনে আমার চমক। ঊনবিংশ শতাব্দীর আমেরিকার ইতিহাসে সে একটি বহু উচ্চারিত নাম। গৃহযুদ্ধেরও আগেকার অতিখ্যাত এক বিপ্লবী পুরুষ। দাসপ্রথা রহিতের জন্যে প্রথম সশস্ত্র সংগ্রামী। অসংখ্যের মুক্তির জন্যে অনেকের মৃত্যু তাঁর হাতে। আইনের সীমা লংঘন। শাসক শক্তির শাসনকে উপেক্ষা। ফল ফাঁসি। মানব-মুক্তি সাধনার চরম পুরস্কার। বিপ্লবীর পরম সম্মান।

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও অমিতবিক্রম জন ব্রাউন। ফাঁসির কাঠগড়ায়

শেষ ভাষণ। সে সত্য ভাষণ স্মরণীয়। 'হত্যা আমার অনভিপ্রেত। ধ্বংসে আমার বিপুল ঘৃণা। অবমানিত মানবতার মুক্তিই আমার লক্ষ্য।' সে মুক্তিকে ত্বরান্বিত করতে যা কিছু করা তার সবই ঈশ্বর নির্দেশিত। তার কোন কিছু অস্বীকার করে আত্মবিশ্বাসের অবমাননা করতে নারাজ জন ব্রাউন। শ্বেতাংগ শাসকদের বাইবেলের শিক্ষা স্মরণ করিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে তাই মৃত্যু বরণ।

সে প্রায় একশো বছর আগের কথা। একটি মহৎ প্রাণের নির্বাণ। একটি কঠিন মৃত্যু। অবিস্মরণীয় একজন অনন্য ইতিহাস স্রস্টার জীবনের যবনিকাপাত। কিন্তু অনুপ্রেরণা তাঁর অবিনশ্বর। তারই প্রখরতা এই নিগ্রো ভদ্রলোকের চোখেমুখে।

বর্ণ-বৈষম্য ও ক্রমাগত অবিচার থেকেই নিগ্রোদের মধ্যে এমনি একটা শ্বেতাংগ-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি। একমাত্র পূর্ণ সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠায়ই এ বিরোধের অবসান সম্ভব। শ্বেতাংগ আমেরিকানদের ওপরই সমস্যার মীমাংসা বেশি নির্ভর। নীরব চিন্তা মনে মনে।

ঐ নিউইয়র্ক। বেলা তিনটেয় আমরা ডলার-নগরী নিউইয়র্কে। ধীরগতি ট্রেন চলছে তো চলছেই। দূর থেকে আকাশচুম্বী সব বাড়ি দেখে কবি হুইট্‌ম্যানকে আবার স্মরণ। তাঁর ম্যানহাটেন কবিতায় তখনকার নিউইয়র্কের বর্ণনা:

Numberless crowded streets, high growths of iron, slender,
Strong, light splendidly uprising toward clear skies......
City of hurried and sparkling waters ! City of spires masts !
City nested in bays, my city !

এতো সেদিনকার নিউইয়র্কের পরিচয়। তারও আগের নিউইয়র্ক? তার আদি উদ্ভবের ইতিবৃত্ত বই-এর পাতায়। রেড ইণ্ডিয়ানদের কুঁড়েঘরের সবিনয় রূপ। ঐ কুঁড়েবাসী রেড ইণ্ডিয়ানরাই এ অঞ্চলের আদিবাসী। জাত-পরিচয়ে তারা ইরোকুইস। তাদের কালের সঙ্গে হুইটম্যানের যুগের নিউইয়র্কের তফাত আকাশ-পাতাল। আর আজকের এই মহানগরীর স্পর্ধাতো গগন-স্পর্শী। তার সঙ্গে দূর অতীতের পার্থক্য কল্পনায়। কল্পনায়ই তা এখন থাক।

কী লম্বা ট্রেন? অসংখ্য যাত্রী। প্রায় সবারই হাতে যার যার মালপত্র। আমারও দুহাতে আমার সব। পোর্টারের চাহিদাও নাকি এখানে বেশি।

সিঁড়ি বেয়ে অনেকটা পথ। ওপরে উঠে এসেও ট্যাক্সিস্ট্যাণ্ড অনেকটা দূর। বোঝা নিয়ে চলার অনভ্যাস। তার ফলে বেশ ক্লান্তিবোধ।

ক্যাবের জন্যে অপেক্ষা। অপরিচিত এক ভদ্রলোকের আহ্বানে সামনে ক্যাব। জিনিসপত্র গাড়িতে তুলতে যাবো, ভদ্রলোকই দেখি উদ্যোগী। ভারি স্যুটকেশটা গাড়িতে ওঠে তাঁর হাতে।

অজস্র ধন্যবাদ।—কৃতজ্ঞতা জানাই ভদ্রলোককে। সত্যি কথা বলতে কি, আমার দেশে এমনি সাহায্য অপ্রত্যাশিত। ভাবছি মনে মনে।

But you should give me something for my labour.—চমকে উঠি ভদ্রলোকের কথায়।

Oh, certainly!—বলেই সাহায্যকারীকে দশ সেণ্ট দিয়ে দায়মুক্তি। প্রথম অভিজ্ঞতায়ই নিউইয়র্কের আসল পরিচয়। শুধু ধন্যবাদে খুশি নয় নিউইয়র্ক। এ যে অর্থ আর স্বার্থের সেরা হাট!

হোটেল উডস্টক ফর্টি থার্ড স্ট্রীটে। ড্রাইভারকে ঠিকানা বলতেই গাড়ি দে-ছুট।

আমি শহর নিউইয়র্কে। নিদ্রাহীন নগরী নাকি নিউইয়র্ক? দেখাই যাক।

শেষ